বিপ্লবী বন্ধু

রফিক উল্ ইস্‌লামের

করকমলে

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—কামাখ্যা বসাক

প্রথম সংস্করণ

দাম—চার টাকা

প্রথম অধ্যায়

১

আঠারো-শ' উনত্রিশ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিক। জুয়ারীর দুর্দ্দম প্রবৃত্তিকে দমন না করে জিয়ায়ে রেখেছে যে আইন তারই মর্য্যাদা পুরোপুরি বাঁচিয়ে শহরের জুয়ার আড্ডাগুলি সবেমাত্র খুলেছে। এমন সময় একটি যুবক এসে প্যালেস রয়েলের ভিতরে ঢুকল, তারপর বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে সোজা সিঁড়ি বেয়ে প্রসিদ্ধ জুয়ার আড্ডা—ছত্রিশ নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

—দয়া করে আপনার টুপিটা খুলে রেখে যান। দেয়ালের ছায়ার আড়াল থেকে দরোয়ান কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠে।

এটা হচ্ছে জুয়ার আড্ডার অন্যতম বিধান। খেলাঘরের দরজায় পা দিয়েই আপনাকে হতে হবে নগ্নশির। এই অদ্ভুত নিয়মের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি তা অবশ্য বলা শক্ত। হয়ত খেলার টেবিলে যারা আপনাকে ঠকিয়ে সর্ব্বস্বান্ত করবে তাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা। কিংবা আপনার পিছনে যদি পুলিশের কেউ লেগে থাকে তাহলে টুপির লাইনিংয়ে লেখা ঠিকানা ... তারা আপনার টুপি নির্ম্মাতার নাম জেনে নেবার সুযোগ ... আবার এও হতে পারে যে জুয়ারীদের বুদ্ধিমত্তার পরি-

সংখ্যানের জন্তে মাথার খুলির মাপ নেয়া হচ্ছে হয়ত। দুর্ভাগ্য বশতঃ আড্ডাধারীরা আড্ডার এই চিরপ্রচলিত কানুনটি সম্বন্ধে কোন কথাই বলে না। কিন্তু এটা ঠিক জেনে রাখুন যে খেলা ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গাবার পূর্ব্বেই আপনার টুপিটি হাতছাড়া হয়ে যাবে। তারপর আপনি হবেন আত্মহারা, আর আপনার টাকা পয়সা টুপি লাঠি ঘড়ি—সব কিছুরই মালিক হবে জুয়া।

যুবকটি টুপি খুলে দরোয়ানের কাছে দিতেই সে একটা নম্বর লেখা কাগজের টুকরা তার হাতে দেয়। দরোয়ানের মুখের পানে চাইলেই বোঝা যায় যে আজীবন সে এই জীবন্ত জাহান্নামের সিংহ দরজা আগ্‌লে এসেছে। তার চোখের হিমেল দৃষ্টিতে ফুঠে উঠ্‌ছিল মুমূর্ষুর অন্তিম আকৃতি ও সর্ব্বহারার দীনতা। তার বলিকলঙ্কিত মুখে অতীত জীবনের বহু দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনীই যেন মূর্ত্ত হয়ে আছে। বর্ত্তমানের কোন আঘাতই আর তাকে বিচলিত করতে পারে না। জুয়ারীর মূর্ত্তিমান পরিণাম রূপে জুয়ার আড্ডার দরজায় বসে সে যেন পূর্ব্বাহ্নেই সকলকে সাবধান করে দিচ্ছে। কিন্তু কেউ বোধ হয় তার দিকে ফিরেও চায় না। অন্ততঃ আগন্তুক যুবক চাইল না। অথবা রুসোর কথাই ঠিক—"লোকে কেন জুয়ার আড্ডায় যায় তা আমি জানি। কারণ তখন মৃত্যু আর তার মধ্যে অন্তরায় থাকে শুধু একটিমাত্র স্বর্ণমুদ্রা।" অন্য কোন দিকে নজর দেবার মত মানসিক অবস্থা থাকে না তাদের।

জুয়ার আড্ডার সান্ধ্য মজলিসটা নারকীয় হলেও কাব্যিক। সারাটা ঘরময় গিজ্‌গিজ্‌ করছে অসংখ্য লোক—দর্শক ও খেলোয়াড়ের দল। উত্তেজিত যুবকদের সঙ্গে ঘুরছে বুড়োরা, তাদের যৌবন আবার যেন্‌ ফিরে এসেছে। মাঝে মাঝে দুই-একজন ভদ্রলোককে

দেখা যায়। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি সইতে না পেরে একটু ফূর্তির খোঁজে এসেছেন বোধ হয়। অবশ্য এইজন্যে চড়া মূল্য দেবেন তাঁরা। ভোরবেলা যারা জুয়া খেলতে আসে তাদের সঙ্গে সান্ধ্য মজলিসে সমবেত আগন্তুকদের পার্থক্যও আছে একটু। এ যেন স্বামী ও প্রণয়ীর মধ্যের পার্থক্য। একজন আছে নিশ্চিন্ত আরামে। আর একজন অভিসারক—দুরু দুরু বক্ষে প্রিয়ার ঘরের জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। ভোরবেলার জুয়ারীদের অনশনক্লিষ্ট মুখ, রক্তিম চোখ আর জীর্ণ পোষাক দেখলেই বোঝা যায় যে এরা খেলতে এসেছে সর্ব্বস্ব পণ করে। টেবিলের উপর থেকে তাস ক'খানা তুলে নিতে পারলে বোধ হয় চিবিয়ে খেয়ে ফেলে, এমনি বুভুক্ষু তাদের দৃষ্টি।

স্পেনের গর্ব্ব ষাঁড়ের লড়াই, রোমের গর্ব্ব মল্লবীর আর প্যারীর গর্ব্ব হচ্ছে প্রসিদ্ধ জুয়ার আড্ডা—প্যালেস রয়েল। এই অদ্ভুত ক্রীড়াক্ষেত্রের অভ্যন্তরে একবার দৃষ্টিপাত করলেই চোখে পড়ে ঘরখানির নগ্ন দৈন্যদশা। দেয়ালগুলি বাজে কাগজ দিয়ে মোড়া। কোথাও দেয়াল-চিত্রের চিহ্নমাত্র নাই। এমন কি কোথাও একটা হুক পর্য্যন্ত নাই, প্রয়োজন হলে যার সঙ্গে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়া যায়। নোংরা মেঝের উপরে প্রকাণ্ড একটা টেবিল পাতা আছে। টেবিলের চারধারে কতকগুলি পুরানো চেয়ার। খেলাঘরের আসবাবপত্রের দিকে জুয়ারীরা নজর দেয় না কখনো। কারণ শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পণ করে ভাগ্যের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলতে এসে আরাম চায় না কেউ। নারী বিশ্বাসঘাতকতা করে জেনেও প্রেমিক তার প্রিয়ার তনুখানি শুভ্র মসলিন দিয়ে সাজিয়ে রাখে। ভবিষ্যতে সন্তানরা হয়ত উচ্ছন্নে যাবে জেনেও ব্যবসায়ী তার

কষ্টোপার্জিত অর্থে গড়ে তুলে সুরম্য হর্ম্য। এদের মনে থাকে দ্বিধা। হয়ত যা ভাবছে তা নাও হতে পারে, কিন্তু জুয়ারী তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন। সে জানে পরিণামে তার শেষ পুরস্কার নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি।

যুবকটি ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখতে পেল ইতিমধ্যেই সেখানে বহু লোক এসে সমবেত হয়েছে। তিনজন বৃদ্ধ টেবিলটার পাশে বসে আছে। তাদের শ্মশ্রুহীন মুখে ফুটে রয়েছে বুনো রাজনৈতিক সুলভ নির্লিপ্ততা। টেবিলটার এক কোণে বসে একজন ইতালিয়ান কান পেতে যেন তাসের নীরব সঙ্গীত শুনছে। তাদের ঘিরে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে দর্শকের দল। একটা লম্বা লোক খাতা হাতে করে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে খাতার পাতায় পেন্সিল দিয়ে দাগ টানছে। জন দুই বুড়ো চাকর সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যুবককে দেখেই বৃদ্ধ খেলোয়াড় তিনজন ফিরে তাকায়, তাদের দৃষ্টিতে বিষাদের ছায়া পড়ে। অন্য সকলেও একটু বিস্মিত হয় যেন। যুবকটির মুখের অদ্ভুত রহস্যের আভাস জুয়ারীদের মনে প্রবলভাবে নাড়া দিল বোধ হয়। তার দেহাবয়বে তারুণ্যের কান্তি এখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি কিন্তু সারা মুখে ফুটে উঠেছে লক্ষ হতাশার চিহ্ন। ললাটে আত্মনিধনের ব্যর্থ প্রয়াসের ছায়া, অধরে তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত শানিত ব্যঙ্গের হাসি। তার মদমুকুলিত দুটি চোখের গভীর দৃষ্টিতে একটা প্রচণ্ড সম্ভোগলিপ্সা যেন মূর্ত হয়ে আছে। কোন ডাক্তার যদি ওকে এই মুহূর্তে দেখত তবে হয়ত বলত যে ও হার্টের ব্যারামে ভুগছে, কিংবা কবির দেখলে হয়ত বলতেন যে কঠোর অধ্যয়নই ছেলেটির মুখে ক্লান্তির ছায়া ফেলেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধ্যয়ন ও অসুস্থতার চেয়েও ঢের বেশী মারাত্

প্রবৃত্তির প্রচণ্ড তাড়নাই ওকে দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়স্ক তরুণ যুবকটি সর্ব্বাঙ্গে লুপ্তপ্রায় আভিজাত্যের ছাপ লয়ে যখন এই জুয়ার আড্ডায় এসে দাঁড়ান, ওকে দেখে চমকে উঠল সবাই। তাদের মনে হলো কোন স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত হঠাৎ যেন পথ ভুলে জীবন্ত নরকরাজ্যে এসে প্রবেশ করেছে। নিষ্পাপ কোন সুন্দরী তরুণীকে সহসা পাপের পথে নামতে দেখলে দন্তহীনা বৃদ্ধ ভ্রষ্টার চোখে যে ধরণের করুণার ছায়া পড়ে, যুবকটিকে দেখে দুনিয়ার সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অপকর্ম্মের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য প্রবীণ জুয়ারীদের চোখেও ফুটে উঠল সেই কৃপাদৃষ্টি। তারা প্রায় সমস্বরে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল "বেরিয়ে যাও এখান থেকে।" কিন্তু যুবকটি ইতিমধ্যেই সোজা এগিয়ে এসে টেবিলের উপর একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলে দেয়। তারপর শান্ত দৃষ্টিতে খেলোয়াড়দের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতালিয়ানটি তাসগুলি বেঁটে দেয়। মনে মনে সেও যুবকটির বিজয় কামনা করে বোধ হয়। সবাই উৎকন্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ব্যাঙ্কার খেলার ফলাফল ঘোষণা করল, যুবকটি হেরে গেছে। মুহূর্ত্তের জন্যে তার মুখখানা সাদা হয়ে যায়, চোখ দুটি বুজে আসে। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে কারও দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

—খুব সম্ভব এইটাই ছিল ওর শেষ কপর্দ্দক।

—মাথায় জ্বালা না হলে কেউ আর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে না।

—ওর চালটাই আমার চালা উচিত ছিল, বলে একজন বৃদ্ধ জুয়ারী ইতালিয়ানকে দেখিয়ে দেয়।

উত্তরে ইতালিয়ানটি স্বমুখের স্তূপীকৃত টাকাগুলি গুনতে গুনতে বলে—ছোকরা যে হারবে তা আমি আগেই জানতুম।

এক পাশ থেকে ব্যাঙ্কারটি বলে উঠে—আরে ছোঃ! ও জুয়া খেলার জানে না কিছুই। ভাল খেলোয়াড় হলে কখনো একসঙ্গে সব টাকা বাজি রাখত না, বার বার চান্স্ নিত।

যুবকটি তার টুপি না নিয়েই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দরোয়ান তাকে দেখতে পেয়ে টুপিটা দিয়ে দিলে। সেও দরোয়ানকে তার নম্বর-লেখা কাগজটুকু ফিরিয়ে দিয়ে শিস দিতে দিতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

যুবকটি প্যালেসরয়েল থেকে বেরিয়ে সেণ্টঅনার রোড্ অতিক্রম করে টুইলারির রাস্তা ধরল। তার চলার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কোন এক অজানা ভয়ঙ্করের দুর্নিবার আকর্ষণে নির্জন মরুপথের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। তার সারা মুখে ঘনিয়ে এসেছে চিন্তার কালো ছায়া। দুটি চোখে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছে যেন।

······মৃত্যু। হ্যাঁ মৃত্যুই হচ্ছে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত প্রতিভাবান্ যুবকদের নারীস্নেহবঞ্চিত নির্বান্ধব জীবনের শেষ আশ্রয়। সম্পদ সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াসে ক্লান্ত হয়ে তারা যখন অধঃপাতের অতলান্ত অন্ধকারে নেমে আসে তখন মরণ চুপি চুপি এসে তাদের পথ দেখায়। আশাহত যুবক-যুবতীদের এই আত্মনিধনের মাঝে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে একটি সকরুণ সুর। তাদের এই মরণ-সঙ্গীত পৃথিবীর সমগ্র কাব্য-সম্ভারকে হার মানায়।

"গতকল্য ভোর চারটার সময় একটি অজ্ঞাতনামা তরুণী ব্রিজ্ অব্ আর্ট্স্ থেকে সিন্ নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা

করেছে" সংবাদপত্রের পাতায় এই যে সামান্য খবরটুকু বেরুল সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে এর জুড়ি মেলে কি? এই সরল ছত্রটির প্রতিটি শব্দে যে করুণ বিলাপের মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হচ্ছে, দুনিয়ার সমস্ত নাটক নভেলের সঙ্গেও তার তুলনা চলে না। আত্মহত্যা হত্যা নয়—সৃষ্টি। কালের পাতায় এক অদ্বিতীয় করুণ অগীর্ত মৌন সঙ্গীতের সৃষ্টি……এমনি শত সহস্র বিক্ষিপ্ত চিন্তার ভারে জর্জ্জরিত হয়ে যুবকটি হেঁটে চলেছে। মৃত্যুর ধ্যান করছে সে। দৈবাৎ পথের ধারে ফোটা ফুলের হাসি যখনই তাকে জীবনের স্বাদ স্মরণ করিয়ে দেয় অমনি সে দৃষ্টি তুলে ধূসর আকাশের পানে চায়। পুঞ্জীভূত মেঘমালা নীরব ইঙ্গিতে আবার তাকে মৃত্যুর প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। অবশেষে সে এসে রয়েল ব্রিজের উপরে দাঁড়ায়। তার মনে পড়ে পূর্ব্বপুরুষদের কথা।

……দীনহীন জীবন যাপন করে গেছেন লর্ড কেস্‌লারেগ। পণ্ডিত অ্যাঙ্কার মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে নাকি তাঁর নস্যের কৌটা খুঁজেছিলেন। সব কিছুই অদ্ভুত মনে হয়। হঠাৎ একটা মুটের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তার জামায় দাগ লাগে। যুবকটি হাত দিয়ে জামার ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে পুলের কিনারায় এসে দাঁড়ায়। নীচে ঘোলা জলের পানে তাকিয়ে তার ভ্রূ কুঁচকে আসে।

—নিনের জল এখন ঘোলা আর বেজায় ঠাণ্ডা, ডুবে মরার উপযুক্ত নয় মোটেই। পাশ থেকে ছিন্ন পোষাক পরা একটি যুবতী মেয়ে কথাটা বলেই খিলখিল করে হেসে উঠে। প্রত্যুত্তরে যুবকটির মুখে ফুটে উঠে ম্লান হাসির ক্ষীণ রেখা। হঠাৎ কিছুদূরে একটা নোটিশ বোর্ডের দিকে নজর পড়তেই তার সারা দেহ থরথর করে কেঁপে উঠে। একখণ্ড তক্তার গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—

"শ্বাসরোধ হইলে এইখানে সাহায্য দেওয়া হয়।" সে যেন দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পেল তার অচৈতন্য দেহটা নিয়ে টানা হেঁচড়া করছে সবাই। কে একজন ডাক্তার ডাকতে ছুটল। প্যারী পুলিশের বড়কর্ত্তা জল থেকে তার প্রাণহীন দেহটা উদ্ধার করেছেন বলে পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্ক পুরস্কার পেলেন। ঐ যে দুই [illegible] টাকা গুনছেন তিনি। চমৎকার! মরলে পরই তার [illegible] হবে পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্ক। আর জীবিত অবস্থায় নামহীন গৃহহীন সে। সমাজের পক্ষে সে একটা বিরাট শূন্য। উদাসীন রাষ্ট্রের কাছে কোন মূল্যই নেই তার। নাঃ প্রখর দিবালোকে আত্মহত্যা করাটা তেমন রোমাঞ্চক নয়। রাতের বেলা মরবে সে। মরে তার দেহটা দিয়ে যাবে সমাজকে। যে সমাজ জীবিতাবস্থায় তার কোন গুণেরই মূল্য দিল না, মৃত্যুর পর করবে তার শব-সৎকার। হয়ত সমারোহও হবে একটু।

যুবকটি পুলের কিনারা থেকে সরে আসে। তারপর রি-ভল্-টেয়ারের দিকে চলতে থাকে। তার প্রতিটি পদক্ষেপে ফুটে উঠে বেকারের নিশ্চেষ্টতা। পুলের গোড়ায় ফুট-পাথের উপরে বসে একটা লোক বই বিক্রী করছে। যুবকটির নজর পড়ল সেই দিকে। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই মরবে সে সুতরাং পুস্তকের কোন প্রয়োজন নাই তার। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে আপন মনে দার্শনিকের মতো হেসে উঠে। হঠাৎ পকেটের মধ্যে টুং [illegible] একটা শব্দ হতেই ওর মুখে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ শিখার ম[illegible] ম্লান হাসির রেখা ঝিলিক দেয়। কিন্তু হাত বার করেই সে [illegible]বার গম্ভীর হয়ে যায়। মাত্র তিনটে স্যু পকেটের এক কোণায় প[illegible]ল।

—আমায় কিছু ভিক্ষে দেবেন স্যার, রুটি কে[illegible]র পয়সা নেই আমার। একটা অল্পবয়সী ছেলে এসে ভিক্ষা চায়। সারা গায়ে

কালির দাগ দেখে বোঝা যায় যে কলের চিমনি পরিষ্কার করা হচ্ছে তার উপজীবিকা। হাত দুই দূরে একটা বুড়ো ভিখিরী ছেঁড়া কম্বল গায় দিয়ে বসে ছিল। সেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠে—দয়া করে আমায় কিছু দিন স্যার, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন। যুবকটি তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে চমকে উঠে থেমে যায়। ওর মুখের হতাশার ছায়া বৃদ্ধ ভিখিরীকেও স্তম্ভিত করে দেয়। যুবকটি তার শেষ কপর্দক কয়টি ওদের দু'জনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুতপদে চলতে থাকে। দিনের এই দৈন্যদশা তাকে অস্থির করে তুলেছে।

কিছুক্ষণ চলে সে একখানা বইয়ের দোকানের সুমুখে এসে দাঁড়ায়। একটি সুন্দরী তরুণী সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিল। তার তন্বী দেহের যৌবনশ্রী যুবকটিকে আকৃষ্ট করে। মেয়েটির সুদৃশ্য পোষাকের তলা থেকে সুগঠিত শুভ্র পা দু'খানি লাস্যের আভাস দেয়। যুবকটি লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি নীচে নেমে এসে কতকগুলি অ্যাল্‌বাম দেখতে চাইল। যুবকটি এক পাশে দাঁড়িয়ে শো'কেসের মধ্যে সাজান বইগুলির নাম পড়ে আর মাঝে মাঝে কটাক্ষে তার মুখের পানে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে। কিন্তু তার এই ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি যুবতীর মনে কোন রেখাপাতই করে না। হয়ত সে এই ভেবে একটু খুশী হয় যে তার তন্বী দেহের সুন্দর বেশবাস দেখে ভক্তের সংখ্যা আর একজন বাড়ল। কিছুক্ষণ পরেই যুবতীর সওদা শেষ হয়ে যায়। সে গিয়ে গাড়ীতে উঠে। তারপর যুবকটির চোখে এক ঝলক রামধনুর রং ছড়িয়ে দিয়ে গাড়ীখানা অদৃশ্য হয়ে যায়। দিবসের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য আবার যেন ম্লান হয়ে আসে। একটা বিরক্তিকর অস্বস্তি বোধ করে সে। বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ইতস্ততঃ ঘুরতে থাকে। রাত্রির

আঁধার ঘনিয়ে আসার এখনও বিলম্ব আছে কিছু, সুতরাং সময় কাটাবার জন্যে যুবকটি একটা প্রাচীন পণ্যের দোকানে ঢোকে। দোকানের সুমুখে একটা ছোট ছেলে ও এক বুড়ী বসে ছিল। বুড়ীটাকে দেখে মনে হয় যেন একটা মূর্তিমতী রাক্ষসী। সে ভারী গলায় আহ্বান জানায়—আসুন মশাই, আসুন। এখানে যা দেখছেন তা হচ্ছে অতি সাধারণ জিনিস। আপনি যদি মিশরের মমী, সূক্ষ্ম কাজ করা মাটির বাসন কিংবা প্রাচীন ভাস্কর্যের নমুনা দেখতে চান তাহলে উপরে চলুন। সেখানে প্রকৃত রেনেসাঁর অনেক চিহ্নই দেখতে পাবেন। চমৎকার সব জিনিস।

আত্মনিধনে বদ্ধপরিকর যুবকটির কাছে বুড়ীর এই ব্যবসাদারী চাল সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হয়। হীন অর্বাচীন সব, এরাই হচ্ছে প্রতিভাবান্‌দের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। কিন্তু সে যখন আত্মহত্যা করবেই তখন বুড়ীর কথা শুনতে দোষ কি? তাছাড়া তার কবিচিত্ত একসঙ্গে দ্বাদশ ভুবনের ধ্বংসাবশেষ দেখবার আশায় প্রলুব্ধ হয়ে উঠল।

দোতলার দোকানঘরখানা তার কাছে মনে হলো যেন অতি-প্রাচীনকালের জীবজন্তু থেকে শুরু করে আধুনিকতম ঘটনা সন্নিবেশিত একখানা বিরাট ছবি। তলোয়ার পিস্তল প্রভৃতি মারণাস্ত্রের সঙ্গে পোর্সিলেনের পরাত সেক্‌সপ্লেট, রূপার মতো উজ্জ্বল ছোট ছোট চীনা বাসন, নুনের হাঁড়ি, সামন্তপতিদের পিঠার বাটি প্রভৃতি একসঙ্গে স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন জীবন মৃত্যু পরস্পরকে এসে জড়িয়ে ধরেছে। সম্রাট অগস্টাসের গর্বোদ্দীপ্ত মুখখানি ঢাকা পড়ে আছে একটা ভাঙ্গা হাওয়া-কলের আবডালে। ভাঙ্গাচূরা জিনিসের স্তূপের তলা থেকে

উঁকি মারছে কয়েকজন ফরাসী অল্ডারম্যান ও ডাচ্ সামন্তপতির মুখ—ছবিগুলি জীর্ণপ্রায়। প্যারীর এই বিচিত্র পণ্যশালায় পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু-না-কিছু ধ্বংসাবশেষই স্থান পেয়েছে বলে মনে হয়। এই বিরাট্ দার্শনিক আবর্জ্জনা-স্তূপে কিছুই যেন বাদ পড়েনি। আদিম অধিবাসীদের হুঁকা থেকে আরম্ভ করে সুদূর তাতার দেশের পুতুল এমন কি নবাব হারেমে বাদশাজাদীদের ব্যবহৃত সবুজ ও সোনালী রংয়ের দুই-এক পাটি চটি জুতাও পাওয়া যাবে এখানে। আলোছায়ার লুকোচুরি খেলায় অতীতের এই আবর্জ্জনাস্তূপকে কোন একখানি অসমাপ্ত নাটকের জীবন্ত দর্শকের মতো মনে হয়। শুধু বেয়াদব ধূলারাশি এসে অতীতের ঐ ক্ষয়িষ্ণু সাক্ষীদের প্রভাহীন করতে চাইছে যেন।

যুবকটি মনে মনে এই অপূর্ব্ব দোকানঘরকে একখানা সহস্রমুখী দর্পণের সঙ্গে তুলনা করে। কৃষ্টি, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সম্ভোগলিপ্সা, যৌক্তিকতা, মূর্খতা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব এই আরশিখানির গায়ে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে যেন। সে প্রথম দর্শনের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে এইবার সমালোচনা করতে চায়। কিন্তু হঠাৎ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠে। বিভিন্ন কালের জাতি ও ব্যক্তির এই ধ্বংসাবশেষ-গুলি তার চেতনাকে আড়ষ্ট করে দেয়। মনে হয় সে যেন মরে গেছে, আর তার প্রাণহীন দেহ ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। ঊর্দ্ধে—বহু—বহু ঊর্দ্ধে যেখানে সমস্ত জগৎ এসে রূপায়িত হয়েছে এক ঘূর্ণায়মান অগ্নিপিণ্ডে, তারই কাছে যাচ্ছে সে······হঠাৎ ওর দৃষ্টির সুমুখ থেকে যুগান্তের কুয়াশার আবরণ কেটে যেতেই বিভিন্ন যুগের নরনারীরা এসে ভীড় করে দাঁড়াল। একটা মমীর পানে তাকিয়ে সে দেখতে পেল মিশরের প্রাচীন অধিবাসীদের—দীর্ঘ

শক্ত দেহাবয়ব কৃষ্ণাবরণে আচ্ছাদিত। মুখে অসীম রহস্যের ছায়া। অতীতের সর্ব্বশক্তিমান্ ফেরো। একটা পাথরের মূর্ত্তি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার কীর্ত্তিকাহিনী। একটি বাদামী রংয়ের তরুণী লাস্যের ভঙ্গীতে এসে প্রণাম করছে অতীতের পরিকল্পিত মদন দেবকে। স্নানাগারের ভগ্নাবশেষ ও ছেঁড়া কৌচে জেগে আছে শক্তিমান্ রোম সাম্রাজ্যের স্মৃতি। প্রসাধনরতা জুলিয়া মদমুকুলিত নয়নে ট্রেবুলার প্রতীক্ষা করে আছে। সিনেরো রয়েছেন। রয়েছেন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও তাঁর সহকারিগণ। তাঁদের পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেত-শ্মশ্রুধারী নাগরিকবৃন্দ। তার পরেই খ্রীষ্টীয় যুগ। পুঞ্জীভূত স্বর্ণ-মেঘের মাঝে দেদীপ্যমানা কুমারী মেরী। তাঁর দেহের দ্যুতি সূর্য্যের প্রদীপ্ত প্রভাকেও লজ্জা দেয়। এট্‌না ও ভিস্যুভিয়াসের প্রস্তরীভূত লাভা দেখে যুবকটির চোখের সুমুখে ফুটে উঠে প্রাচীন ইতালি। ইতালীয় মেয়ের সাদা মুখের কালো চোখ তার মনে মোহের সঞ্চার করে। মধ্যযুগের একখানা ছোরার উপর নজর পড়তেই সে শিউরে উঠে। স্বর্ণালঙ্কার ও রেশমী বস্ত্রমণ্ডিত দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি তাকে ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ছেঁড়া গালিচাখানা থেকে এখনও চন্দনের গন্ধ বেরুচ্ছে বুঝি। ঐ যে পাশেই রয়েছে মহাচীন। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে অবশেষে চীনারা অদ্ভুত কুশ্রীতার মাঝেই বৈচিত্র্যের স্বাদ পেয়েছিল বোধ হয়। একটা ভাঙ্গা নুনের হাঁড়ি তার মনকে আবার ঠেলে দেয় রেনেসাঁর যুগে। শিল্প-জগতে নব জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। প্রাসাদে প্রাসাদে ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের জীবন্ত ফোয়ারা। রাজা রাজপুত্রেরা মানুষকে হনন করে, বিকলাঙ্গ করে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন। চারদিকে ভোগের স্রোত

বইছে। মঠাধ্যক্ষেরা বারবনিতার বাহুবন্ধনে মুক্তির স্বাদ পেল বুঝি। আলেকজেণ্ড্রিয়া বিজয় সমাপ্ত হলো। ঐ যে আবার ধর্ম্মযুদ্ধ বেধে গেছে। ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছে সবাই। নাইট্‌রা যাচ্ছেন আগে আগে।

অনাদি অনন্ত অতীতের এই ধ্বংসস্তূপের মাঝে যুবকটি অনাদি অনন্ত এক মহাকাব্যের সুর শুনতে পায়। এই কাব্যের আছে সুর, আছে সৌন্দর্য্য, আছে রং, কিন্তু সুসংবদ্ধ গল্প নাই কোন। খেয়ালী শিল্পী এক সুবিরাট্‌ পটের উপরে তুলি দিয়ে ইতস্ততঃ রং ছড়িয়ে গেছেন। এইবার কবি এসে তাকে গেঁথে তুলবেন উপযুক্ত ঘটনার সুচিক্কণ শৃঙ্খলে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জাতির এই অনাদি অনন্ত জীবনপ্রবাহে অবগাহন করে যুবকটি ফিরে তাকায় ব্যক্তি বিশেষের জীবনের দিকে।

মোমের একটা ছোট পুতুল দেখে তার মনে জাগে শৈশবের সুখস্মৃতি। একটি অর্দ্ধনগ্ন টেহিসিয়ান তরুণীর প্রতিকৃতি দেখে সে কল্পনায় প্রকৃতির সরল সহজ নগ্ন সৌন্দর্য্যের ছবি আঁকে। সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে বহুদূরে শান্ত নদীর তন্দ্রাতুর আবহাওয়ায় বেঁচে আছে প্রকৃতির দুলালেরা। সংঘাতহীন স্বস্ত জীবন তাদের। সহসা অ্যাট্‌লান্টিকের বুকে ঝড় উঠে। প্রচণ্ড আক্রোশে সুবিপুল ঢেউগুলি ক্রুদ্ধ অজগরের মতো গর্জ্জাচ্ছে। আর এই উন্মত্ত ঝঞ্ঝার মাঝে লেরা—মূর্ত্তিমতী কবিতা। তার সর্ব্বাঙ্গে ঝলসে উঠছে অসংখ্য প্রবালের চুমকি। হঠাৎ আরবদেশের একখানা পাণ্ডুলিপির জীর্ণপ্রায় আধারের পানে নজর পড়তেই যুবকটির মন থেকে বাত্যাহত অ্যাট্‌লান্টিকের ছবি মুছে যায়। তার মানসপটে ফুটে উঠে সৌম্য শান্ত স্নিগ্ধমূর্ত্তি আরব বৈজ্ঞানিকের প্রতিবিম্ব। বিজ্ঞান চর্চ্চার

লোভে ফকিরি নিয়েছেন। পার্থিব কোন সুখদুঃখই আর যেন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। দ্রাক্ষাকুঞ্জের ধারে একখানা নির্জ্জন কুটীরে বাস করেন। সারা দিনভর চলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা। অপূর্ব্ব লোভনীয় জীবন। পরক্ষণেই যুবকটির মনে সৈনিক কিংবা শ্রমিক হতে সাধ জাগে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিকালে দল বেঁধে তাস খেলা আর কৃষাণীদের যৌবনপরিপুষ্ট দেহের পানে লোলুপ কটাক্ষ হানা। তাই বা মন্দ কি? মিরিসের তুষারপাত দেখে সে ভয়ে কেঁপে উঠে। একটা তালুকদারের বৌয়ের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই ভালবাসা জানায়। অতীতের এই ধ্বংসাবশেষের মাঝে দাঁড়িয়ে সে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়। নিজের পায়ের শব্দ শুনে তার মনে হয় যেন সে নটারডামের সুউচ্চ তোরণে দাঁড়িয়ে প্যারীর অস্পষ্ট কোলাহল শুনছে।

—চারতলায় চলুন, দেখবেন আরো কত সব চমৎকার জিনিস আছে সেখানে, সঙ্গের ছেলেটা হঠাৎ বলে উঠল।

যুবকটি সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রামধনুর রংয়ের মতো—বায়রনের লেখা একটি কবিতার মতো তার দৃষ্টির সুমুখে ফুটে উঠল পোসিন, ক্লড টেরেইন ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর আঁকা ছবি আর খোদিত পাথরের মূর্ত্তিগুলি। কিন্তু হঠাৎ সে বিষম বিরক্ত হয়ে উঠে। তার মনে হয় শুধু যেন প্রেরণাকে পিষে মেরে মানুষের মনে শিল্পের প্রতি ঘৃণা জাগাবার জন্যেই শিল্পের এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলিকে এইভাবে পুঞ্জীকৃত করে রাখা হয়েছে। মনটা দারুণ দমে যায়। হঠাৎ তারা মেহগেনি কাঠের তৈরী একটা কুঠরির কাছে এল। যুবকটি সঙ্গীকে জিগ্যেস করে—ওঘরে কি আছে?

—ইচ্ছা হলে ভিতরে গিয়ে দেখতে পারেন। এই নিন চাবি, বলে ছেলেটি ত্রস্তপদে অন্যত্র চলে যায়। তার এই আকস্মিক অদ্ভুত ব্যবহারে যুবকটি বিস্মিত হলো একটু। তবুও সে দরজা খুলে কুঠরির ভিতরে এল।

……আপনি কোনদিন কুভেরের ভূ-বিদ্যা বিষয়ক রচনা পড়ে কল্পনায় অনাদি অনন্ত অতীতের গর্ভে বিচরণ করেছেন কি? তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে উরালের পুঞ্জীভূত নোনা থাকের নিম্নে ভূগর্ভে নেমে আসুন। তারপর তাকিয়ে দেখুন চারদিকে পড়ে রয়েছে শিলীভূত অস্থিস্তূপ। বহু—বহু—বহু শতাব্দী আগে একদা পৃথিবীর বুকে বিচরণ করেছিল যে সকল অতিকায় প্রাণী, এইগুলি তাদেরই জীবাশ্ম। বিস্মৃত যুগের সেই সমস্ত প্রাণিদল নিজেদের অস্থি দিয়ে পৃথিবীকে উর্বরা করে গেছে—করে গেছে শস্যশালিনী। কবি—হ্যাঁ কুভের হচ্ছেন একজন মহাকবি। লর্ড বায়রনের রচনা-সম্ভার মানুষের মনোরাজ্যে কিছু কিছু নৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে মাত্র। কিন্তু নীতি-দুর্নীতির বাছ বিচার না করে এই প্রতিভাবান্ ভূতাত্ত্বিক শুধুমাত্র কয়েকখানি অস্থির 'পরে নির্ভর করে কল্পনায় প্রাচীন পৃথিবীর ছবি এঁকে গেছেন। কয়েকটা দাঁত দেখে রচনা করেছেন অতীত নগরীর ইতিকথা। ম্যামোথের পায়ের একখানা হাড় তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে আদিম যুগের লক্ষ লক্ষ দৈত্যাকৃতি জীবের পরিকল্পনায়। প্রাণি-জগতের বহু রহস্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন তিনি। একখণ্ড জিপ্-সামের গায়ে কয়েকটি দাগ দেখিয়ে তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন অতিকায় জীবদের বংশ-পরিচয়, মৎস্যের কুলপঞ্জী আর কম্বোজের জাতি-বিভাগ। তারপর এল মানুষ—শক্তিমান্ প্রজাতির দুর্বল

যূথভ্রষ্ট সন্তান। এরা এসেই নিজেদের খেয়াল খুশি মতো পৃথিবীকে করলে রূপায়িত। কিন্তু কোন লাভ হলো কি? আপনাকে অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছি আমরা। ভবিষ্যতের সুমুখেও ঝুলছে অজ্ঞতার নিবিড় কালো পর্দ্দা। শুধু বর্ত্তমান সম্বল আমাদের। এই বর্ত্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই আমরা মৃত—নিঃশেষিত।

ঘরময় পুঞ্জীকৃত কঙ্কালস্তূপের পানে চেয়ে যুবকটির আবার মৃত্যুর কথা মনে এল। পাশের একখানা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল সে। হঠাৎ ঐ কঙ্কালস্তূপে প্রাণসঞ্চার হলো যেন। সবগুলি জীব-জানোয়ার জীবন্ত হয়ে তার দৃষ্টির সুমুখে এসে দাঁড়াল। একি অদ্ভুত ভৌতিক পরিবেশ! তার মনে পড়ে ডাক্তার ফাউস্ট্ ও ক্রুকিনের নৈশ সম্মিলনের কথা। কিন্তু ভয় পায় না সে। মৃত্যুর চেয়ে জীবনই এখন তার কাছে অনেকগুণ বেশী ভয়াবহ। সহসা চারদিকে ঘনিয়ে আসে নিশ্ছিদ্র নিবিড় অন্ধকার। আর সেই জমাট আঁধারের বুক চিরে অস্তমিত সূর্য্যের একটি চূর্ণ রশ্মি এসে একটা কঙ্কালের মুখের 'পরে লুটিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালটা মাথা নেড়ে যেন বলে উঠে—"এখান থেকে চলে যাও—মৃত্যুলোকে আসার সময় হয়নি এখনও তোমার।" যুবকটি হাত তুলে শ্রান্ত চো' দুটিকে আড়াল করে। হঠাৎ সে গালের উপর একটা হিমেল স্প অনুভব করে চমকে উঠে। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ তবু এই ঠাণ্ডা হাওয়া কোথা থেকে এল! সে ইতস্ততঃ তাকায়। কিন্তু এতক্ষণে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আলোটুকুও মিলিয়ে গেছে। ঘরময় জমে উঠেছে রজনীর মৃত্যুঘন কালো অন্ধকার। তন্দ্রা[illegible] তার চোখ জড়িয়ে আসে। কিছুক্ষণ পরে কার কণ্ঠস্বর শুনে সে যে স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে চোখ মেলে চায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই

ঝলক আলোর আঘাত লেগে তার দৃষ্টি ঝল্‌সে যায়। চোখে আলোটা একটু সয়ে এলে সে দেখল একটা উজ্জ্বল রক্তিম বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বৃদ্ধ—তার হাতের প্রদীপ্ত প্রদীপশিখায় চারদিক লাল হয়ে উঠেছে। নিথর নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার ক্ষীণ দেহের পানে চাইলে মনে হয় এইমাত্র সে যেন পার্শ্বের কোন কবরভূমির কফিন থেকে উঠে এসেছে। বৃদ্ধের তু'টি চোখে জ্বল জ্বল করছে একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি। তাকে দেখে কোন ভৌতিক জগতের বাসিন্দা বলে ভুল করাই স্বাভাবিক। ...টি দার্শনিক ডেস্‌কার্টিসের শিষ্য নাস্তিকতাবাদী যুবকটির প্রজ্ঞা...নে মন কোনরূপ অনৈসর্গিক জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করতে সে...শেষ প্রস্তুত ছিল না।

বৃদ্ধের পরণে একটা নিবিড় কালো রংয়ের আলখাল্লা। ...র নাই। লাল রেশমী কাপড়ের চওড়া কটিবন্ধ। মাথায় কালো ...কটির মুখের টুপি। শীর্ণ মুখখানির তু'পাশ দিয়ে ঝুলে আছে ...হাত ছেড়ে দেয়। ...মতো সাদা চুল। তার থুতনিতে ইহুদী... তুমি কি জীবনের উপর ...দাড়ি। বিবর্ণ ঠোঁট তুইখানি এম... ...জন করতে পারছ না বলে মরে ...কোন ফাঁক আছে কি না... ...কে রেহাই পেতে চাইছ?

...লক্ষিত ললা...

—আমি যে কেন মরতে চাই তা সাধারণ ভাষায় ঠিক করে বলা শক্ত। তবে আপনাকে এই শুধু বলতে পারি যে বর্ত্তমানে আমি পৃথিবীর তীব্রতম তুঃখ ভোগ করছি। কিন্তু তার জন্যে কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য চাই না আমি, কোন সান্ত্বনারও প্রয়োজন নাই আমার।

—বেশ-বেশ, শোন তোমাকে আমি টাকা আনা পয়সা এমন

সম্ভোগ বলে কোন কথা নাই। জীবনের প্রতি কোন মোহ নাই ওর। সুখের স্বাদ পায়নি কখনও তাই দুঃখের যন্ত্রণাও সইতে হয় না ওকে।

এই অভিনব পরিবেশের মধ্যে অদ্ভুতদর্শন বৃদ্ধের আবির্ভাবকে ইন্দ্রজাল বলে মেনে নিতে যুবকটির মন সায় দেয় না। ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে প্যারী মহানগরীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে কোন অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সম্ভবও নয়। তবুও একটা ব্যিক ভাবপ্রবণতায় তার বুদ্ধিবৃত্তি যেন আড়ষ্ট হয়ে এল। বৃদ্ধের ত দৃষ্টির পানে তাকিয়ে তার বুক কেঁপে উঠে। নিজকে ভয়ানক য় বলে মনে হয়। মনে হয় যেন সে গগনচুম্বী প্রতিভা ালিয়নের সমক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে।

হাতের প্রদীপটা নামিয়ে রেখে মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করে—
াফেলের আঁকা যীশুখ্রীষ্টের ছবিখানি দেখবেন কি? বলে ভঙ্গীতে মেহগেনি কাঠের তক্তাখানা নরিয়ে দিতেই ফুটে উঠল এক অলৌকিক জ্যোতিষ্মান অমর সৃষ্টির যাদুস্পর্শে সে আবার ক্ষণ পরে আবার সে নিজেকে মানুষ বলেই

প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করে মানুষের মনের সকল অহংকার চূর্ণ করেছেন, জাগিয়ে তুলেছেন মানবমনের সুপ্ত মানবতা।

যুবকটি হঠাৎ যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে বলে—

—কিন্তু প্রভুও শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ বলে বরণ করেছিলেন।

তার এই স্বগতোক্তি শুনে বৃদ্ধ শঙ্কায় কেঁপে উঠে। সে যুবকটির হাত চেপে ধরে বলে—অ্যাঁ-অ্যাঁ—তাহলে তোমাকে বিশ্বাস না করে আমি ঠিকই করেছিলুম।

—আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন, যুবকটি শান্ত স্বরে বলে—আপনার জীবন বিপন্ন হয়নি, আমিই রাত্রির অন্ধকারে নির্ঝরঘাটে জলে ডুবে আত্মহত্যা করবো বলে সময় কাটাবার জন্যে এখানে এসেছি। আপনি কি একজন বৈজ্ঞানিক ও কবির এই শেষ ইচ্ছাটুকু পূরণ করবেন না?

বৃদ্ধ বুঝলে যে যুবকটি তার দোকানে কিছু কিনতে আসে নাই। সে সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর মুখ চোখ পরীক্ষা করে। যুবকটির মুখের হতাশার ছায়া দেখে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে হাত ছেড়ে দেয়। তারপর বলে—কেন তুমি মরতে চাও? তুমি কি জীবনের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছ, না অর্থ উপার্জ্জন করতে পারছ না বলে মরে গিয়ে দারিদ্র্যের হাত থেকে রেহাই পেতে চাইছ?

—আমি যে কেন মরতে চাই তা সাধারণ ভাষায় ঠিক করে বলা শক্ত। তবে আপনাকে এই শুধু বলতে পারি যে বর্ত্তমানে আমি পৃথিবীর তীব্রতম দুঃখ ভোগ করছি। কিন্তু তার জন্যে কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য চাই না আমি, কোন সান্ত্বনারও প্রয়োজন নাই আমার।

—বেশ-বেশ, শোন তোমাকে আমি টাকা আনা পয়সা এমন

কি জোর করে একটা আধ্লাও দিতে চাই না। কিন্তু তবুও বল-বিদ্যা-বিত্তে তোমায় আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের চেয়েও শক্তিমান করে তুলব।

যুবকটি ভাবে বুড়োটা নিশ্চয়ই পাগল, [illegible] একটু বিস্মিত হয়। বৃদ্ধ হঠাৎ আলোটা তুলে নিয়ে বলে—উঠে এসে এই চামড়া-খানা একবারটি দেখ।

যুবকটি উঠে গিয়ে দেখে দেয়ালের সঙ্গে ঝোলানো রয়েছে একখণ্ড মসৃণ চামড়া। চামড়াখানা থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে একটা অত্যুজ্জ্বল আলোকপ্রভা। মনে হয় যেন একটা ধূমকেতু আকাশ থেকে নেমে এসেছে এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে।

বিস্মিত যুবকটি আলোটা ভাল করে পরীক্ষা করে বৃদ্ধকে বললে যে তার হাতের প্রদীপশিখা ঐ চামড়ার গায়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে এই আলোর সৃষ্টি করেছে।

উত্তরে বৃদ্ধ মাথা নেড়ে অবিশ্বাসের হাসি হাসে। যুবকটি ভাবলে নিশ্চয়ই কোন জুয়াচোর যাদুকর বুড়োকে ভালমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে গেছে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চামড়াখানা পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ চীৎকার করে উঠে,—আরে, এর গায়ে একটা সীল রয়েছে যে! একে বলে সোলোমানের সীলমোহর।

—তুমিও ওটা চেন দেখছি।

যুবকটি ক্রুদ্ধ স্বরে বলে—কিন্তু তাই বলে এই চামড়াখানা যে সর্বশক্তির উৎস আপনার এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না। মনে হয় এটা স্ফিংক্স্ আর গ্রিফোনের কাহিনীর মতোই প্রাচ্যের আর একটা আজগুবী রূপকথা।

—তুমি প্রাচ্যবিদ্যাও জান দেখছি, দেখত এই লেখাটা পড়

পার কি না? বলে বৃদ্ধটি তার হাতের প্রদীপটা চামড়াখানার কাছে নিয়ে যায়। যুবকটি চামড়ার গায়ে খোদিত অক্ষরগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে বলে—আশ্চর্য্য, চামড়ার গায়ে অক্ষরগুলি এমন গভীরভাবে খোদাই করলে কি করে!

তাকে ঘরের চারদিকে চাইতে দেখে বৃদ্ধ প্রশ্ন করে—কি খুঁজছ তুমি?

—একটা কিছু পেলে চামড়াখানা একটু কেটে দেখতাম।

বৃদ্ধ তার হাতে একখানা ধারাল ছুরি দেয়। যুবকটি বার-বার চেষ্টা করেও চামড়ার গায়ে সামান্য একটা আঁচড়ও কাটতে পারল না।

—প্রাচ্য দেশে কিছু কিছু গুপ্তবিদ্যা প্রচলিত আছে, এটা ঠিক। বলে যুবকটি বিস্মিত দৃষ্টিতে লেখাটা পড়তে থাকে। অক্ষরগুলি এমনি করে সাজান রয়েছে:—

যদি তুমি আমার মালিক হও, তাহা হইলে সব কিছুরই মালিক
হইবে। কিন্তু তোমার জীবনের মালিক হইব আমি।
ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তুমি কামনা কর, তোমার
কামনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু তোমার প্রতিটি
অভিলাষ পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার
এবং তোমার জীবন সংক্ষিপ্ত হইয়া
আসিবে। তুমি ইচ্ছা হইলে
আমাকে গ্রহণ করিতে
পার। ঈশ্বর সাক্ষী,
তোমার বাসনা
পূর্ণ হউক।

— অ্যাঁ, তুমি সংস্কৃত জান, কখনো বাংলাদেশে ছিলে নাকি? বৃদ্ধ বিস্মিত কণ্ঠে বলে।

— না, বলে যুবকটি চামড়াখানি টিপে দেখে।

বৃদ্ধ হাতের আলোটা নামিয়ে রেখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে যুবকটির মুখের পানে তাকাল।

—আপনি কি আমায় ঠাট্টা করছেন? না এর ভিতরে সত্যিই কোন গুপ্ত রহস্য আছে?

বৃদ্ধ গম্ভীরস্বরে বলে—তোমার এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া শক্ত। তোমার চেয়েও যে বেশী নিঃস্ব আর সাহসী লোকদের এই চামড়াখানা দিতে চেয়েছি কিন্তু তারা কেউ নিতে সাহস করেনি। আমি নিজেও এ বিষয় সন্দেহ দোলায় দুলছি।

—আপনি কখনো পরীক্ষা করে দেখেননি?

—পরীক্ষা করে দেখবো? পাগল! তুমি শুধু মাত্র পরীক্ষার জন্যে ভেনডমের সুউচ্চ তোরণ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তে পার? শোন, একদা আমি তোমারই মতো নিঃস্ব ছিলাম। অন্নের জন্যে ভিক্ষে করতে হয়েছে আমাকে। তবুও মরিনি। আজ একশ' দুই বছর বয়সে আমি লক্ষপতি। দুঃখ দিয়েছে আমায় সম্পদ, অজ্ঞতা দিয়েছে জ্ঞান। কমনা আর বাসনা এই দু'টা রিপুই হচ্ছে মানবের সঁবচেয়ে বড় শত্রু। এরাই মানুষের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষিত করে দেয়। দিনের পর দিন তাকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর অতলান্ত গহ্বরে। কিন্তু রিপুজয়ী ঋষিরা প্রবৃত্তির সর্পিল প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার উপায়ও আবিষ্কার করে গেছেন। ত্যাগ—কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে সমাহিত চিত্তে আত্মচিন্তাই হচ্ছে ভোগ-কলুষিত জীবনে একমাত্র মুক্তিমন্ত্র। এই ঋষিবাক্য অনুসরণ করেই আমি দীর্ঘ-

জীবন লাভ করেছি। কামনার তুষানলে মানবজীবন তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে যায় আর আশার কুহকী ছলনায় প্রাণশক্তি হয়ে আসে নিঃশেষিত। কিন্তু আত্মচিন্তা আর নিষ্কাম কর্ম মানুষকে রিপুজয়ী করে তোলে। আমি হৃদয়ের দুর্বার ভাবের স্রোতে কোনদিন ভেসে যাইনি, অথবা ক্ষণস্থায়ী প্রবৃত্তির মোহেও মুগ্ধ হইনি। অক্ষয় অনন্ত চিন্তারাজ্যে বিচরণ করে দেহের দাবীকে করেছি অস্বীকার। জ্ঞানান্বেষণে, এসিয়া ও আমেরিকার সুউচ্চ পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করেছি, অসংখ্য ভাষা শিখেছি, বিভিন্ন দেশে বাসও করেছি অনেকদিন। একজন চীনাম্যানকে তার বাপের দেহ জামিন রেখে টাকা ধার দিয়েছিলাম। আরব বেদুইনদের তাঁবুতে রাত্রিযাপন করতে হয়েছে আমাকে। বর্ব্বর জাতিদের অরক্ষিত কুটীরে সঞ্চিত সোনা জমা রেখে নির্ভয়ে অন্যত্র চলে গেছি। এক কথায় আমি চাইনি কিছুই তাই সব-কিছুই পেয়েছি। দর্শন আর মননই ছিল আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শোন বন্ধু, এই মরজগতে চিন্তা ছাড়া আর কিছুই শাশ্বত নয়। চিন্তা মনশ্চক্ষুর সম্মুখে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের দ্বার খুলে দেয়। তোমাদের প্রেম প্রীতি আশা নিরাশা প্রভৃতি গালভরা বুলিগুলোকে আমি মানসিক ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। প্রবৃত্তি আমার উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না, আমিই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে তার বিচার বিশ্লেষণ করি।" বৃদ্ধটি কপালে ধীরে ধীরে চাপড় দিতে দিতে আবার বলে—বন্ধু, এইখানে আমি দুনিয়ার সমস্ত ধন-ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করে রেখেছি। কল্পনায় অতীত শতাব্দীর অন্ধকার গর্ভে উঁকি দিয়ে আমি যেন সব-কিছুই দেখতে পাই। আমার মনের হারেমে জগতের সেরা সুন্দরীরা বন্দী হয়ে আছে। অতীতের

সমস্ত বিদ্রোহ-বিপ্লবের জীবন্ত চিত্রগুলি আমার মানসপটে সুস্পষ্ট অঙ্কিত। শূকরের মতো ভোগের পঙ্ক-পল্বলে বিহার করার চেয়ে দেশকালের বন্ধনমুক্ত চিন্তার শক্তিমান পাখায় ভর দিয়ে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে পরিভ্রমণ করা অনেক বেশী শ্রেয়: নয় কি ? বল তুমি কি চাও ? যদি তুমি সম্ভোগের স্রোতে গা ভাসাতে চাও তাহলে এই চামড়াখানা নিতে পার। এ তোমায় করবে ক্ষমতা মদে মত্ত, এনে দেবে সম্ভোগের নিত্যনব উপাদান। কিন্তু মনে রেখ জ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত বিলাস-বিভব।

... যুবকটি ক্ষিপ্রহস্তে চামড়াখানা আঁকড়ে ধরে বলে—"সুখ—সুখ চাই আমি। চাই অপর্য্যাপ্ত অর্থ। অধ্যয়নে জীবনের একটা বিরাট্ অংশ ব্যয় করেছি কিন্তু পুঁথির পাতায় আমার দেহের ক্ষুধা মিটেনি। সোয়েডেনবার্গের আদর্শবাদী বক্তৃতায় বিশ্বাস করবার মতো মূর্খতা আমার নাই। প্রাচ্যের নিষ্কাম জীবনের পরেও কোন লোভ নাই। দেহের দাবীকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি চাই ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে। আধুনিক অভিজাত সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতাকেই মনে করে প্রগতি। অমিও প্রগতিশীল হতে চাই। ফেনায়মান রক্তিম সুরার পাত্র হাতে নিজে বসে থাকব—আর আমাকে ঘিরে থাকবে অজ্ঞতায় আত্মস্ফীত বুদ্ধিজীবীর দল। তারপর জীবনের সমস্ত মাদকতা, সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা এসে কেন্দ্রীভূত হবে একটি মাত্র পাত্রে—সমস্ত কামনা বাসনার মহাবসান এক নারীদেহে। তরুণীর নগ্ন দেহের উষ্ণ আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে সপ্রেম চুম্বন শব্দে মুখরিত করে তুলব প্যারীর নৈশ আকাশ। সেই শব্দ শুনে রমণরণে পরিশ্রান্ত স্বামীরা পূর্ণ তেজে আবার শয্যার 'পরে উঠে বসবে। কামার্ত্ত হ'য়ে উঠবে বিগত-কাম বৃদ্ধের দল।" বৃদ্ধটি হঠাৎ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠতেই যুবকটি

তার উচ্ছুসিত বক্তৃতার মাঝখানে থেমে যায়। বৃদ্ধ ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে বলে—বন্ধু, তোমার এই বক্তৃতা শুনে আমার ভোজনঘরের মেঝে ফুঁড়ে সুন্দরীরা মদের পাত্র হাতে নিয়ে উঠে আসবে না। চামড়াখানা নিয়ে যাও, তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। কিন্তু মনে রেখ প্রতিটি ইচ্ছা পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পরমায়ুও কমে আসবে। আমি তোমার প্রথম আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করতে পারলুম না। ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা তো আত্মহত্যারই নামান্তর।

বারবার বৃদ্ধের ঐ একই উপদেশ শুনে যুবকটি বিরক্ত হয়ে উঠে। সে রুক্ষ স্বরে বলে—আমার দুঃখ আপনি বুঝবেন না মশাই। জীবনে যদি কখনও কোন ভ্রষ্টার প্রেমে পড়তেন তাহলে বুঝতেন দেহের দাবীকে অস্বীকার করা কত শক্ত। যুবকটি চামড়াখানা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল। মর্মাহত বৃদ্ধের দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ তার কানে গেল না।

সে রাস্তায় নেমে এসে চামড়াখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখে। তারপর সোজা চলতে থাকে। হঠাৎ তিনজন লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই ওরা চীৎকার করে উঠে—মূর্খ।

—অর্বাচীন।

—আরে, এ যে র‍্যাফেল!

—কোথায় ছিলে বলতো? তোমাকেই যে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা।

—কি ব্যাপার? কোথায় যেতে হবে?

—এস না, পরে বলছি সব।

র‍্যাফেলকে তার বন্ধুরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তারপর সকলে মিলে ব্রিজ্ অব্ আর্টসের দিকে চলতে থাকে। ওদের মধ্যের

দি হার্টলেস উওম্যান

একজন র‍্যাফেলকে বলে—গত এক সপ্তাহ ধরে তোমায় আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার বাসায়ও গিয়েছিলাম। লিওনার্ড বললে যে তুমি নাকি গাঁয়ে বেড়াতে গেছ। ওকি, অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাচ্ছ কেন? আমাদের দেখে কি পাওনাদার বলে মনে হচ্ছে নাকি? ভয় নাই। আমরা তোমার বন্ধু। তোমাকে ভালবাসি বলেই গোটা প্যারী শহরের অলিতে গলিতে তোমায় ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি। সরকারী বাগান থেকে শুরু করে ভিখিরীদের আস্তানা পর্য্যন্ত দেখেছি। শেষে ভাবলুম তুমি বোধ হয় কোন সুন্দরী তরুণীর শয়নকক্ষে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছ। সে যা হোক চায়ের দোকান, সিনেমা, থিয়েটার, সংবাদপত্রের আফিস এমন কি পুলিশের ডায়েরিতেও তোমার কোন পাত্তা না পেয়ে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

বন্ধুটি থামল। তারা ব্রিজ্ অব্ আর্ট্সের উপর এসেছে। র‍্যাফেল তাকিয়ে দেখল পুলের নীচে সিনের জলে লক্ষ আলোর মাণিক জ্বলছে। তার আত্মহত্যা আপাততঃ স্থগিত রইল। মিউজিয়ামের সেই বৃদ্ধের ভবিষ্যদ্‌বাণীই কি ফলতে শুরু করল নাকি?

—তোমাকে হারিয়ে আমরা দুঃখিত হলাম, বন্ধুটি আবার বলে—কারণ আমরা জানি যে তোমার অসামান্য প্রতিভা তোমায় প্যারীর সর্ব্বোচ্চ বিচারাসন থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কয়েদখানা পর্য্যন্ত যতগুলি স্থান আছে তার যে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। শোন, এবার তোমায় একটা সুখবর দিচ্ছি। তুমি জান যে দেশের রাজনৈতিক যাদুকরদের হাতে রাষ্ট্রের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। রাজা জনতার কাছে পরাজিত হয়েছেন। দেশ তাঁকে বৃদ্ধা রক্ষিতার মতো পরিত্যাগ করে নূতন তরুণী স্ত্রী গ্রহণ করেছে। ব্যবসায়ী ও আইনজীবীরাই হচ্ছে দেশের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা। রাজ-

তন্ত্রের প্রকৃত শাসক পুরোহিত সম্প্রদায়ের মতোই তারা কতকগুলি প্রাচীন আদর্শকে নতুন পোষাক পরিয়ে তাই দিয়ে জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছে। আর আমাদের মতো যারা ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা দু'টোকেই ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাদের পক্ষে বর্ত্তমানে প্যারীই হচ্ছে তীর্থস্থান। এখানে বিদ্যা বুদ্ধি শান্তি স্বাধীনতা নারী ও সুরার স্রোত বইছে। শোন বন্ধু, এই মহাশুভক্ষণে দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংবাদপত্রখানির সম্পাদকের শূন্যপদ পূর্ণ করবার জন্যে তুমি মনোনীত হয়েছ। এখন থেকে দেশের জনমতের নিয়ন্তা হচ্ছ তুমি। সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রনেতাদের পর্য্যন্ত নির্ভর করে থাকতে হবে তোমার বিচারের উপর। এক কথায় দেশের শাসনদণ্ডটাই তোমার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তুমি শুধু সুন্দরী তরুণীদের কুসুমপেলব বাহু জড়িয়ে ধরে, আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে সকাল সন্ধ্যা সুবিধা মতো তোমার রাজনৈতিক মতবাদের পরিবর্ত্তন করে যাবে। এখন চল, ঐ পত্রিকার মালিকের বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ আছে আজ। যে সমস্ত প্রবীণমস্তিষ্ক বুদ্ধিজীবীর দল সদা-সর্ব্বদা অষ্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার গোপন উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকেন, সেখানে গিয়ে তুমি তাঁদের মধ্যমণি হয়ে বসবে। মিরাবো, টেলিয়ারেণ্ড, পিট, মেটারনিককে সৃষ্টি করেছেন যাঁরা, তুমি হবে তাঁদের মুকুটহীন সম্রাট। ওকি র‍্যাফেল, তুমি আমার কথা শুনছ না?

—হ্যাঁ, বলে চমকে উঠল র‍্যাফেল। সে সত্যই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তার এই আকস্মিক ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না সে। কিন্তু চামড়াখানার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে বিশ্বাস করতেও তার মন সায় দিল না।

—কিন্তু মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি তোমার ঠাকুর্দার মৃত্যুর কথা ভাবছ।

—আঃ, র‍্যাফেলের এই অস্ফুট উক্তি শুনে তার সাংবাদিক বন্ধুরা উচ্চস্বরে হেসে উঠল।

—আমি ভাবছিলাম, র‍্যাফেল বলে—এখন থেকে আমাদের অধঃপতন শুরু হলো। এতদিন আমাদের সময় কেটেছে বই পড়ে আর মানুষ দেখে। কিন্তু রাজনীতিতে নামলেই আমরা জীবনের সমস্ত আদর্শ হারিয়ে ফেলব। আর এই প্রথম অপরাধ করতেই যখন এত আনন্দ হচ্ছে তখন জীবনে আমাদের অনুশোচনা আসবে না কোনদিন।

—র‍্যাফেল, অপরাধপ্রবণতা হচ্ছে বর্তমান সভ্যতার অন্যতম অবদান। ঠক ও জলদস্যুদের জীবন প্রায়ই আমায় আকৃষ্ট করে। লর্ড বায়রণের মতো বোটানে উপসাগরে যেতে সাধ হয়। দুপুরের আহারের পর হাতে কোন কাজ না থাকলে তাঁরই মতো আমারও মানুষের মাথা ভাঙতে ইচ্ছা করে।

র‍্যাফেল উৎসাহের সঙ্গে বলে—এমিল, আমার উপরে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব না পড়লে এতদিনে হয়ত সন্ন্যাসী হয়ে যেতাম।

—রোজ বাইবেল পড়তে তুমি ?

—হ্যাঁ।

—তুমি একটা আস্ত ভণ্ড।

—তুমি রোজ খবরের কাগজ পড় না ?

—একজন সাংবাদিকের যেভাবে পড়া উচিত সেভাবে পড়ি। কিন্তু এ আলোচনা এখন থাক, সংবাদপত্রের অসংখ্য পাঠকেরা আমাদের পাশ দিয়ে চলা-ফেরা করছে। কথাটা তাদের

কানে গেলে আর রক্ষা থাকবে না। সংবাদপত্রই হচ্ছে আধুনিক সমাজের বেদ—সামাজিক প্রগতির তত্ত্বধারক।

কথা বলতে বলতে তারা এসে জোবার্ট রোডে উপস্থিত হল।

র‍্যাফেলের বন্ধু এমিল হচ্ছে একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। শক্তিমান সমালোচক হিসাবেও খ্যাতি আছে তার। অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও সে সুযোগ পেলেই ঠাট্টা করে—বিদ্রূপ করে জর্জরিত করে তোলে। আবার প্রয়োজন হলে তাদের সম্মান রক্ষার জন্য অপরের সঙ্গে হাতাহাতি করতেও পিছ-পা হয় না। হাসিখুশী দিলদরিয়া জীবন্ত স্বভাবের লোক সে। জীবনে উচ্চ আশা আছে কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে কোন সুসংবদ্ধ প্রয়াস নাই। হঠাৎ যখন উত্তেজিত হয়ে উঠে তখন দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যায় আবার উত্তেজনা একটু কমে এলেই চুপচাপ বসে পড়ে। নিয়মিত ভাবে কোন রুটীন মেনে চলা তার ধাতে সয় না।

রাস্তার পাশে একখানা বাড়ীর সুদৃশ্য কার্পেটে ঢাকা সিঁড়িগুলি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলল—এই বাড়ীতে যেতে হবে আমাদের।

—সুন্দর সাজান ঘরে বসলে আমি আমার লুপ্ত প্রেরণা ফিরে পাই, র‍্যাফেল বলে।

—তাছাড়া ওখানে গিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে একটু আধটু ফূর্তিরও সুযোগ পাওয়া যাবে বোধ হয়, বলে এমিল সশব্দে হেসে উঠে।

তারা সকলে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল। ঘরখানি উজ্জ্বল আলো ও দামী আসবাবপত্র দিয়ে সাজান। প্যারীর অভিজাত সমাজের বহু যুবক ইতিমধ্যেই সেখানে এসে সমবেত হয়েছে। তাদের গল্প-গুজবে মুখরিত হয়ে উঠেছে গোটা পরিবেশ। আত্ম-

প্রশংসা ও আত্মপ্রচারের প্রতিযোগিতা লেগে গেছে যেন। একজন তরুণ শিল্পী তারস্বরে নিজেকে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সমকক্ষ বলে ঘোষণা করছে। একজন নবীন সাহিত্যিক উৎসাহের আধিক্যে নিজেকে যুগপ্রবর্ত্তক বলে দাবী করে বসল। রাজনৈতিক প্রবন্ধকার যুবকটি পাশের কবিকে বললে যে তার অন্তরের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে মগজে থাকত যদি প্রতিভা তবে কবি হিসাবে তার সাফল্য অনিবার্য্য ছিল। এমনি ধরণের সব আলোচনা চলছে। এদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া আর প্রায় সকলেই হয়ত সম্পূর্ণ অখ্যাত অজ্ঞাত ভাবে একদা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে। তবুও ভবিষ্যতের সোনার স্বপ্ন দেখছে সবাই।

বাড়ীর কর্ত্তা সুন্দর পোষাক পরে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই বিরাট্ উৎসবটা যে তাঁরই টাকায় নির্ব্বাহ হচ্ছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুচেতন আছেন তিনি। অতিথিরা আসছে আর তিনি দৃষ্টি তুলে স্মিতহাস্যে তাদের অভ্যর্থনা করছেন। অবশেষে যে নোটারীর আপিসে পত্রিকার দলিলদস্তাবেজ তৈরী হয়েছিল তাঁকে আসতে দেখে অভ্যাগতদের অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে সংবর্দ্ধনা জানায়। তারপর চাকর এসে খাবার ঘরের দরজা খুলে দিতেই সকলে উঠে গিয়ে টেবিলের পাশে বসে পড়ে। র‍্যাফেল যাচ্ছিল সকলের শেষে। সে যেতে যেতে গৃহসজ্জার পানে তাকিয়ে খুশী হয়ে উঠে। স্বর্ণখচিত দামী রেশমী পর্দ্দা দিয়ে ঘরখানিকে প্রেক্ষাগৃহের মতো মনোরম করে সাজান হয়েছে। সুদৃশ্য দীপাধারে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলছে। ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিগুলি ঝলমল করছে আলোর রশ্মিরেখায়। স্তবকে স্তবকে সজ্জিত রয়েছে সব দুষ্প্রাপ্য ফুল। সুগন্ধে নেশা লাগে যেন। র‍্যাফেল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আপন মনে বলে উঠে—এইত জীবন।

অন্ততঃ এক বছরও যদি এমন ধারা ঐশ্বর্য্যের মাঝে ডুবে থাকতে পারি তাহলে পরিণামে কি হবে তার জন্য মোটেই পরোয়া করি না। ঐ এক বছরেই জীবনের সমস্ত মধু নিংড়ে নেব আমি।

কথাটা এমিলের কানে যেতেই সে গম্ভীরস্বরে বলে—বোকার মতো কথা বলনা। অতি শীগ্‌গিরই তোমার ভোগে অবসাদ এসে যাবে। ঐ লোকটার পানে একবার তাকিয়ে দেখ, মনে হচ্ছে যেন শুধু মাত্র আমাদের জন্যই সারা জীবন অর্থ উপার্জ্জন করে এসেছে। দীপদান আর ফুলগুলি কেমন চমৎকার দেখেছ? কিন্তু এত টাকা ও পেল কোথায়? ওর শত্রুরা বলে যে বিপ্লবের সময় একটা জার্মানকে মেরে ও নাকি তার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে বড়লোক হয়েছে। অমন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে খুনে বলে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় তোমার? যাক, চল এখন খেতে বসিগে। সুযোগ পেলে এক সময় ওকে আমি ওর অতীত জীবনের কথা জিগ্যেস করব।

—এখন না, আগে আমাদের খাওয়া হয়ে যাক আর ও মদে চুর হয়ে বসুক, তারপর জিগ্যেস কর।

দুই বন্ধু হাসতে হাসতে এসে খাবার ঘরে ঢোকে। প্রকাণ্ড একটা লম্বা টেবিলের 'পরে তুষারশুভ্র আবরণ বিছিয়ে তার উপরে খাবারের থালাগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রূপালী পাত্রে প্রদীপের আলো পড়ে স্ফটিকের মতো জ্বলছে। কোনটা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রামধনুর রং। সজ্জিত খাদ্য-সম্ভারের পানে তাকিয়ে ক্ষুধা বাড়ছে—উৎসুক হয়ে উঠছে আহারার্থীর দল। মেডিরা মদ্য পরিবেশিত হবার পর ভোজনপর্ব্ব শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে একখানা বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা উঠল যেন। দ্বিতীয় অঙ্কে অতিথিরা মদের মাত্রা আর একটু বাড়াল। তাদের পাণ্ডুর মুখগুলি রক্তিম

হয়ে উঠল, দৃষ্টি হল উজ্জ্বল। রক্তের চাপে ... কান টকটকে দেখাচ্ছিল। হঠাৎ নিস্তব্ধ ঘরের চারদিক ... ক গুঞ্জরণধ্বনি উঠে সুরার প্রসাদে নীরবতা ভেঙে মুখর হয়েছে সবাই। মাতলামির শুরুতেই ভদ্রতা-বোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না। কথাবার্ত্তা সভ্যতার সাধারণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। তারপর শুরু হয় ঠাট্টা তামাসা। অবশেষে—শেষ অঙ্কে কদর্য্য গালাগালি ক্রুদ্ধ কেউটের মতো ফণা তুলে পরস্পরকে দংশন করতে থাকে। দুই একজন লোক তখনও গম্ভীর হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করে। গৃহস্বামী টেলিফারের আদেশে এইবার টকীর কড়া মদ এল। অতিথিরা খাবার খায় আর বেপরোয়া মদ গিলতে থাকে। যুক্তি-তত্ত্ব ও প্রশ্নের গণ্ডি ডিঙিয়ে রেসের ঘোড়ার মতো কথার তুবড়ি ছোটে। শেষে কথাও আর বোঝা যায় না। অসংখ্য কণ্ঠের সম্মিলিত চীৎকারে একটা প্রচণ্ড হৈ হৈ শব্দ শোনা যায় শুধু। অতিথিরা পরস্পরকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করতে করতে প্রতিদ্বন্দ্বে আহ্বান জানায়। মার্জ্জিত বুদ্ধির গর্ব্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। একে অপরের প্রতি ভুল সিদ্ধান্ত, মনগড়া তথ্য আর অর্থহীন যুক্তির আঘাত হানে। মাতলামির এই অপূর্ব্ব দৃশ্যটাকে তুলনা করা যেতে পারে একখানা উপন্যাসের সঙ্গে—একখানা ছবির স... এর সাদৃশ্য আছে কিছু। ধর্ম্ম, দর্শন, নীতি, রাজনীতি আর ম... কে এক-সঙ্গে বেঁধে একই কাস্তে দিয়ে কাটা হচ্ছে যেন। এ... তালের পাণ্ডিত্য না পাণ্ডিত্যের মাতলামি ঠিক করে বলা শক্ত। ...তকগুলি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মন একসঙ্গে সৃষ্টিস্থিতির কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন। বেধে গেছে বুদ্ধির লড়াই। একখানি সংবাদপত্রের শুভ মোহরত উৎসবে ফরাসী বিপ্লবের এই মানসপুত্রদের অসংযত মাতলামির

সঙ্গে মারগেন্টুয়ার জন্মদিনে সমবেত অতিথিদের পানবিহ্বল কণ্ঠের মৃদু রঙ্গালাপের তুলনা করলে মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দী আর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। ষোড়শ শতাব্দী হাসতে হাসতে নিঃশেষিত হয়ে গেছে আর উনবিংশ শতাব্দী জাহান্নামের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মৃতের হাসি হাসছে।......

সহসা নোটারির গর্জিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ওখানে ঐ ছোকরাটি কে হে? কে যেন ওকে ভেলেণ্টাইন বলে ডাকল শুনলাম।

এমিল উচ্চস্বরে হেসে উঠে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভেলেণ্টাইন বই কি! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নাম-গোত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। উনি হচ্ছেন স্পেনের ভ্যালেন্স নগরীর প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ভেলেন্সের মহামান্য বংশধর। প্রাচ্য সাম্রাজ্যের আইনসম্মত উত্তরাধিকারী। কিন্তু অর্থ ও সৈন্যের অভাবে নিজে রাজা না হয়ে মহম্মদকে ভালবেসে কনষ্ট্যান্টিনোপলের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন। বলে সে হাতের কাঁটাখানা দিয়ে র‍্যাফেলের মাথার উপরে শূন্যে একটা রাজমুকুট আঁকার ভঙ্গী করে। এক পাশ থেকে ব্লড ভিগনন বলে উঠে—ঐ উইটিপিগুলোকে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে বলে তোমরা তার গালভরা নাম দিয়েছ ট্রয় বেবিলন আর কার্থেজ মহানগরীর ধ্বংস। কিন্তু শক্তিমানের পায়ের তলায় ওগুলোতো সব সময়ই গুঁড়িয়ে যায়। এটা হচ্ছে মানুষের প্রতি সর্বশক্তিমানের সাবধান সঙ্কেত।

—আমার মনে হয় মুসা, ষোড়শ লুই, রিচেলিউ, রবস্পিয়ার আর নেপোলিয়ন একই ব্যক্তি। উনি আকাশের ধূমকেতুর মতো মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যান। কে একজন কথাটা বলতেই গণতান্ত্রিক ম্যানোল্ প্রতিবাদ করে—কিন্তু মশাই,

আপনার ষোড়শ লুইতো আইনের সংস্কার করে, খাজনা কমিয়ে ধনসাম্য প্রতিষ্ঠা করবার পরিবর্তে হাজার হাজার লোককে মেরে ফেলেছিল।

—মশাই, মদে আপনার মাথা গরম হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে কারও কাটা মুণ্ড জোড়া লাগবে কি? জমিদার মরকান প্রশ্ন করে।

—সমাজ ত্যাগের মূল্য দেয় বই কি?

সহসা একটি যুবক প্রায় চীৎকার করে উঠে।

—কি? তুমি গণতন্ত্রের জন্যে একজন জমিদারের মাথা উৎসর্গ করতে চাও?

গণতান্ত্রিক শান্তস্বরে বলে—রাজনীতিতে উদ্দেশ্য আর আদর্শ ছাড়া অন্য কিছুর—এমন কি মানুষের জীবনেরও কোন মূল্য নেই।

—কি ভীষণ! আপনি দেখছি এই সামান্য অজুহাতে আপনার বন্ধুকেও হত্যা করতে পারেন।

—পাপ করে যে অনুতপ্ত হয় সে হচ্ছে প্রকৃত অপরাধী। কারণ পুণ্য সম্বন্ধে তার একটা ধারণা আছে। কিন্তু আলবার ডিউকের ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার ছিল না। তাঁর ছিল শুধু ব্যবস্থা আর প্রতিষ্ঠান।

—সমাজ কি আপনার ঐ ব্যবস্থা আর প্র[illegible]ন ছাড়া চলতে পারে না?

—আদিতে হয়তো পারত কিন্তু এখন আর পারে না।

—আপনাদের গণতন্ত্রের বোকামির কথা ভা[illegible]ই আমি বিরক্ত হয়ে উঠি। শুনেছি সেখানে নাকি একটা রসুনের কোয়া ছাড়াতে হলেও কৃষি-আইন মেনে চলতে হবে।

জমিদার মরকান বলে—ওহে ক্ষুদে ব্রুটাস, তোমার কথাগুলি

শুনতে ভাল। আমার চাকরটাও ঠিক তোমারই মতো অর্থকে অনর্থের মূল বলে মনে করে। কিন্তু তার হাতে যদি আমার কোটটাও কোনদিন পরিষ্কার করতে দেই তবে সেদিন আমায় খালি গায় বেরুতে হয়।

গণতান্ত্রিক চটে উঠে বলে—পশুর দল! তোমরা ভাবছ যে একটা খড়কে দিয়ে মেরে সমস্ত জাতিকে শায়েস্তা করে দিবে। কিন্তু মনে রেখ ন্যায়ের দণ্ড দস্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

নোটারি সহসা গম্ভীরস্বরে বলে—রাজনীতির কচকচির জ্বালায় অস্থির করে তুলবে দেখছি। শোন, বিজ্ঞান কিংবা ধর্মের চেয়ে এক ফোঁটা রক্তের দাম ঢের বেশী। সত্যকে বাজারে ভাঙ্গাতে নিয়ে গেলে দেখবে সে ইতিমধ্যেই দেউলিয়া হয়ে বসে আছে।

—আমার মনে হয় ভালর জন্যে ঝগড়া না করে সহজলভ্য মন্দটা নিয়েই আমাদের খুশী থাকা উচিত। গত চল্লিশ বছর ধরে অসংখ্য জনসভায় যতগুলি বক্তৃতা দেয়া হয়েছে তার চেয়ে পিরাল্টের লেখা একটি গল্প কিংবা চার্লেটের আঁকা একখানা ছবির দাম অনেক গুণ বেশী।

—ঠিক বলেছ তুমি, আমার মতে স্বাধীনতা হচ্ছে অরাজকতার সন্তান। আর অরাজকতা আমাদের নিয়ে যায় স্বৈরতন্ত্রে; স্বৈরতন্ত্র আবার স্বাধীনতায় ফিরিয়ে আনে। পৃথিবী চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে। লক্ষ লক্ষ লোক জীবন বিসর্জ্জন দিয়েও এর কেউ সুরাহা করতে পারেনি। মানুষ যাকে পূর্ণতা বলে মনে করে তা হচ্ছে বস্তুর সাধারণ পরিবর্ত্তন।

—চমৎকার, আসুন তাহলে এখন স্বাধীনতার জন্মদাতা দশম চার্লসের স্বাস্থ্য পান করা যাক।

—বিজয়ই—বিজয়ই। আইন যেখানে স্বেচ্ছাচারীর করায়ত্ত সেখানে মানুষ আধ্যাত্মিকতার মাঝেই মুক্তির পথ খোঁজে।

—আসুন তাহলে আমরা সকলে মিলে সেই দুর্বল শক্তির পায়ে অর্ঘ্য দেই—যিনি আমাদের দুর্বলতর করে গড়েছেন।

—কিন্তু আমাদের জন্য নেপোলিয়ন অন্ততঃ কিছু খ্যাতি অর্জন করে রেখে গেছেন।

—খ্যাতি—কঠিনতম মূল্য দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয় কিন্তু চিরদিন ধরে রাখা যায় না। মহাপুরুষদের সুনাম আর মাতালের বন্ধুত্ব—এই দু'টাই সমান ক্ষণস্থায়ী।

—মশাই, আপনি একেবারে—

—বর্ব্বর আর ভাবুকেরাই শুধু সম্পত্তির নাম শুনলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।

—ঠিক বলেছ ভাই, সম্পত্তি না থাকলে আমরা দলিল তৈরী করব কি করে?

—পরদিন দেখা গেল পুরুতঠাকুর বিছানায় পড়ে মরে আছেন।

—এই সাবধান! মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দিও না। আমার এক কাকা এখনও বেঁচে আছেন।

—তিনি মারা গেলে তোমার লাভ বৈ লোকসান হবে না।

—সে কোন কথা নয়—

—ভদ্র মহোদয়গণ, কি করে কাকার হাত থেকে রেহাই পেতে হয় সেই কথা আপনাদের আমি বলছি শুনুন। কাকা যদি মোটা হন তবে তাকে রাজহাঁসের লিভার খাইয়ে দিন। তাহলেই তিনি অক্কা পাবেন।

—কিন্তু আমার কাকা যে লম্বা—দোহারা গড়নের।

—এই রকম লোক হচ্ছে ভয়ানক ধড়িবাজ—এরা স্বাবনের অপব্যবহার করে।

—আচ্ছা, তাহলে আপনি এক কাজ করুন, আপনার কাকা যখন খেতে বসবেন তখন তাঁকে বলবেন যে তাঁর ব্যাংক ফেল পড়ে গেছে।

—তাতে যদি কোন ফল না হয় ?

—তাহলে তাঁকে একটি সুন্দরী মেয়েমানুষ জুটিয়ে দিন।

—কিন্তু তিনি যদি—বক্তা তার বক্তব্যের বাকী অংশটুকু অঙ্গভঙ্গী করে বুঝিয়ে দেয়।

—তাহলে তিনি কাকাই নন। কাকারা সব সময়ই মৈথুনে সক্ষম।

—জ্ঞান ? জ্ঞান হচ্ছে একটা অর্থহীন শব্দ। মিষ্টার হেইন্-একেটারম্যাচ্ বলেন যে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে নাকি একশ' কোটি বই ছাপা হয়েছে। কিন্তু একজন মানুষ সারা জীবনে দেড় লক্ষের বেশী বই পড়তে পারে না। তাহলে আপনারা আমায় বলতে পারেন জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ কি ? কেউ মনে করেন জাহাজ কিংবা পোর্সিলেন আবিষ্কারকের নাম না জানলেও কোন ক্ষতি নাই কিন্তু আলেকজাণ্ডারের ঘোড়ার নাম জানতে পারাটাই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান। আবার কেউ হয়তো বলবেন যে বাইবেল পড়ে সদ্ভাবে জীবন যাপন করাই হচ্ছে জ্ঞানীর লক্ষণ।

—তোমরা সব মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছ।

—নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ভবিষ্যতের সোনার স্বপ্ন দেখে। শিল্পকলা দর্শনবিজ্ঞান সব-কিছুকেই মানুষের অহমিকা দুষ্ট ব্যাধির মতো গ্রাস করে ধরে, আর বুর্জোয়ারা তখন মনের আনন্দে বীজ বুনে যায়। গায়ের জোরে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় আর আমরা আমাদের সমস্ত স্বাতন্ত্র্য এমন কি মৈথুনের স্বাধীনতা-টুকুও হারিয়ে ফেলি।

—কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল সাধনইতো সমাজের একমাত্র লক্ষ্য।

—তুমি যদি বছরে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড উপার্জ্জন করতে পার কোনদিন, তখন আর সাধারণের মঙ্গলের কথা মুখেও আনবে না। এতই যদি মানবতার ভক্ত তুমি তাহলে মেডাগাস্কার চলে যাও না কেন? সাম্যপ্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুযোগ পাবে সেখানে। এদেশে সবার জন্তেই বিভিন্ন স্থান নির্দ্ধারিত হয়ে আছে। কুলী সে চিরদিনই কুলী, তাকে উচ্চশিক্ষা দেবার চেষ্টা করা বোকামি।

—তুমি কি কালিষ্ট নাকি হে?

—হলুমই বা কালিষ্ট, তাতে কোন দোষ আছে কি? আমি একাধিপত্যে বিশ্বাস করি, ঘৃণা করি সমগ্র মানব-সমাজকে। রাজতন্ত্রের 'পরে কোন অবজ্ঞা নাই আমার।

—শোন বন্ধু, বিষয়টা একটু গভীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে দেখ। আদিতে ক্ষমতা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব অর্থাৎ মুষ্টিমেয় শক্তিমানের করায়ত্ত। কিন্তু সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র এসে তাকে দখল করে বসল। প্রাচীন পুরোহিততন্ত্রের হাতেই ছিল তখন রাষ্ট্রের শাসনাধিকার। তারপর এলেন রাজা। পুরোহিত সম্প্রদায় রাজতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিলেন। বর্ত্তমানে সভ্যতার শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে সমাজ রাষ্ট্রশক্তিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। কলকারখানার মালিক, বুদ্ধিজীবী, বক্তা আর ধনীরা একসঙ্গে মিলে নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের শাসনদণ্ড। রাষ্ট্রশক্তি ক্রমেই আপনাকে ছড়িয়ে ফেলছে জনসাধারণের মধ্যে। এখন আর ধর্ম্ম কিংবা গায়ের জোরের উপর কারও বিশ্বাস নাই। মননশক্তিই হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের একমাত্র শক্তি। বুদ্ধিবল বাহুবলের সাহায্য চায় কি না এইটাই হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের একমাত্র সমস্যা।

—বুদ্ধির চর্চাই আমাদের সমস্ত শৌর্য্যবীর্য্য নষ্ট করে দিয়েছে। আত্মার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা জাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।

—আপনি নূতন কিছু বলতে পারলেন না। বর্ত্তমান সমাজ ধর্ম্মবল আর বাহুবল দু'টোকেই পরিত্যাগ করে বৃদ্ধ সুলতানের মতো বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়েছে।

—আপনারা জানেন? এক ডোজ্ ক্যল্‌ক্যাস খাইয়ে যে কোন সাধারণ লোককে প্রতিভাবান, গুণ্ডা, বুদ্ধিমান, বোকা, ধার্ম্মিক কিংবা চোর-ডাকাত করে তোলা যায়।

—এই! ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন অবজ্ঞার কথা বল না। ধর্ম্ম হচ্ছে সমস্ত নাটকের প্রাণশক্তি, সমালোচনার ভিত্তি।

—চুপ কর্ অর্ব্বাচীন! তোর ধর্ম্ম হচ্ছে খোঁড়া-পা এচিলের মত।

—তবে একথা ঠিক যে অনুকূল জনমত তৈরী করতে পারাটাই হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ।

—জনমত? জনমত হচ্ছে স্রষ্টার চেয়েও ভয়ঙ্কর। জনতার কাছে আজ যেটা ন্যায় কালই আবার সেটা ঘোর অন্যায়।

—এই! জনমতকে গালাগালি দিও না বলছি।

—ক্যাথলিকইজম যদি শতসহস্র দেবদেবীকে মর্য্যাদার বন্যায় পুরতে পারে, গণতন্ত্র যদি নেপোলিয়নকে ছেঁড়া জুতার মতো ছুড়ে ফেলে দেয়, জনতার রাজভক্তি যদি এসে রূপান্তরিত হয় ষষ্ঠ হেনরী আর ষোড়শ লুইয়ের হীন হত্যায়, তাহলে তোমাদের জনমতকে শ্রদ্ধা করি কি করে বল?

—কেণ্ট্ যেন শুধু মাত্র বোকাদের খুশী করবার জন্যেই শূন্যে একটা বেলুন্ ছুড়ে দিয়েছিলেন। বস্তুবাদ আর অধ্যাত্মবাদ হচ্ছে দুইখানি র‍্যাকেট, ভণ্ডের দল তাই দিয়ে একই সাটেল্‌কর্ক পিটায়।—মূর্খের

দল! যে শক্তি দরজা খোলে, সেই আবার দরজা বন্ধ করে। প্রথম জন্মেছিল কি ডিম না মুর্গী?

—চুপ কর্ মূর্খ! এই সমস্যার যে সমাধান হয়ে গেছে তা বুঝি তুই জানিস্ না?

—কি সমাধান হল?

—দর্শনশাস্ত্রের জন্তে অধ্যাপকের আসন, আসনের জন্ত দর্শনশাস্ত্র নয়।

—চোর!

—মূর্খ!

—গুণ্ডা!

—বদমায়েস!

—পাজি!

গৃহস্বামী টেলিফারের পাশে বসে এমিল আর র‍্যাফেল কথাবার্তা বলছিল। এমিল টেলিফারকে শুধায়,

—আপনি কি সত্যিই তাকে হত্যা করেছিলেন?

টেলিফার শান্ত কিন্তু নির্ভয়স্বরে বলে—জুলাই বিপ্লবের স্বার্থের পানে চেয়ে হত্যা করবার প্রয়োজন ছিল।

র‍্যাফেল প্রশ্ন করে—আপনি তাকে কখনো স্বপ্নে দেখেন?

—তারও একটা প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছি আমি।

—তার কবরের গায়ে ভাস্কর এসে খোদাই করে দিবে—পথিকবর! এই সমাধিভূমিতে একবিন্দু অশ্রু মোচন করে যাও···কোন গণিতজ্ঞ যদি বীজগণিতের সমীকরণ দিয়ে আমায় নরকের অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিতে পারত তবে তাকে একশ' টাকা পুরস্কার দিতাম। কি যে বিশ্বাস করব বুঝে উঠতে পারি না। পোপের জপমালা আর জ্যামিতির অসম্ভব সব সম্পাদ্য উপপাদ্য কোনটাতেই আমার আস্থা নেই।

—পেটারনস্টার আমাদের অনেক-কিছু দিয়েছে। শিল্প, কলা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এমন কি রাষ্ট্র পর্যন্ত তারই অবদান। সমাজের পাঁচশ' লোক একসঙ্গে বসে পরস্পরকে প্রশমিত করে বলেই সভ্যতা অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায়। সভ্যতাই স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝে মানুষের নির্বাচিত অছি রাজাকে পদচ্যুত করে। তারপর এত সব সৃষ্টির মাঝে নাস্তিকতা এসে দেখা দেয় নেহাত অক্ষম কঙ্কালের মতো।

—ক্যাথলিকইজম যে কত কলঙ্ক রক্তপাত করেছে তা ভাবলে আমার শরীরের স্নায়ু-শিরায় টান ধরে। তবুও ওদের মধ্যে প্রকৃত সত্যসন্ধানী যাঁরা ছিলেন তাঁরা খ্রীষ্টের পতাকাতলে সমবেত হতে পেরেছেন। প্রভুই স্বয়ং বস্তুর উপরে আত্মার বিজয় কেতন উড়িয়ে গেছেন।

হঠাৎ খানসামা এসে জানায় যে বসবার ঘরে কফি দেওয়া হয়েছে। এদিকে অতিথিদের মন এতক্ষণে সম্পূর্ণভাবে মাতাল হয়ে উঠেছে। আত্মার শেষ আলোটুকুও গেছে নিভে। প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতায় একান্তভাবে দখল করে বসেছে তাদের মদবিহ্বল দেহ। চরম অবস্থা যাদের তারা নিজেরাই বুঝতে পারছে না যে তারা বেঁচে আছে না মরে গেছে, তাই একটা-কিছু করতে চাইছে। আর একদল বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে মড়ার মতো পড়ে আছে। কেউ কেউ এখনও কথা বলছে, অবশ্য কি কথা বলছে তা তারা নিজেরাই জানে না। এমন সময় খানসামার আহ্বানে মাতালের দল নবতম সম্ভোগের আশায় প্রলুব্ধ হয়ে উঠে। একে অপরের কাঁধে ভর দিয়ে কোনমতে পাশের ঘরে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু ঘরে ঢুকেই স্থির নিস্পন্দ হয়ে যায় তারা। ইন্দ্রিয়কে মুগ্ধ করবার জন্যে—মত্ত করবার জন্যে এইবার গৃহস্বামী

যে আয়োজন করেছেন তার কাছে ভোজের সমারোহও ম্লান হয়ে আসে। সোনালী ঝাড়লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোর নীচে একটা গোল টেবিলের চারদিক ঘিরে বসে আছে একদল সুন্দরী যুবতী। তাদের বিলাসবিহ্বল চোখের তারাগুলি হীরার মতো জ্বলছে। যৌবনস্ফীত দেহের সৌন্দর্য্যসুষমা ঘরের উজ্জ্বল আলোককেও যেন ম্লান করে দিয়েছে। মোহিনীদের কুন্তলসজ্জা আর ইঙ্গিতপূর্ণ দেহভঙ্গী দেখলে চোখে নেশা লাগে। মনে হয় কে যেন নীলা পলা আর মাণিক্য-খচিত একতোড়া ফুল এনে ঘরের মাঝখানে সাজিয়ে রেখে গেছে। তাদের তুষারশুভ্র কণ্ঠের কালো হারের পানে চাইলে অতি বড় সংযমীর মনেও জাগে রিরংসা। বস্ত্রের আবরণের ভিতর থেকে সুন্দর ছোট্ট পাগুলি উঁকি মেরে প্রেমের স্পর্শ চাইছে যেন। রক্তিম অধর ঘোষণা করছে যৌবনের অনন্ত আহ্বান। মেয়েদের মধ্যে কয়েকটি সবে মাত্র যৌবনে পা দিয়েছে—দেহ তাদের এখনও যৌবন দেবতার অকৃপণদানে পরিপূর্ণরূপে ভরে উঠেনি। আর একদল যৌবনভারে টলমল করছে। দেহপসারিণীরূপে বহুবার বহু অতিথির মনোরঞ্জন তারা করেছে সত্য কিন্তু বয়সের গুণে মুখের কুমারীসুলভ পবিত্রতাটুকু এখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তবে প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় যে তাদের দৃষ্টির ঐ স্বেচ্ছাকৃত সারল্য এখনই এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া চলে। অবশিষ্ট রমণীর দল প্রায় যৌবনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। দেহের লুপ্তপ্রায় রূপশ্রীর কুশ্রীতাকে ঢাকবার জন্যে অভিজাতসুলভ মার্জ্জিত ভঙ্গীতে বসে আছে তারা। দেখলে মনে হয় যেন সমাজের উচ্চশ্রেণীর অনূঢ়া কন্যারা সব। ওদের রজনীর নর্মসহচরীরূপে পেতে হলে চড়া দাম দিয়ে ঐ আভিজাত্যের পাঁচিল ভাঙ্গতে হবে প্রার্থীকে। দলের মধ্যে ইংরেজ মেয়ে আছে

একটি। তার ফর্সা মুখশ্রী স্বর্গভ্রষ্টা দেবকন্যার মতো বিষাদে পাণ্ডুর। আর প্যারীর সুন্দরীরা তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে দেহের আবরণ ও আভরণের মহার্ঘতা দিয়ে। উৎকৃষ্ট প্রসাধন আর অবলার বল দুর্বলতায় সুসজ্জিত হয়ে বসে আছে তারা। মোহিনী হলেও মুখ-চোখগুলি ওদের নিষ্কাম নির্বিকার। বিভিন্ন বয়সের রূপোপ-জীবিনীদের এই অপূর্ব সমাবেশের পানে চেয়ে মনে হয়, ওরা যেন প্রাচ্য দেশের একদল ক্রীতদাসী। প্রভুর আদেশে সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসে ক্রেতার সম্মুখে পরীক্ষা দিতে বসেছে। মেয়েগুলির মুখ ব্রীড়ারক্তিম। ওটা অবশ্য অভিনয় না নারীর সহজাত লজ্জা তা ঠিক করে বলা শক্ত। কারণ সাধারণতঃ মেয়েরা কোন অবস্থাতেই লজ্জার এই সূক্ষ্ম আবরণটুকু বিসর্জন দিতে চায় না, ওই দিয়ে তারা পুরুষের কামনাকে তীব্রতর করে নিজেদের আকর্ষণ বাড়ায়।

টেলিফারের অভ্যাগতরা কিন্তু এই রাজসিক অভ্যর্থনার সুযোগ পুরামাত্রায় গ্রহণ করতে পারল না। প্রথম দর্শনেই নারীর সহজাত আকর্ষণী শক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল তারা। কলকণ্ঠে চারিদিক থেকে প্রশংসার গুঞ্জন উঠল। কিন্তু প্রেমের মোহ আর সুরার মত্ততা বেশীক্ষণ একসঙ্গে টিকতে পারে না। নারীসৌন্দর্যের তীব্রতম আঘাতেও এই মাতালদের মনে কামনার ঝড় উঠল না। তারা অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যিক অনুপ্রেরণায় মুগ্ধ চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে মেয়েদের দেহশ্রীর পানে তাকাতে লাগল। অতিথিদের দার্শনিক বন্ধুটির সহসা মনে হল এই সমস্ত নারীরাই পৃথিবীতে নরকের বিভীষিকা বয়ে আনে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ এক পাত্র দ্রাক্ষারসে খানিকটা কার্বনিক অ্যাসিড পড়ল যেন। কিন্তু তিনি যদি আর একটু তলিয়ে দেখতেন তাহলেই জানতে পারতেন যে উপস্থিত

প্রত্যেকটি নারীর জীবন-ইতিহাস দিয়ে রচিত হতে পারে এক একখানি করুণ বাস্তব নাটিকা। পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতায় ওদের সমস্ত সুখের স্বপ্ন অকালে মিলিয়ে গেছে। তারপর আবার পুরুষেরই হাতে সইতে হয়েছে অসহ্য নারকীয় অত্যাচার।

অতিথিরা প্রথমে ভদ্রভাবেই মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে শুরু করে। স্থানে স্থানে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বসে যায় সবাই। এখন ওদের দেখে মনে হয় যেন সকলে মিলে একটা পার্টিতে বসেছে। অভিজাত ঘরের মেয়েরা সম্ভ্রান্ত অতিথিদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সহসা সংযমের আবরণ খসে গিয়ে মত্তকণ্ঠের উচ্চহাসির তুফান উঠে। তারপর শুরু হয় চীৎকার আর ধস্তাধস্তি। মাঝে মাঝে ওরা থামে আবার পূর্ণতেজে শুরু করে। দূর থেকে সমবেত কণ্ঠের এই কোলাহলকে যন্ত্রসঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতো শোনা যায়।

এমিল আর র‍্যাকেল এতক্ষণ একপাশে একখানা সোফায় চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ একটি দোহারা-গড়ন মেয়ের মোহময় মুখখানি কতকটা যেন জোর করেই ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার চিকন কালো কোঁকড়া চুলগুলি ঘাড়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে। কণ্ঠে জড়ানো একখানা বাদামী রংয়ের রেশমী রুমালের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে উঠেছে মসৃণ সৌন্দর্য্যরেখা। তার তুষারশুভ্র দেহের উন্নতা বক্ষের আবরণ টুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। উজ্জল দুটি আঁখিতারা আর ঈষদুন্মুক্ত রক্তিম ঠোঁট দুখানি চুম্বনের আহ্বান জানাচ্ছে। মেয়েটির দেহব্যবস্থায় কাঠিন্য আছে বটে কিন্তু সোহাগের স্পর্শ পেলেই ঋজু দেহখানিই আবার পল্লবিতা লতার মতো এলিয়ে পড়বে বলে মনে হয়। সুগঠিত স্তন-যুগল

আর শুভ্র বাহু দুখানি যেন পাথর কেটে তৈরী করা হয়েছে। প্রাণ-ঐশ্বর্য্যে ভরপুর ঐ তন্বী দেহখানির রেখায় রেখায় রচিত হচ্ছে মদনের মরণশয্যা। মেয়েটির উচ্ছল হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে ঘোষিত হচ্ছে সমস্ত চিন্তা-চেষ্টার মহাবসান। ওর রূপ-ঐশ্বর্য্য পুরুষচিত্তে বিক্ষোভের সঞ্চার করে কিন্তু তাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। অনভিজ্ঞ তরুণ মনে কামনার আগুন জ্বালাতে ওর চোখের একটি কটাক্ষই যথেষ্ট। মেয়েটিকে প্রাচীন গ্রীক ভাস্করের খোদিত একখানি দেবীমূর্ত্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দূর থেকে দেখতেও সুন্দর—: স্বর্গীয়, কিন্তু কাছে এলেই চোখে পড়ে ওর দেহের নগ্ন কাম-কলুষতা। এমিলের কিন্তু মেয়েটিকে একটা মূর্ত্তিমতী দানবী বলে মনে হয়। দানবীর মতোই ছলনাময়ী ও। মুহূর্ত্ত মধ্যেই ওর দুটি চোখের পাতা স্নেহাশ্রুতে সিক্ত হয়ে উঠতে পারে। আবার পরক্ষণেই হয়তো ওর অধরে ফুটে উঠবে শয়তানীর শানিত হাসি, ওর নগ্ন দেহের একটিমাত্র আলিঙ্গনের মধ্যেই চকিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠবে নারীদেহের সমস্ত মাদকতা। কিন্তু ওর মনে নাই বিষাদের রেশ, দেহে নাই কুমারীর সলাজ নম্রতা। মেয়েটি গর্ব্বিত ভঙ্গীতে একটা ট্রে এমিলের দিকে এগিয়ে দেয়। পুরুষের সম্ভোগ ও সম্পদের মূর্ত্তিমতী আরাধ্য দেবী এই নারী নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। আর সচেতন বলেই সে গর্ব্বিতা। কারণ সে জানে যে তার সামান্যতম ইঙ্গিত পেলেই লুব্ধ পুরুষের দল ছুটে এসে তার পায়ের তলায় ঊর্দ্ধতন তিনপুরুষের সঞ্চিত অর্থ মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিবে। সে একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে র‍্যাফেল ও এমিলের দিকে তাকায়। র‍্যাফেল প্রশ্ন করে,

—তোমার নাম কি?

—একুলিনা।

—ইতালির মেয়ে তুমি?

—হ্যা, তবে পোপরা যেমন পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের নাম পাল্টায়, আমিও তেমনি আর সব মেয়েদের চেয়ে বেশী সুন্দরী বলে/নতুন নাম নিয়েছি। মেয়েটির এই প্রগলভতায় এমিল উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে—তোমারও বোধ হয় এমন একজন ভালবাসার মানুষ ছিল, যে তোমার একটা মুখের কথায় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারত।

—হ্যা ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধে তার ফাঁসি হয়েছে। তার কথা সর্ব্বদা মনে রাখবার জন্যেই আমি এই লাল পোষাক পরি।

—এই সেরেছে! ও একবার ওর পুরানো পিরিতের কেচ্ছা শুরু করে দিলে আর যে থামবে না। দয়া করে একটু চুপ কর একুলিনা, তোমার ঐ গল্প এমন কিছু নতুন নয়। প্রায় প্রত্যেক মেয়েমানুষেরই উঠতি বয়সে অমন দু'চারটা প্রেমিক থাকে। বলতে বলতে কিশোরীর মতো চঞ্চলা একটি মেয়ে এসে ওদের কাছে বসল। মেয়েটিকে দেখে মনে হল যেন রূপকথার এক পরী হঠাৎ সাগরতল থেকে উঠে এসেছে। ওর বালিকাসুলভ সুন্দর সরল মুখখানিতে জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝার কোন চিহ্ন নাই—নাই কামজ লালসার কোন ছায়া। এমিল ও র‍্যাফেল মেয়েটির পুষ্প-কোরকের মতো সহজ সুন্দর মুখখানি দেখে মুগ্ধ হয়ে, ওকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। মেয়েটির নাম ইফ্রোসিয়া। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু ইফ্রোসিয়ার স্বরূপ ধরা পড়ে যায়। তীব্র কামাতুরা এই নারীর অন্তরে লালসা-বহ্নি অনবরত দাবানলের মতো জ্বলছে। হৃদয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই ওর জীবনের একমাত্র ব্রত যেন।

চরম চরিত্রহীনতাও ওর তুহিনশীতল মনের উপরে বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারেনি। এক্যালিনা জীবন্ত। তার সবল দেহের কানায় কানায় ফুটে আছে অন্তরের দুর্দম কামনার সরল অভিব্যক্তি। কোনরূপ ছলাকলার ধার ধারে না সে। কিন্তু ইক্রোসিয়া ছলনাময়ী। সে তার দেহ ও মনের সমস্ত গ্লানি, প্রবৃত্তির সবটুকু নগ্নতা সুকৌশলে ঢেকে রেখেছে কুমারীসুলভ সলজ্জ সারল্যের আবডালে। ভ্রষ্টা এক্যালিনার আত্মা এখনও একেবারে মরেনি কিন্তু কামাতুরা ইক্রোসিয়ার আত্মা একেবারে জাহান্নামের অতলতলে তলিয়ে গেছে। ও মুখের হাসি বজায় রেখেই পৃথিবীর যে কোন পাপ, যে কোন অপরাধ অনায়াসে করতে পারে। তার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে এমিল এক সময় রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করে—তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কখনও ভেবে দেখেছ কি? ইক্রোসিয়া লীলায়িত ভঙ্গীতে বলে—ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যৎ আবার কি? অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ কোনটা নিয়েই আমার মাথাব্যথা নাই। কারণ আমি বেশ ভাল করেই জানি যে শেষ বয়সে আমাদের মতো মেয়ের একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে অনাথ-আশ্রম।

—তবু ভয় করে না তোমার? র‍্যাফেল প্রশ্ন করে।

উত্তর দেয় এক্যালিনা—ভয় কিসের? আমরা কারও স্ত্রীও নই কিংবা কোন সন্তানের মাও নই। যখন বুড়ো হয়ে যাব, সারা মুখে ফুটে উঠবে বয়সের কালো শিরা তখন সুসময়ের বন্ধুরা আমাদের দেখে ঘৃণাভরে দূরে সরে যাবে। আর আমাদের প্রয়োজনও আসবে কমে, তাও শুষ্ক কঙ্কালসার দেহকে ছেঁড়া পোষাক দিয়ে ঢেকে রাখতে কোন লজ্জা করবে না। সুন্দর সাজান ঘরে শৌখিন কুকুর কোলে নিয়ে বসে থাকা আর অনাথ-আশ্রমের নোংরা মেঝের উপর বসে ছেঁড়া কম্বল বাছা এই দু'টোর মধ্যে প্রভেদ কি আমায় বলতে পার? বুড়ো

বয়সে ময়লা রুমালে শনের মতো সাদা চুলগুলো ঢেকে ঝাড়ু হাতে সদর রাস্তা ঝাঁট দেয়া আর সাটিনের পোষাক পরে নাচের মজলিসে ঘোরার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কতটুকু ?

—তুমি ঠিকই বলেছ এক্যুলিনা, যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাজসজ্জা সোনাগয়না সব-কিছুই চলে যাবে। শেষ বয়সে হয়তো নিজেদের ভয়ানক বোকা বলে মনে হবে আর তখন অতীতের সুখের স্মৃতিই আমাদের চরম আত্মগ্লানি থেকে ভুলিয়ে রাখবে। ওকি! তোমরা হাসছ যে ? বলে ইক্রোসিয়া সর্পিল দৃষ্টিতে এমিল ও র‍্যাফেলের পানে চেয়ে আবার বলে —আমার কথা সত্য কিনা বল ? বুড়ো বয়সে অভাবে পড়ে রোগে ভুগে তিলে তিলে মরার চেয়ে উচ্ছল সম্পদ ও সম্ভোগের মাঝেই মরতে চাই আমি। বেশীদিন বাঁচবার ইচ্ছা আমার নেই। কোন মানুষকে বিন্দুমাত্রও ভালবাসি না। তোমরা যদি আমায় লক্ষ টাকাও দাও, একদিনেই তা খরচ করে ফেলব। আগামী কালের জন্তে একটি পয়সাও সঞ্চয় করে রাখব না। ভোগবিলাসের মাঝে শৌখিন জীবন যাপন করতে চাই আমি। আর সমাজও আমায় সর্ব্বদাই সেই সুযোগ দিচ্ছে। মিথ্যাই তোমরা ঐ অনাথ-আশ্রমগুলি তৈরী করেছ। ঈশ্বরই আমাদের জন্য চরিত্রহীন ধনীদের সৃষ্টি করেছেন আর হাতে পেয়ে এমন সুযোগ গ্রহণ না করাটা হচ্ছে বোকামি।

—কিন্তু যাদের এই যোগ্যতা নেই তারা কি করবে ?

—যা খুশী তাই করুক তারা। অপরের দুঃখ দেখলে আমার হাসি পায়। কেউ এখন আর আমায় কোন ব্যথাই দিতে পারে না।

র‍্যাফেল ব্যথিতস্বরে প্রশ্ন করে—জীবনে এমন কি দুঃখ পেয়েছ, যার ফলে তোমার হৃদয় অমনধারা নিরেট হয়ে গেছে ?

ইফ্রোসিয়া এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে বলে—আমার জীবনে প্রথম যে পুরুষ এসেছিল, দিবারাত্র পরিশ্রম করে তাকে আমি খাইয়ে পরিয়ে বহুদিন পর্য্যন্ত রাজার হালে রেখেছিলাম, কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির লোভে একদিন সে আমায় পরিত্যাগ করে চলে গেল। সেই থেকে আমি সাবধান হয়ে গেছি। কারও মুখের হাসি কিংবা কোন প্রতিশ্রুতিই আর আমায় ভুলাতে পারে না। দৈহিক সুখ-সম্ভোগ ছাড়া এখন জীবনে আর কোন উদ্দেশ্য নাই আমার।

—কিন্তু আত্মার অভিব্যক্তিই হচ্ছে প্রকৃত সুখ।

—হয়তো তাই, একুলিনা বলে—কারণ শত প্রশংসায়, সব রকম সুখ-সম্ভোগেও এখন আর আমাদের মন উঠে না। অন্য সব নারী এমন কি পুণ্যবতী সতীসাধ্বীদের চেয়ে বেশী আদর পেলেও আমরা কোন গর্ব্ব অনুভব করি না। প্রতিদিন অসংখ্য লোকের হাজার রকম কথা শুনতে হয় আমাদের।

এমিল র‍্যাফেলকে বলে—অসতী নারী হচ্ছে জঘন্য জীব। কথাটা শুনে ইফ্রোসিয়া আগুনের মতো জ্বলে উঠে তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে বলে—সতীত্ব? সতীত্ব হচ্ছে কুৎসিত কুরূপাদের অঙ্গাবরণ, ও ছাড়া জীবনে আর কোন সম্বল নাই তাদের। এমিল ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বলে—এ আলোচনা থাক। ও বিষয় তোমার কোন ধারণা নাই।

—ধারণা নাই আমার! ইফ্রোসিয়া দৃপ্তস্বরে বলে—কোন একজন চরিত্রহীন কিংবা অযোগ্য পুরুষের পায় জীবন উৎসর্গ করে তার পরিত্যক্ত সন্তানগুলোকে লালন পালন করার নাম দিয়েছ তোমরা সতীত্ব। কিন্তু ঐ গালভরা কথাটার উপর কোন শ্রদ্ধা নেই আমার। আমি স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। যতদিন যৌবন থাকবে ততদিন মন-

মতো পুরুষের সঙ্গে থেকে বুড়ো হবার আগেই যেন মরে শেষ হয়ে যেতে পারি।

—একদিন যে তোমাকে সব পাপের ঋণ শোধ করতে হবে সেই কথা ভেবেও কি একটু ভয় পাও না তুমি?

—না, কারণ আমার জীবনে সুখদুঃখের সংঘাত নাই। সম্ভোগ ও আনন্দের সহজ সরল রাস্তা ধরে চলেছি আমি। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যদি সত্যিই আমাকে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে সেই দুঃখও মুখ বুজে সয়ে যাব।

হঠাৎ একুয়্যালিনা বলে উঠে—ও জীবনে কাউকে কোনদিন ভালবাসেনি। যে কোন একজন বড়লোকের সঙ্গে কিছুদিন বাস করাকেই ও মনে করে প্রকৃত প্রেম।

ইফ্রোসিয়া বলে—প্রেম হচ্ছে হাওয়ার মতো। কখন যে কোন্ দিক্ থেকে বইবে তা কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। তাছাড়া তোমার প্রেমের পাত্র যদি জানোয়ার হয় তাঁহলে ধার্ম্মিক লোকদের দেখলেই ভয় পাবে তুমি।

একুয়্যালিনা ব্যঙ্গের স্বরে বলে—জানোয়ারের সঙ্গে প্রেম করায় আইনের বাধা আছে।

র‍্যাফেল কতকটা যেন আপন মনে বলে উঠে—কেমন খুশী মনে এরা যুক্তিহীন সব আলোচনা করছে।

—খুশী? একুয়্যালিনা বিষাদের হাসি হেসে বলে—ম ভীত মনে ভোগের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করে কেউ কখনও হতে পারে……

অতিথিদের উপবেশন-কক্ষটি এতক্ষণে পুরাপুরিভাবে মিলটন-বর্ণিত শয়তানের দরবারের রূপ পরিগ্রহ করেছে। পান করবার

মতো শক্তি এখনও যাদের অবশিষ্ট আছে তাদের মুখের কাছে মদের নীল ধোঁয়া উঠছে। একদল মেয়ে-পুরুষ মিলে আজব উল্লাসে ছন্দোহীন নাচ নেচে চলেছে। তারা উচ্চস্বরে হাসছে, কখন গলা ছেড়ে চিৎকার করছে। প্রচণ্ড হৈ-হট্টগোলের মধ্যে ঘরখানাকে দেখলে মনে হয় যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। মদের উত্তাপে গরম হয়ে উঠেছে গোটা পরিবেশ ; হাসি, উচ্ছ্বাস, প্রলাপ আর নির্লজ্জ প্রেম-নিবেদনে উদ্দাম হয়ে উঠেছে মাতালের দল। এমিল ও র‍্যাফেল যদিও এখন পর্যন্ত সংজ্ঞা হারায় নাই, কিন্তু তাদের চেতনাশক্তি ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। চোখের সম্মুখের সব-কিছুই যেন লেপে পুঁছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই দুই বন্ধু নেশায় ঢুলতে আরম্ভ করে।

ঠিক এই সময় ভৃত্য এসে টেলিফারের কাছে চুপি চুপি বলে—হুজুর, পাড়াপড়শীরা সব জানালায় দাঁড়িয়ে গালাগালি দিচ্ছে। এই গণ্ডগোলে তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। টেলিফার দরাজ গলায় হুকুম দেয়—এই গণ্ডগোল তারা যদি সইতে না পারে তো তাদের ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিতে বল্।

র‍্যাফেল হঠাৎ উচ্চস্বরে হো হো করে হেসে উঠে। এমিল চমকে উঠে শুধায়—অমন করে হাসছ কেন?

—কেন হাসছি তা তোমায় বলে বোঝান শক্ত। শোন বন্ধু! আমি যখন সিনের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখনই কিউরিওশপে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার ঠিক কিছু আগেই অতীত যুগের এক বিরাট ধ্বংসাবশেষ দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার আর অজ্ঞানতা একই সঙ্গে আমার চোখের সম্মুখে

ফুটে উঠেছিল। সেই বিরাট্ ধ্বংসস্তূপের মাঝে বিপরীতধর্ম্মা দুইটি জীবন-ব্যবস্থার একখানি রঙ্গিন ছবি দেখতে পেয়েছিলাম আমি। মাতাল না হলে তুমিও সেখানে একটা সুমহান দার্শনিক সত্য আবিষ্কার করতে পারবে।

—তোমার ঐ দুইটি জীবন-ব্যবস্থাকে অতি সহজেই প্রকাশ করা চলে। একটা হচ্ছে কর্ম্মময় যান্ত্রিক জীবন। এত বেশী কর্ম্মময় যে কাজের চাপে বুদ্ধিবৃত্তি ভোঁতা হয়ে আসে। আর একটা হচ্ছে সংযমহীন ভোগীর জীবন—বিলাসীর জীবন। এক কথায় জীবনের সমস্ত প্রবৃত্তিগুলোকে গলা টিপে হত্যা করে দীর্ঘদিন বাঁচা অথবা ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া।

—মূর্খ! এই দুটা সূত্রের কথা বলতে চাইলে আমি বলতাম যে বুদ্ধিবৃত্তির অতিরিক্ত চর্চ্চায় মানুষের হৃদয়ের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। আর অজ্ঞতা তাকে স্নেহে প্রেমে মহীয়ান্ করে তোলে। তুমি জ্ঞানীর সহবাসে থেকে দীর্ঘদিন বাঁচ অথবা মূর্খের সঙ্গে মিশে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাও, ফল কিন্তু ঐ একই।

—যাক্, ওসব দার্শনিক আলোচনা ছেড়ে দিয়ে এখন বল দেখি কেন তুমি জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে?

—তুমি যদি আমার জীবন-কাহিনী জানতে তাহলে আর এই প্রশ্ন করতে না।

—দেখ র‍্যাফেল, এটা হচ্ছে অতি সাধারণ অজুহাত। প্রায় প্রত্যেক লোকই মনে করে যে সে অপরের চেয়ে বেশী দুঃখ ভোগ করছে।

—আঃ, অস্ফুট উক্তি করে র‍্যাফেল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

—তোমার ঐ হা-হুতাশ শুনলে বিরক্তিতে আমার মন বিষিয়ে উঠে। তোমার দুঃখের কারণটা আর একটু স্পষ্ট করে খুলে বল। তোমাকে কি বিনামুনে কুকুরের কাঁচা মাংস খেতে হয়েছে? খাবারের অভাবে ঘরে ছেলেপুলে কাঁদছে কি? না তুমি তোমার স্ত্রীর সর্বশেষ গয়নাখানা বিক্রী করে জুয়া খেলেছ? বল কিসের দুঃখ তোমার? আর যদি কোন নারীর প্রেমে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়ে থাক তাহলে ধিক তোমাকে। যাই হোক্ মাতাল অবস্থায় যতখানি সংক্ষেপে বলা সম্ভব ঠিক ততটুকু সংক্ষেপে তোমার জীবন-কাহিনী বলে যাও। আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। দেখ আবার মিথ্যা কথা বলোনা যেন।

—শোন বন্ধু! বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এমন দিন আসবে যখন আমরা মানুষের মনের ইতিহাস লিখতে সমর্থ হব। আমাদের সমগ্র চিত্তবৃত্তিকে জাতি, উপজাতি, গোষ্ঠী, কবচী ও জীবাণুে ভাগ করা হবে। ফুলের মতন স্পর্শকাতুর মানব-মনের প্রতিটি অনুভূতির বাস্তব অস্তিত্বকে তখন লোকে সত্য বলে মেনে নেবে—

—ধন্যবাদ, এমিল তাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে বলে—কোন ভূমিকার প্রয়োজন নাই। তুমি সোজা সত্য কথা বলে যাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিছুক্ষণের জন্যে দু'জনের মাঝে নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে। সহসা র‍্যাফেল সহজ কণ্ঠে বলে উঠে—মনে হচ্ছে যেন মদের নেশায় আমার দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে গেছে। এই মুহূর্তে অতীত জীবনের সবগুলি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা—সব কয়খানি চেনা মুখ আয়নার বুকে প্রতিচ্ছায়ার মতো আমার চোখের সম্মুখে ফুটে উঠছে যেন। অন্তরের কাব্যিক অনু-প্রেরণায় অতীতের সমস্ত সুখদুঃখকেই সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। নৈতিক আদর্শবাদে পঙ্গু এ জীবনের সুদীর্ঘ দশটা বছর ধরে যে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করেছি, আজ মনের অলিগলি চুঁড়েও তার একটা আব্‌ছা স্মৃতি ছাড়া আর কোন চিহ্নই খুঁজে পাই না। এমন কি সেদিনের সুখের স্মৃতিগুলোও আজ আমার কাছে উঁচু স্তরের দার্শনিক তত্ত্বের মতো অবাস্তব বলে মনে হয়। বিন্দুমাত্র অভিভূত না হয়ে এখন বিগত জীবনের সমস্ত ভুলত্রুটিগুলোকে তন্ন তন্ন করে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি।

এমিল তাকে বাধা দিয়ে বলে—বড্ড বাজে বক্‌ছ কিন্তু।

—হয়ত তাই, র‍্যাফেল অবিচলিতস্বরে বলে—শোন, তোমাদের আর পাঁচজনের মতোই আমার জীবনের প্রথম সতেরোটা বছর কেটেছে খেলাধুলা আর পড়াশুনায়। ছাত্রজীবনের সেই সুখের দিন-

গুলি আজও স্মরণের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে জীবন কত সুখের ছিল!

—এইবার তোমার প্রকৃত জীবননাট্যের কাহিনীটা বলতে শুরু কর।

—কলেজ ছাড়বার পরই বাবা আমার সমগ্র জীবনটাকে একটা কড়া রুটিনে বেঁধে ফেললেন। তিনি যে ঘরে থাকতেন তার ঠিক পাশের ঘরেই আমাকে থাকতে হত। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতাম আর রাত ঠিক ন'টার সময় শুতে যেতাম। তখন আমি আইন পড়ছিলাম। একজন প্রবীণ আইন-ব্যবসায়ীর কাছে রোজ আমাকে পাঠ নিতে হত। বেশ মনোযোগ দিয়েই আইন পড়ছিলাম, তবুও বাবা যেন বিশেষ খুশী হলেন না। তিনি আমার কাছ থেকে আরও বেশী অধ্যবসায় আশা করছিলেন বোধ হয়।

এমিল হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠে—এই সব কথা শুনে কি হবে? র‍্যাফেল শান্তস্বরে বলে যায়—অধৈর্য্য হয়োনা এমিল, যে অদ্ভুত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমার জীবন গড়ে উঠেছিল, যার ফলে যৌবনেও আমার মনের আদিম সরলতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি, সেই সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা না থাকলে তুমি আমার পরবর্ত্তী জীবনের ঘটনাগুলি ভাল করে বুঝতে পারবে না। একুশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমাকে থাকতে হয়েছে পুরোহিততন্ত্রের মতই সর্ব্বশক্তিমান পিতার একাধিপত্যের অধীনে। এই ব্যর্থ জীবনের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী বলবার আগে তাঁর সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলে নেয়া দরকার। বাবা দেখতে ছিলেন লম্বা ছিপছিপে গড়নের। তাঁর শীর্ণ ছুঁচালো মুখখানা সর্ব্বদা ক্লান্তিতে পাণ্ডুর হয়ে থাকত। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন খেয়ালী তেমনি ছিলেন কর্ম্মঠ। শৈশব শেষ হবার পূর্ব্বেই আমার দেহমনের

শিশুসুলভ সমস্ত চাঞ্চল্য ও কল্পনা তাঁর প্রভাবে অকালে শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেল। মনের যে কোনরূপ সজীবতাকেই তিনি মনে করতেন ছেলেমানুষি। আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রাণচাঞ্চল্য দেখলেই তাকে নির্মম হাতে পিষে ফেলতেন। ছেলেবেলায় তাঁকে আমি যমের মতো ভয় করতাম। চোখ বুজলে আজও যেন লম্বা কোট পরা তাঁর সেই দীর্ঘ ঋজু দেহখানি স্পষ্ট দেখতে পাই। তবুও বাবাকে ভয়ানক ভালবাসতাম। স্বভাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন খাঁটী মানুষ। হৃদয়ের মহানুভবতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সততার গুণে তাঁর প্রকৃতির কঠোরতা ঢাকা পড়ে যেত। একুশ বছর বয়স পর্য্যন্ত মাত্র একটি দিনের জন্যেও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ পাইনি। একবার দশটি ফ্রাঙ্ক ছাড়া আর নগদ পয়সাও হাতে পড়ে নাই কোনদিন। তাইজন্যে কিন্তু আমার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থার কোন অভাব ছিল না। প্রায়ই তিনি আমায় সারকাসে কিংবা নাচঘরে নিয়ে যেতেন। নাচের মজলিসে যাবার সময় রোজই কোন সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হয়ে উঠতাম। নারী! সেই বয়সে নারী-সান্নিধ্যের অর্থ ছিল আমার কাছে মুক্তি—পিতার কঠোর শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি। কিন্তু ভীরু লাজুক স্বভাবের জন্যে কারও সঙ্গে আমার আলাপ জমত না। নাচের শেষে রুদ্ধ বাসনায় হতাশ মনে আবার বাড়ী ফিরে আসতাম। বাবার নির্দ্দেশিত রাস্তা ছেড়ে নিজের খুশিমতো চলে তাঁর বিরাগভাজন হতে আমার ভরসা হত না। তিনি বলে রেখেছিলেন যে যদি একদিনের জন্যে তাঁর আদেশ অমান্য করি তাহলে আমাকে জাহাজের খালাসী করে ওয়েস্ট্ ইণ্ডিজে পাঠিয়ে দেবেন। আমার তখনকার দুঃখটা একবার কল্পনা কর। প্রেমস্পর্শাতুর, ভাবালু কবিচিত্ত নিয়ে আমাকে প্রতিনিয়ত বাস

করতে হচ্ছে এমন একজন বৃদ্ধের সঙ্গে যাঁর অন্তর নিয়মানুবর্তিতায় আর কর্মভারে একেবারে ঠাণ্ডা পাথর বনে গেছে। এ যেন কোন এক সুন্দরী তরুণীকে জোর করে ধরে এনে একটা প্রাণহীন কঙ্কালের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাবার শিক্ষার প্রভাবে বহির্জগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি কুসংস্কার আমার মনে গভীরভাবে বাসা বাঁধল। সেগুলি মনে এলে আজও হাসি পায়। রেস্তোরাঁয় যাওয়াকে মনে করতাম মহাপাপ। কাফে ছিল আমার কাছে জীবন্ত জাহান্নামের মতো ভয়াবহ, আর জুয়ার আড্ডায় যেতে হলে প্রয়োজন পয়সার। কিন্তু বাবার কড়া ব্যবস্থার ফলে পয়সার মুখও দেখিনি কোনদিন। সেই বয়সে একবার শুধু সামান্য একটু উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেই আনন্দের স্মৃতি মনের 'পরে পাষাণ-লেখার মতো অঙ্কিত হয়ে আছে। ঘটনাটা এইরূপ—ডিউক অব্ নেভারিন ছিলেন বাবার খুড়তুতো ভাই। তাঁর বাড়ীতে বাবার সঙ্গে একবার বল্‌নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। সাজসজ্জার জাঁকজমক বাবা মোটেই পছন্দ করতেন না, তাই আমাকে আটপৌরে পোষাক পরেই যেতে হল। অন্যান্য অতিথিদের দামী পোষাক-পরিচ্ছদের পানে তাকিয়ে আমার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। নাচঘরের এককোণে চুপ করে বসে বরফ খাচ্ছিলাম আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে সুন্দরী মেয়েদের অঙ্গশোভা লেহন করছিলাম। হঠাৎ বাবা আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর চাবি শুদ্ধ তাঁর টাকার ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হলেন। হাত কয়েক দূরেই কতকগুলি লোক একত্র হয়ে বসে জুয়া খেলছিল। নগদ টাকার ঝন্‌ঝনানি ক্রমাগত কানের ভিতর দিয়ে এসে মর্মে আঘাত করতে লাগল। তখন বয়স

আমার মাত্র বিশ বছর। দেহের শিরায় শিরায় যৌবনের নূতন আহ্বান। সদ্যজাগ্রত দেহমন কামনা করছে অন্ততঃ একদিনের জন্যেও নারীসঙ্গ-সুখ। আমার এ কামনা ভ্রষ্টার বদখেয়াল কিংবা তরুণীর আসঙ্গলিপ্সা নয়। আমি চাইছিলাম একজন সঙ্গিনী। তাকে নিয়ে বড় একটা হোটেলে গিয়ে আহার করব। তারপর যাব থিয়েটারে কিংবা সারকাসে। তরুণী কণ্ঠনিঃসৃত ঠাট্টা তামাসা ও উচ্ছল হাসিতে মুখর হয়ে উঠবে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের করুণ মুহূর্তগুলি। হিসাব করে দেখলাম মাত্র পঞ্চাশটা টাকা হলেই আমার এই সাধ পূর্ণ হতে পারে। সহসা চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। পাশের একখানা খালি ঘরে গিয়ে কম্পিত হাতে ব্যাগটা খুললাম। ঝক্‌ঝকে নতুন টাকার দীপ্তিতে চোখে যেন জ্বালা ধরে গেল। গুনে দেখলাম ব্যাগে সবশুদ্ধ একশ' ফ্রাঙ্ক রয়েছে। মনটা আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমার দীর্ঘদিন-পোষিত বাসনার কাল্পনিক ছবিখানি সহসা ম্যাকবেথের ডাকিনীদের মতো চোখের সম্মুখে এসে নৃত্য শুরু করে দিল যেন। লুব্ধ হয়ে উঠলাম। ব্যাগ থেকে তাড়াতাড়ি কুড়ি ফ্রাঙ্কের দু'খানা নোট তুলে নিয়ে ব্যাগটা বন্ধ করে আবার পকেটে রাখলাম। তারপর নোট দুইখানি হাতে করে নাচঘরে ফিরে এসে জুয়ার মজলিসগুলোর কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কেমন যেন ভয় করছিল। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল বাবার কোন পরিচিত লোক এই বুঝি আমায় দেখে ফেললে। অনেকক্ষণ ধরে ইতস্ততঃ করবার পর অবশেষে একজন বেঁটে মোটা লোকের সঙ্গে বাজি ধরলাম। খেলা চলতে লাগল। আর আমি দুরু দুরু বক্ষে দাঁড়িয়ে বারবার খোলা দরজাগুলোর পানে তাকাতে লাগলাম। ভয় হচ্ছিল বাবা হয়ত হঠাৎ এখানে এসে পড়বেন।

কিছুক্ষণ পরে খেলার ফল ঘোষণা করা হল। আমি পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক জিতেছি। কম্পিত হাতে টাকাগুলি নিয়ে প্রথমেই বাবার বিশ ফ্রাঙ্কের নোট দুখানি ব্যাগে রেখে দিলাম। তারপর দশ ফ্রাঙ্ক দিয়ে আবার বাজি ধরলাম। প্রতিবারেই আমার জিত হতে লাগল। জয়ের আনন্দে বিবেকের প্রতিবাদ চাপা পড়ে গেল। আমি সাধারণ জুয়ারীদের মতোই দুর্দম হয়ে উঠলাম। বাজির পর বাজি ধরে আমার সবশুদ্ধ একশ' আট ফ্রাঙ্ক জিত হল। এইবার খেলা বন্ধ করে টাকাগুলি একখানা রুমালে বেঁধে পকেটে রাখলাম।

—ঐ জুয়ারীগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে তুমি কি করছ?

চমকে তাকিয়ে দেখলাম বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন। ভীত কম্পিত স্বরে বললাম—খেলা দেখছিলাম একটু।

—তুমি নিজে একটু খেললেও অবশ্য বিশেষ দোষের হত না। জগতের চোখে তুমি এখন সাবালক হয়েছ। তাই দুনিয়ার সব রকম অপকর্ম্ম করবারই আইন-সম্মত অধিকার জন্মেছে তোমার। র‍্যাস্কেল! তুমি যদি আমার ব্যাগ থেকে কিছু টাকা নিয়ে জুয়াও খেলতে তবু আজ তোমাকে ক্ষমা করতাম।

চুপ করে রইলাম। বাড়ী ফেরবার পথে বাবাকে তাঁর ব্যাগটা ফিরিয়ে দিলাম। ঘরে ঢুকে তিনি ব্যাগ খুলে টাকাগুলি গুনে দেখলেন। তারপর ধীর গম্ভীর অথচ স্নেহকোমল স্বরে বললেন—বৎস, শীঘ্রই তোমার বয়স একুশ বছর পূর্ণ হবে। তোমার ব্যবহারে আজ আমি আন্তরিক খুশী হয়েছি। এখন থেকে তোমাকে কিছু কিছু হাতখরচা দেব মনস্থ করেছি। অর্থের ব্যবহার শিখাবার জন্যে তোমাকে এই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। তুমি যাতে জীবনের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হতে পার তারই জন্যে এই টাকা দিচ্ছি। আজ

থেকে প্রতিমাসে একশ' ফ্রাঙ্ক করে হাতখরচা পাবে। এই নাও প্রথম চার মাসের চারশ' ফ্রাঙ্ক। এগুলি তোমার খেয়ালখুশি মতো খরচ করতে পার। বলে একটা ছোট ব্যাগ খুলে তিনি টাকাগুলো গুনে দেখতে লাগলেন।

অনুশোচনায় আমার মন ভারী হয়ে এল। ইচ্ছা হচ্ছিল বাবার পায়ের উপর পড়ে মুক্তকণ্ঠে সব কথা স্বীকার করি। তাঁকে বলি যে আমি চোর—আমি জোচ্চোর—আমি বিশ্বাসঘাতকেরও অধম। কিন্তু লজ্জা এসে বাধা দিল। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে চুম্বন করতে গেলাম, তিনি আমাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে বললেন—র‍্যাফেল, এখন আর তুমি ছেলেমানুষ নও। তোমাকে যে টাকা দিচ্ছি তার জন্যে ধন্যবাদ দেবারও কোন প্রয়োজন নাই। আমি পিতার কর্ত্তব্য পালন করেছি মাত্র। তবে হ্যাঁ এক বিষয়ে তুমি আমায় ধন্যবাদ দিতে পার। প্যারীর বর্ত্তমান পঙ্কিল আবহাওয়ায় অনেক যুবকেরই স্বাস্থ্য অকালে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তোমার যৌবনকে আমি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছি। এখন থেকে আমরা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করব। আর এক বছরের মধ্যেই তুমি ডক্টর অব্ ল' উপাধি পাচ্ছ। নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও উপযুক্ত শিক্ষা তুমি পেয়েছ। এখন রাজনীতিতে নেমে দেশের ও বংশের মুখ উজ্জ্বল কর, এই আমার একমাত্র কামনা। রাজনীতির সঙ্গে আইনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলেই তোমাকে আইন পড়িয়েছি। ল' পাশ করে তুমি ওকালতি করবে এ ইচ্ছা আমার নাই। এখন যাও, এই সম্বন্ধে আর একদিন আলোচনা করা যাবে।

ক্রমে ক্রমে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাবা তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা খুলে বললেন। মা যখন মারা যান তখন আমার বয়স ছিল দশ

বছর। তার বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ যৌবনের প্রথম ধাপে পা দিয়েই বাবা তাঁর পৈত্রিক বাড়ী ছেড়ে প্যারীতে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। চরিত্রের সহজাত চাতুর্য্য আর কর্ম্মশক্তির বলে শীঘ্রই তিনি যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য আর ক্ষমতার অধিকারী হলেন। কিন্তু বিপ্লব এসে আবার তাঁর ভাগ্য পরিবর্ত্তিত করে দিল। এই সময় তিনি বিয়ে করলেন। আমার মা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সম্পত্তি পেয়েছিলেন। তাই দিয়ে আমাদের পারিবারিক মর্য্যাদা কোনমতে বজায় রইল। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মা আরও সম্পত্তি পেলেন। কিন্তু ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করতে গিয়ে বাবাকে প্রায় নিঃস্ব হতে হল। সুদীর্ঘ দশ বৎসর ধরে তিনি প্রাসিয়ান আর বেভেরিয়ান ট্রাব্যুনালে কূট-নৈতিক উকিলদের সঙ্গে মামলা লড়েছিলেন। এইবার বাবার আদেশে আমাকে এই বিরাট মামলার গোলকধাঁধায় নামতে হল। কাঠ বিক্রী করে আর মার সম্পত্তির সামান্য আয় থেকে কোনমতে সংসার-খরচ চলছিল। এই মামলার ফলাফলের উপরই আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বুঝে আমি প্রাণপণ করে যুঝতে লাগলাম।

বুঝলাম মুক্তির নাম করে বাবা আমায় এক কঠিন কর্ত্তব্যের শৃঙ্খলে বেঁধেছেন। হঠাৎ যেন আমাকে এক বিরাট যুদ্ধে নামতে হল। মকদ্দমার নথিপত্র নিয়ে রাতদিন খাটতাম। তার উপরে বিভিন্ন মুরব্বীদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের স্ত্রী-পুত্র-চাকর এমন কি কুকুরগুলোকে পর্য্যন্ত তোয়াজ করতে হত। আর এই হীন তোষা-মোদকে ঢেকে রাখতে হত ভদ্রতা আর আভিজাত্যের আবরণে। এমনি করে পুরা একটা বছর আমাকে সাংসারিক জীবন যাপন করতে হল। আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষীদের জেরা করাই ছিল তখন আমার একমাত্র কৌতুক আর ক্রিয়া ছিল আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে

মুরব্বীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা। বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশের উপায় ছিল না। সামান্য একটা ভুলের জন্য হয়ত পিতাপুত্র দুইজনকেই ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যেতে হবে, এই ভয়ে সর্ব্বদাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। ঐ এক বছর আমার নৈতিক চরিত্রেও কোন দাগ লাগে নাই, কারণ চরিত্র নষ্ট করবার মতো অবসর ছিল না আমার। যৌবনের প্রথম উন্মেষে সমুদয় হৃদয়বৃত্তিগুলো যখন ফুলের মতো ফুটে উঠে তখন কর্ত্তব্যের উপরে থাকে নিষ্ঠা, থাকে অসীম আত্ম-মর্য্যাদাবোধ। সরল নির্ভীক মন অন্যায়ের সঙ্গে কোন সন্ধি করতে জানে না। আমার উপরে বাবার যে আস্থা ছিল, তা বজায় রাখবার জন্যে চেষ্টার আর অন্ত রইল না। এমন কি মা আমায় যে সম্পত্তিটুকু দিয়ে গিয়েছিলেন মামলার খরচ চালাতে তাও বাঁধা দিতে হল। অবশেষে রায় বেরুল। মকদ্দমায় আমরা হেরে গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হলাম।

তারপর এল ঋণ পরিশোধের পালা। বাবা তাঁর নিজস্ব বলতে যা-কিছু ছিল তা বিক্রী করেও দেনার দায় থেকে রেহাই পেলেন না। অবশেষে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্যে আমি স্বেচ্ছায় আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে দিলাম। তোমরা হয়ত এইজন্যে আমায় বোকা বলতে পার, উকিল-ব্যারিষ্টাররাও তাই বলেছে। কিন্তু ভুলে যেও না যে তখন আমার বয়স মাত্র একুশ বছর। প্রথম যৌবনের তপ্তমনের ভালবাসা ও মহানুভবতা পুরাপুরি বজায় ছিল। তাছাড়া আমার এই আত্মত্যাগে বাবার দুটি নয়নে যে আনন্দাশ্রু দেখেছিলাম, সেই ছিল আমার পরাজিত জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। মামলায় হেরে যাবার ঠিক দশ মাস পরেই বাবা ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। তিনি আমায় ভালবাসতেন খুবই আবার আমার সমস্ত ভবিষ্যৎও নষ্ট

করে দিয়ে গেলেন নিজ হাতে। আর খুব সম্ভবতঃ এই চিন্তাই ছিল তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ।

আঠারোশ' ছাব্বিশ সালের হেমন্তের এক বিষাদ সন্ধ্যায় একাধারে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে বাড়ী ফিরে এলাম। এই বিরাট্ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—নিঃস্ব হয়ে আপনাকে ভয়ানক অসহায় বলে মনে হতে লাগল। অনাথ-আশ্রমে প্রতিপালিত হয় যে সব সর্ব্বহারা শিশু, তাদেরও একটা ভবিষ্যৎ আছে—জীবন-যুদ্ধে তারাও বাঁচবার রাস্তা খুঁজে পায়। অনাথ-আশ্রমে পায় তারা আশ্রয়, গভর্ণমেণ্ট কিংবা সরকারী উকিলের কাছ থেকে পায় পিতৃ-স্নেহ। কিন্তু আমার যে কোন সম্ভাবনাই নাই। আমি নিঃস্ব—রিক্ত—সর্ব্বহারা। মাস তিনেক পরে বাড়ীর পুরানো আসবাবপত্র-গুলি বিক্রী করে হাজার খানেক ফ্রাঙ্ক পেলাম। বাবার আদরের জিনিসগুলির বাজারদর এত কম দেখে মনে ভয়ানক আঘাত লাগল। এতদিন যে সব আসবাবগুলিকে মহামূল্যবান বলে মনে করেছি বাজারে নিয়ে গিয়ে দেখলাম তা জলের দামে বিকিয়ে গেল। ঐ সামান্য টাকা সম্বল করেই আমাকে প্যারীর জনাকীর্ণ জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল। বিদায়-মুহূর্ত্তে বাড়ীর পুরানো চাকর বৃদ্ধ যোনাথাস্ বার বার সাবধান করে দিলে—র‍্যাফেল, টাকা পয়সা হিসাব করে খরচ কর।......

নিঃসঙ্গ জগৎ। পারিবারিক সূত্রে যাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল, দরিদ্র আত্মীয়কে দেখে ঘৃণায় তাঁরা সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন। অভিজাত সমাজের মুকুটমণিদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়েও আমি অসহায়। তাছাড়া সাহায্যের জন্য কারও কাছে হাত পাততে আত্মমর্য্যাদায় বাধছিল। শৈশব থেকে পদে পদে বাধা-নিষেধের

বিধান শুনতে শুনতে আমার মনটা হয়ে উঠেছিল অন্তর্মুখীন। এইবার স্বেচ্ছামত চলবার অধিকার পেলাম সত্য কিন্তু নিজেকে বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলাম না। পিতার শাসনের দোর্দণ্ড প্রতাপে অতি শৈশবেই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন প্রয়োজনের বেলা মনের অলিগলি খুঁজেও অপরের উপর আধিপত্য করবার মতো সামান্যতম মানসিক শক্তিও খুঁজে পেলাম না। বাবা শুধু আমায় নিঃস্ব করে যাননি, মনের দিক্ থেকেও তিনি করে রেখে গেছেন শিশুর মতো অসহায়। অন্তরের নিভৃত কন্দরে আত্মা নিরন্তর চিৎকার করছে—"সাহস অবলম্বন কর"। মাঝে মাঝে আচম্বিতে দেহের স্নায়ু-শিরায় তড়িৎ খেলে যাচ্ছে। দুর্দম আশায় মন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে, কিন্তু স্বপ্ন ছেড়ে বাস্তবে পা দিলেই দেখতে পাই আমি পঙ্গু—আমি অসহায়। অসম্ভব আশায় প্রমত্ত মন বার বার বলছে—"তুমি মহৎ কিছু করবার জন্যে জন্মেছ", কিন্তু সহজতম কাজ করতে গিয়েও পদে পদে নাকাল হয়েছি। জীবনসংগ্রামে আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী কারণ কারও সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মতো শক্তি আমার নাই। বাবা যখন প্রথম আমায় নিয়ে সমাজের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন আমিও আর পাঁচজন যুবকের মতোই অন্তরে অন্তরে অভিজাত সমাজের সেরা সুন্দরীদের বন্ধুত্ব কামনা করেছি। কিন্তু আমার চোখের সুমুখে আমারই বয়সী চালিয়াৎ ছোকরারা বেতের ডগা কামড়াতে কামড়াতে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাত আর আমি চুপ করে বসে দেখতাম। সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে কারও সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলতে পারতাম না। সাহিত্যিক হিসাবে যশ অর্জন করার চেয়েও সমাজের একটি সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়ের মন পাওয়া আমার কাছে ঢের বেশী শক্ত বলে মনে হত। ভদ্র সমাজে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ খাপছাড়া।

বিদ্যাবুদ্ধি হয়ত আমার সাধারণের চেয়ে একটু বেশীই ছিল কিন্তু লজ্জায় নারী-সমাজে তার কোন পরিচয় দিতে পারতাম না। পরবর্ত্তী জীবনে অবশ্য অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি যে মেয়েরা পুরুষের বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। মূর্খের উপরই তাদের আকর্ষণ বেশী। যার একটি রজনীর সাহচর্য্যের বদলে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলাম, বহুবার বহু নাচের আসরে সেই মানসীর দেখা পেয়েছি। কিন্তু জীবন্ত মানসী আমার পাষাণ-প্রতিমার মতো বধিরা—পাষাণীর মতোই নিরেট তার হৃদয়বৃত্তি। হয়ত এজন্য দায়ী আমি। কারণ বহু নারীর চটুল কটাক্ষের অভয় পেয়েও কারও কাছে হৃদয়ের উত্তপ্ত কামনার সামান্যতম আভাস দেবারও সাহস আমার হয় নাই। সত্য কথা বলতে কি অভিজাত সমাজের কৃত্রিমতা আর ধার করা বোলচাল আমার মন বিষিয়ে তুলেছিল। অনবরত পরানুকরণে অভ্যস্ত আধুনিকার দল আমার মনের সহজ সত্যকে সহ্য করতে পারত না। প্রথম পরিচয়ের পরই তারা আমার প্রতি উদাসীন হয়ে উঠত। নারীকে বিশ্বাসী বান্ধবী হিসাবে পেতে চেয়েছিলাম বলেই আমাকে পদে পদে ঠকতে হয়েছে। বৃথাই আমি কৃত্রিমতায় ভরা আধুনিক তরুণীর বিলাসলুব্ধ গর্ব্বিত মনের কোণে শক্তি ও ঔদার্য্যের সন্ধান করেছি। কিন্তু যাকে ভালবেসে সর্ব্বস্ব দিয়ে সুখী করা যায় এমন নারীর পরিচয় আজ পর্য্যন্ত পাই নাই—এমন কি বৃদ্ধা ধনি-পত্নীদের মধ্যেও না। অবশেষে হতাশায় আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম।

—র‍্যাফেল, তোমার মধ্যে আজ করুণ রসের আধিক্য দেখছি যে, এমিল বলল। উত্তরে র‍্যাফেল আবার বলতে শুরু করে—হাঁ বন্ধু, এই হচ্ছে আমার জীবন। এ কাহিনী করুণ বলে তুমি

যদি শুনতে না চাও, তাহলে এখন ঘুমাতে পার। কারণ কোন লোককে বিচার করতে হলে আগে তার সুখদুঃখের সমস্ত ইতিহাস জানা দরকার। একদা যাকে চরম দুঃখ বলে মনে করেছিলাম, পরবর্ত্তী জীবনে সেই হয়েছে আমার পরম আশীর্ব্বাদ। এক অনভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে পড়ে মনের আবেগকে অনবরত দমন করার ফলে লাভ করেছিলাম চিন্তার একাগ্রতা, শিখেছিলাম সংযম। নারীরা আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই সম্পূর্ণ অনাসক্ত চিত্তে তাদের ভালমন্দের ন্যায্য বিচার করতে পারি শুধু আমি। সহজ সরল মনে ভালবেসেছিলাম বলেই মেয়েরা আমায় চায় নাই। তারা চায় ভণ্ডামি—চায় কৃত্রিমতা। শিক্ষার কোন মূল্যই তাদের কাছে নাই। জ্ঞানের চর্চ্চায় তারা বিরক্ত হয়ে উঠে। দয়াকে মনে করে কাপুরুষতা। আমার কবি-মনের কল্পনার প্রাচুর্য্যকে তারা করেছে উপহাস। বোকার মতো কথা বলতে পারিনি বলে মেয়েরা আমায় দেখে দূরে সরে গেছে। এইভাবে বারে বারে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম যেমন করে পারি বড় হব। আমার যশ-গৌরব হরণ করবে নারীচিত্ত। যে কোন ভোজ-সভার দরজায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত মেয়েদের সব কয় জোড়া চোখের লুব্ধ দৃষ্টি এসে পড়বে আমার মুখের পরে। ছেলে-বেলা থেকেই আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। শৈশবে বহুবার কপাল ঠুকে মনে মনে বলেছি "নিশ্চয়ই এখানে মহৎ কিছু লেখা আছে", সাহিত্য, বিজ্ঞান কিংবা রাজনীতি—এর যে কোন একটাতে থাকবে আমার অমর অবদান। কিন্তু হায় জীবনের ছাব্বিশটা বসন্ত শেষ হয়ে গেল। আজ পর্য্যন্ত না পেলাম কোন মেয়ের ভালবাসা, ন হতে পারলাম সুবিখ্যাত। দুর্গতির তুঙ্গ-শৃঙ্গে আরোহণ কে

এখনও সম্মুখে দেখছি দুর্গম গিরিস্তর। প্রবল আত্মরতির তাড়নায় চেয়েছি যশ, চেয়েছি আমার অনন্যা মানসীকে। কিন্তু মেয়েরা আমায় হতাশ করেছে। প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে তারা দেখতে পায় শুধু দোষ, আর মূর্খের গুণগুলোই তাদের চোখে পড়ে। অবশ্য এর একটা কারণ আছে। যাদের বুদ্ধি একটু ভোঁতা তারা সুন্দরী মেয়ে দেখলেই মনে করে দেবী—করে তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। আর প্রতিভায় শানিত যাদের দৃষ্টি তারা মেয়েদের ভালমন্দ খতিয়ে দেখে, তাদের সমালোচনা করে। ফলে গরবিনীদের গর্ব্বে লাগে আঘাত। তারা সন্ত্রস্ত হয়ে দূরে সরে যায়। প্রতিভার উষ্ণতা সইতে পারে না কোন নারী। পুরুষের দুর্ভাগ্যের ভাগ নেবার মতো দুঃসাহস তাদের নাই। তাই তারা চায় এমন লোক, জীবনে যাদের কোন উচ্চাশা নাই—নাই কোন সংঘর্ষ কিংবা সংগ্রাম। যারা নিজেদের দেহমন ও অর্থ দিয়ে শুধু স্ত্রীর সেবা করে যাবে—চরিতার্থ করবে তার প্রবৃত্তির অসঙ্গত খেয়াল। প্রতিভাবান ব্যক্তি তার আদর্শের বেদীমূলে জীবনের সব সুখ-সম্ভোগ এমন কি স্ত্রীকে পর্য্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধা বোধ করে না। বিলাসলুব্ধা দেহসর্ব্বস্বিনীর দল এমন স্বামী নিয়ে কি করবে? আদর্শবাদী স্বামীর জীবনে স্ত্রীর নারীসুলভ অহেতুক খেয়াল চরিতার্থ করবার মতো সময় থাকে না কখনও। নারীপ্রেমই তার জীবনে একমাত্র কাম্য নয়। পত্নীর কাছে সে চায় আত্মত্যাগ—চায় শ্রদ্ধা-ভক্তি। কিন্তু সিল্ক আর সাটিনের পোষাকে মোড়া অভিজাত তরুণীর দল আত্মত্যাগের শিক্ষা পায়নি কখনও। স্বামিভক্তি তাদের কাছে একটা কুসংস্কার। নব নব ফ্যাসনের প্রবর্ত্তনই হচ্ছে তাদের একমাত্র কর্ম্ম, কামনা দৈহিক সুখ।

আমার মতে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে প্রাচোর মেয়েরাই হচ্ছে উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী। তারা জানে কি করে স্বামীর ইচ্ছার পদমূলে আত্মোৎসর্গ করতে হয়। তারা জানে দয়িতের আদর্শের জন্যে আপনাকে তিলে তিলে বিলিয়ে দিতে। অন্তরে সৃজনী প্রতিভার আভাস পেয়ে আমিও এমন একজন স্ত্রীই চেয়েছিলাম। কিন্তু প্যারীর আধুনিক সমাজের মেয়েমহলে আমার কামনার ধনের দর্শন মিলল না। পিতাকে হারিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসহায় অবস্থায় একাকী সংসার-মরুতে যাত্রা শুরু করলাম। সম্বল মাত্র হাজার ফ্রাঙ্ক। হিসাব করে দেখলাম ওতে অন্ততঃ তিন বছর চলবে। এই সময়ের মধ্যে এমন একখানা বই লিখব ঠিক করলাম, যাতে আমার যশ অর্থ দুই-ই আসবে।

সঙ্কল্প স্থির করে বাসার সন্ধানে বেরিয়ে পড়া গেল। শহরের একপ্রান্তে একটু নিরিবিলি স্থানে ঘর খুঁজছিলাম। ক্লুগ্নি রোড দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটি কিশোরীকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। মেয়েটি তার সঙ্গিনীর সঙ্গে ব্যাটেল্‌ডোর খেলছিল। তখন সেপ্টেম্বর মাস। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সুমুখেই রকের পরে মেয়েদের মজলিস বসে গেছে। কিন্তু ঐ সুন্দরী কিশোরীর সদ্যঃমুকুলিত দেহ আর ঢল ঢল মুখখানি থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাতে পারলাম না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল জিন্‌জ্যাক রুসোও এখানেই বাস করেছিলেন কিছুদিন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও এইখানে থাকাই সাব্যস্ত করলাম। সেইণ্ট কুইনটাইন হোটেলে ঢুকেই প্রথমে বিস্মিত হলাম এই জীর্ণপ্রায় বাড়ীর ঘরগুলির ভিতরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে, আমাকে দেখতে পেয়ে হোটেলের কর্ত্রী—এক পৌঢ়া মহিলা মূর্তিমতী বিষাদের মতো এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন। তাঁকে ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিতেই তিনি আমাকে

নিয়ে চিলাঘরে এলেন। ঘর দেখে অপছন্দ হলেও আর কোন উপায় ছিল না। এত কম ভাড়ায় এর চেয়ে ভাল বাসা পেতে আশা করা বিড়ম্বনা। অগত্যা জিনিসপত্র নিয়ে এইখানেই এসে উঠলাম।

ঘরের দেয়ালগুলি থেকে চূর্ণবালি খসে খসে পড়ছে। গত বিশ বছরের মধ্যেও কলিফেরানো হয়েছে কি না সন্দেহ। সুমুখের খোলা দরজা দিয়ে চাইলে পাশের বাড়ীর ছাদগুলি চোখে পড়ে। ঘরখানির নীচু ছাদের ভাঙা টালির ফাঁকে ফাঁকে সুনীল আকাশ অনন্ত আহ্বান জানায়। ঘরের মধ্যে যে জায়গাটুকু ছিল আমার তক্তাপোশ আর চেয়ার-টেবিলে তা প্রায় ভরে গেল। পিয়ানোটাকে ঠাসাঠাসি করে কোনমতে একধারে রাখলাম। বাড়ীর কর্ত্রী পয়সার অভাবে ঘরখানি মেরামত করতে পারেননি বলে এতদিন আর কোন ভাড়াটে জোটে নাই। আমাকে পেয়ে তিনি খুব খুশী হলেন। এই ঘরেই আমাকে পূর্ণ তিনটা বছর কাটাতে হয়েছিল। হোটেলে উঠে আসার পরদিন থেকেই কাজ শুরু করে দিলাম। পুস্তক-জগতে মানব-জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম যেন। নির্জ্জনে জ্ঞানচর্চ্চায় আমার নেশা লেগে গেল। এই নেশা প্রেমের নেশার মতোই উগ্র মাদকতায় ভরা। বিজ্ঞান আর দর্শনের অবিচ্ছিন্ন আলোচনায় মানব-মনে এক অব্যক্ত রসের সঞ্চার করে। বিনা উপমায় এই মহানন্দের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। এ যেন পাহাড়ের কোলে ফুল ও লতায় ঘেরা এক স্বচ্ছ হ্রদের উষ্ণ জলে সন্তরণ। আমার আত্মা অহরহ অবগাহন করছে এক অজ্ঞাত আলোর পূত রশ্মিপ্রভায়, মনের কোণে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আদর্শের অমোঘ আহ্বান। উদয়-শৈলে সূর্য্যোদয়ের মতো স্বচ্ছ মানসপটে উদিত হচ্ছে চিন্তার আলোকরেখা। বালার্কের মতোই ধীরে ধীরে বাড়ছে তার দীপ্তি। ঐ

আলোতে প্রজ্জলিত হয়ে উঠছে প্রাণের প্রদীপ। দুটি চোখে সৌন্দর্যের রং লেগে গেল যেন। টেবিল চেয়ার আয়না পিয়ানো বই খাতা সবকিছুকেই অপরিসীম সুন্দর বলে মনে হতে লাগল। মাঝে মাঝে যখন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে এই রংয়ের নেশা কেটে যেত, তখনই ভবিষ্যৎ সাফল্যের মনোহর চিত্রখানি আমায় নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে তুলত। বাস্তবের প্রতিটি বাধা পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হত যেন আমার চিরবাঞ্ছিতার কাছে এক এক ধাপ করে অগ্রসর হচ্ছি।

আমি একসঙ্গে দুইখানি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তার মধ্যে একখানা ছিল কমেডি।

আশা ছিল এই কমেডিখানা আমায় যশ অর্থ দুই-ই এনে দিবে। খ্যাতির স্বর্ণমুকুট পরে গিয়ে দাঁড়াব সমাজের মাঝখানে। সবাই দিবে আমায় সাহিত্য-সম্রাটের প্রাপ্য সম্মান। কিন্তু বইখানা যখন বেরুল, তোমরা আমার সেই শ্রেষ্ঠ রচনাকে শিশুসুলভ কল্পনা আর সদ্যঃ কলেজের খোলসভাঙা তরুণ লেখকের কাঁচা হাতের লেখা বলে ঠাট্টা করলে। তোমাদের সমালোচনার নির্মম আঘাতে আমার কল্পনার পাখা ঝরে পড়ল। কিন্তু ঐ গ্রন্থখানা রচনা করতে আমাকে কি দুশ্চর তপস্যা করতে হয়েছিল সেই কথা এখন বলছি।

মাত্র এক হাজার ফ্রাঙ্ক সম্বল করে আমি এই হোটেলে এসে উঠেছিলাম। আমার দৈনন্দিন আহার ছিল তিন স্যু'র রুটি, দুই স্যু'র দুধ আর তিন স্যু'র মাংস। আর রোজ তিন স্যু' করে ঘরভাড়া দিতে হত। এছাড়া আলোর জন্যে তেল কিনতে আর কাপড় কাচাতেও কিছু খরচ হত। সকালে ঘুম থেকে উঠে সকলের অলক্ষ্যে গিয়ে কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসতাম। নিজ হাতে ঘরখানির ধোয়ামোছা করতাম। জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখতাম। এই স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্র-

সাধনে মনে মনে খানিকটা গর্ব্বও ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে গৃহকর্ত্রী আর তার মেয়ের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। তারা নিজেরা দুঃখী বলে আমার দুঃখও কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল বোধ হয়। রুগ্‌নি রোডে ঢুকতেই যে সুন্দরী কিশোরীটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেই হচ্ছে কর্ত্রীর মেয়ে। তার নাম পলিন। আমার অজ্ঞাতে পলিন এসে আমার ঘরের অনেক কাজকর্ম্ম করে দিয়ে যেত। তার মা এতে আপত্তি করা ত দূরের কথা তিনি নিজেও মাঝে মাঝে আমার ছেঁড়া কাপড়-জামা সেলাই করে দিতেন। ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে বিনা প্রতিবাদে মাতাপুত্রীর এই সেবা গ্রহণ করতে হত। বয়স্কা রমণীর মতো গম্ভীর মুখে, সারা অঙ্গে বালিকার চাপল্য লয়ে পলিন যখন খাবারের থালা নিয়ে এসে হাজির হত তখন তাকে 'আর এন না' বলতে আমার মন সায় দিত না। ক্রমে ক্রমে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে তার সহজাত সরল ভঙ্গীতে তাদের পারিবারিক ইতিহাস বলে গেল। পলিনের বাবা সাম্রাজ্যরক্ষী বাহিনীতে একজন মেজর ছিলেন। রুশ যুদ্ধের সময় তিনি কসাকদের হাতে বন্দী হন। পরে নেপোলিয়ন যখন তাঁর মুক্তির জন্যে রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে বন্দী বিনিময়ের প্রস্তাব পাঠালেন, তখন তাঁরা সমস্ত সাইবেরিয়া চুঁড়েও ওঁর কোন পাত্তা পেলেন না। শোনা গেল যে তিনি নাকি আর কয়েকজন যুদ্ধবন্দীর সঙ্গে ভারতবর্ষের দিকে পালিয়ে গেছেন। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত পলিনের মা—ম্যাডাম গাউডিন স্বামীর আর কোন খোঁজ-খবরই পান নাই। অবশেষে তিনি এই হোটেল খুলে নিজের এবং কন্যার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করছেন। কিন্তু অভিজাত বংশের কন্যা পলিনকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারছেন না বলে তাঁর দুঃখের আর অন্ত নাই।

একদিন কথায় কথায় ম্যাডাম গাউডিন বললেন—আমার স্বামীকে ব্যারণ উপাধি দিয়ে সম্রাট্ যে সনদ দিয়েছিলেন, সেই কাগজখানি কাউকে দিলে আজ যদি পলিনের শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা হত তবে আমি তা অনায়াসে দিয়ে দিতাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। এরা অযাচিতভাবে আমাকে যে সাহায্য করছে তার প্রতিদান স্বরূপ আমি পলিনের শিক্ষার ভার গ্রহণ করি না কেন? প্রস্তাব করতেই ম্যাডাম গাউডিন বেশ সরলভাবে তা গ্রহণ করলেন। এখন থেকে দিনের খানিকটা সময় আমার অতিবাহিত হত পলিনের সাহচর্যে। সে কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ ভাল করে পিয়ানো বাজনা শিখে ফেলল। নানা সারগর্ভ বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনার ফলে তার মনের পাপড়িগুলি সৌরকরস্পর্শে শতদলের মতো ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। যখন কোন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করতাম তখন সে দুটি আয়ত সুনীল চক্ষু মেলে আমার মুখের পানে তাকিয়ে থাকত। মাঝে মাঝে তার আঁখিতারায় চমকে উঠত খুশির বিদ্যুৎ। সোমত্ত মেয়েকে ঘরে রেখে ম্যাডাম গাউডিন এতদিন অসোয়াস্তি বোধ করছিলেন। এখন মেয়েকে পড়াশুনায় মনোযোগী দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। পলিনের পোষাক-পরিচ্ছদে কোন আড়ম্বর ছিল না। সে যখন আমার ঘরে বসে পিয়ানো বাজাত তখন তার কর্কশ অঙ্গাবরণ ভেদ করে সুপুষ্ট যৌবনশ্রী যেন ছন্দায়িত হয়ে উঠত। কিন্তু আমি তার রূপৈশ্বর্য, তার যৌবনের সমস্ত মাদকতা অবহেলা করতে বাধ্য হলাম। ম্যাডাম গাউডিন বিশ্বাস করে যে ভার আমায় দিয়েছিলেন, তারই সুযোগ নিয়ে পলিনের সঙ্গে প্রেম করতে মন সায় দিল না। পটে আঁকা ছবির মতো তার সৌন্দর্য ছিল আমার কাছে উত্তাপবিহীন।

ভোগের স্পর্শে তাকে মলিন করতে চাই নাই। চেয়েছিলাম তার বালিকামূর্ত্তিখানিকে প্রাণৈশ্বর্য্যে ভরপুর তরুণীর পূর্ণতায় রূপায়িত করতে। মাঝে মাঝে তার প্রতি আমার ব্যবহার রুক্ষ হয়ে উঠত। কিন্তু তার বিনয়াবনত মুখের পানে চাইলে মুহূর্ত্তে রাগ পড়ে যেত। তার শিক্ষাদীক্ষার জন্যে নিজেকেই আমি দায়ী মনে করতাম। কোন নিষ্পাপ নারীকে প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে স্বেচ্ছায় দেউলিয়া হয়ে যাবার সামিল। নারীপ্রেম প্রত্যেকটি পুরুষকে একটা অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ করে। দেহোপজীবিনীকে দুদিন বাদে উচ্ছিষ্টের মতো ছুড়ে ফেলা যায়। কারণ পয়সার লোভে সে যে অমূল্য রত্নটি পুরুষের পায় বিকিয়ে দেয় তাতে তার মনের উপর কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না, কিন্তু প্রেমিকাকে পরিত্যাগ করা শক্ত। তাকে দুঃখ দিতে বুকের পাজর চৌচির হয়ে ফেটে যেতে চায়। তাই পলিনকে বিয়ে না করে আমি ভুল করি নাই। নিজের দৈহিক ক্ষুধার চরিতার্থতার জন্যে একটি কুসুমকোমল নিষ্পাপ কুমারীকে দারিদ্র্যের নরকানলে আহুতি দিতে মন চায় নাই। আমাদের মিলনের মাঝে অভাবের লৌহ-প্রাচীর সর্ব্বদা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। দারিদ্র্যের মাঝে প্রেমের ফুল ফোটে না। এটা হচ্ছে বর্ত্তমান সভ্যতার অন্যতম অভিশাপ। এই প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে হেলেনের মতো রূপসীও আমার মন হরণ করতে পারত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাই বলে যৌবনের কামনার ধন মানসীর মূর্ত্তিখানিও যে আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল, তা নয়। বরং তাকে পাবার বাসনা আরও তীব্র হয়ে উঠছিল। আমি চাইছিলাম এমন একটি প্রেমিকা যে তার নিজের সাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে বয়ে আনবে উচ্ছল ঐশ্বর্য্যের সমারোহ। তার দুটি চোখে জ্বলবে কামনার আগুন, সে আগুন কামানের আগুনের

চেয়েও জ্বালাময়। শীতের রাতে তুষারাচ্ছন্ন বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আসব বাসকশয্যায় শায়িতা তুষারের মতোই শুভ্র মসলিনে ঢাকা প্রিয়ার তনুখানির উষ্ণ আলিঙ্গনের আশায়। আমার কল্পনার নারী ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণসিংহাসনে সমারূঢ়া, তার তুখানি পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়ছে কামার্ত্ত পুরুষের দল কিন্তু তাকে স্পর্শ করবার স্পর্দ্ধা নাই কারো। ক্ষণিকের জন্যেও তার দৃষ্টির প্রসাদ পেলে বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবীটা দিয়ে দিতে পারি। জানি কয়েক গজ ভেলভেট আর কিছু অলঙ্কারের সঙ্গে প্রেমে পড়া মূর্খতা। জানি এটা একটা যুক্তিহীন খেয়াল। তবুও অভিজাত তরুণীর গর্ব্বদীপ্ত ঠোঁটের বাঁকা হাসি আমায় মুগ্ধ করে। আমি চাই এমন নারী যে সম্পূর্ণ অনন্য-সাধারণা। চালচলন কথাবার্ত্তা পোষাক পরিচ্ছদে আর কারও সঙ্গেই কোন মিল নাই তার। সৌভাগ্যের বিষয় যে বিশ বছর হল ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছে নইলে আমি হয়ত স্বয়ং রাণীর সঙ্গেই প্রেমে পড়ে বসতাম। আমার এই কাল্পনিক প্রেমিকার সঙ্গে পলিনের তুলনা করা চলে না। পলিন হয়ত আমায় অনাবিল প্রেমে অভিষিক্ত করতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে বিলাসের মাদকতা নাই, নাই উচ্ছল ঐশ্বর্য্যের সমারোহ। যে নারী প্রণয়ীর পায় আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে জীবন ধন্য মনে করে তার প্রেম পুরুষকে পাগল করতে পারে না। শিশুর মতো সরল, কুসুমের মতো পেলব পলিনকে দেখে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠত কিন্তু তাকে বিয়ে করে নারকীয় অভাবের মধ্যে টেনে নামাতে কেমন যেন মায়া লাগত। পলিনের সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ আমায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করতে পারে নাই।

গত শীতকাল পর্য্যন্ত পড়াশুনা নিয়ে আমার দিন বেশ

শান্তিতেই কাটছিল। হঠাৎ গত ডিসেম্বরের প্রথম দিকে একদিন র‍্যাস্টিগনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার জীর্ণপ্রায় পোষাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠছিল রুক্ষ দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি। তবুও সে আমায় পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরল, তারপর কেমন আছি জানতে চাইল। সংক্ষেপে তাকে আমার বর্ত্তমান অবস্থা আর প্রচেষ্টার কথা সব খুলে বললাম। শুনে সে অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠল। ভাবে বোধ হল সে আমায় একজন প্রতিভাবান বোকা বলে ধরে নিয়েছে। তার মতে পৃথিবীর সমস্ত প্রতিভাশীল ব্যক্তিরাই হচ্ছে বাক্‌সর্ব্বস্ব ভণ্ড। কথাটা সে এমনভাবে বলল, শুনে মনে হল যেন ইতিমধ্যেই সে এই দুনিয়াটাকে বেশ ভাল করে চিনেছে। র‍্যাস্টিগনেক বলতে লাগল—তোমার ঐ প্রচেষ্টা কোনদিনই সাফল্য-মণ্ডিত হবে না। কাজ করে কেউ কোনদিন অবস্থার উন্নতি করতে পারে নাই, আমি নিজে একটা গলদা চিংড়ির মতো অলস। তবুও আমার কোন অভাব নেই, কারণ আমি জানি কি করে সমাজের মধ্যে স্থান করে নিতে হয়। আমি বৃথা গর্ব্ব করি, সমাজের অন্যরা তা বিশ্বাস করে। দুই হাতে ধার করে যাই, অপরে সে ধার শোধ দিয়ে দেয়। বন্ধু! অলসতা হচ্ছে একটা কূটনৈতিক কৌশল। একজন ব্যবসায়ী সারা ইউরোপে মূলধন ছড়িয়ে দিনরাত খেটে পরিণামে হয়ত দেউলিয়া হয়ে যায়। কিন্তু একজন নিষ্কর্ম্মা লোক শুধু মাত্র আড্ডা দিয়েই ভবিষ্যতে একটা রাজদূত কিংবা একজন রিসিভার হয়ে বসে। তুমি যদি জীবনে উন্নতি করতে চাও তাহলে কাজকর্ম্ম ফেলে কাল সন্ধ্যায় আমার এখানে এস, তোমাকে এমন একটা বাড়ীতে নিয়ে যাব যেখানে প্যারীর সমস্ত রূপ-ঐশ্বর্য্য এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সেই বাড়ীতে

যাঁরা আসেন তাঁরা যদি তোমার লেখা বইখানির প্রশংসা করেন তাহলে সমগ্র ফ্রান্স তোমার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবে। এস কিন্তু, কাল সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরী ফিয়োডোরার সাক্ষাৎ পাবে।

—কিন্তু তাঁকে ত আমি চিনি না—এমন কি তাঁর নাম পর্য্যন্ত শুনিনি কোনদিন।

—তুমি একটা আস্ত জংলী, ফিয়োডোরার নাম শোননি? তার আয় একুশ হাজার পাউণ্ড। সবাই তাকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু সে চায় না কাউকে। সে পুরাপুরি রাশিয়ানও নয় আবার প্যারীসিয়ানও নয়। সে যেন এক মূর্তিমতী রহস্য। প্যারীর সেই সেরা সুন্দরীকে তুমি চেন না? জংলী কোথাকার! আচ্ছা, কালকের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিদায়।

র্যাস্টিগনেক আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই সহসা ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল। শুধু মাত্র নাম শুনেই যে মানুষ কি করে মুগ্ধ হয় তা বুঝিয়ে বলা শক্ত কিন্তু আমি মুগ্ধ হলাম। একটা অসৎ চিন্তার মতো ফিয়োডোরার চিন্তা আমার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কানের কাছে অহরহ ধ্বনিত হচ্ছিল এক অজ্ঞাত সুর—"কাল তুমি ফিয়োডোরার সাক্ষাৎ পাবে", হাজার চেষ্টা করে, শত যুক্তি দিয়েও এই চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেলাম না। ফিয়োডোরা—ফিয়োডোরা—এই নামটিকে কেন্দ্র করেই আমার অন্তরের সমস্ত কামনা, জীবনের সমস্ত বাসনা যেন মূর্ত্ত হয়ে জেগে উঠল। নিরুদ্ধ প্রবৃত্তির বাঁধ গেল ভেঙ্গে। প্রচণ্ড উল্লাসে সমস্ত অন্তরাত্মা পাপের পথে ধাবিত হল বুঝি! সারা রাত ধরে তারই কথা ভাবলাম। মনে হল যৌবনের প্রথম দিন থেকে এই নারীকেই আমি কামনা করে এসেছি।

এই আমার মানসলক্ষ্মী। মহানগরীর বিলাস-লোলুপতার মাঝখানে ধনি-কন্যা কুমারী ফিয়োডোরা আজও কারও প্রেমে পড়ে নাই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কল্পনায় নিজকে তার প্রণয়ীর আসনে বসিয়ে দিলাম।

পরদিন সময় যেন আর কাটতে চায় না। সন্ধ্যার এখনও অনেক বিলম্ব আছে দেখে সময় কাটাবার জন্যে একখানা উপন্যাস পড়তে শুরু করে দিলাম। কিন্তু বইয়ের অক্ষরগুলির ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতে লাগল ফিয়োডোরার নাম, অবশেষে বই রেখে দিয়ে আমার সর্ব্বশেষ পোষাকটা পরলাম। তারপর গুণে দেখলাম সেই হাজার ফ্রাঙ্কের আর মাত্র ত্রিশটি ফ্রাঙ্ক অবশিষ্ট আছে। তাই নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। র‍্যাস্টিগনেক আমার পরিবর্ত্তিত পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে হেসে উঠল, ঠাট্টাও করল একটু। তারপর আমাকে নিয়ে ফিয়োডোরার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হল। সেখানে গিয়ে কি ধরণের আচার-ব্যবহার করতে হবে যেতে যেতে তাই সে বুঝাতে লাগল। তার কথা থেকে বুঝলাম যে ফিয়োডোরা হচ্ছে অবিনীতা, বিলাসলুব্ধা, গর্ব্বিতা নারী। কিন্তু তার বিলাস-লোলুপতার সঙ্গে মিশে আছে লীলাচাপল্য, গর্ব্বের সঙ্গে সারল্য আর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে শুভ ইচ্ছা। তাই সে অসহ্য না হয়ে হয়েছে মোহিনী। র‍্যাস্টিগনেক বলে যায়—ফিয়োডোরার সঙ্গে খুব সাবধানে কথাবার্ত্তা বল। তার মতো এমন অসাধারণ বুদ্ধিমতী রমণী খুব কমই চোখে পড়ে। আর প্যারীর প্রায় সমস্ত অভিজাত পরিবারের সঙ্গেই রয়েছে তার ঘনিষ্ঠতা। প্রচুর সম্পদের উত্তরাধিকারিণী সে, জন্মাবধি বিলাসের কোলে মানুষ হয়েছে তবুও তার চরিত্রে বিন্দুমাত্র কলঙ্কের স্পর্শ লাগে নাই। ফ্রান্সের বহু নিঃস্ব কুলীন-সন্তান অর্থের লোভে তাকে বিয়ে করতে

চেয়েছে কিন্তু সে বেশ ভদ্রভাবেই তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার মনে হয় তার ঝোঁক বোধ হয় কোন কাউন্টের দিকে। তুমিও তো একজন কাউন্ট হে! চেষ্টা করে দেখ না যদি চোখে লেগে যায়।

র‍্যাস্টিগনেক কথাটা হয়ত ঠাট্টা করেই বললে কিন্তু তাতেই আমার উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল। ফিয়োডোরার প্রাসাদোপম অট্টালিকার দরজায় পা দিতেই অন্তরের নিরুদ্ধ প্রবৃত্তি সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল। দামী কার্পেটে মোড়া সিঁড়িগুলি বেয়ে উপরে উঠছিলাম আর আমার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে আসছিল। উষ্ণ রক্তের চাপে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। এতদিনের ব্যক্তিত্বের গর্ব্ব নিমিষে ধূলায় আছড়ে পড়ল যেন। সত্য কথা বলতে কি সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠরীতে বাস করবার পর সহসা এই ঐশ্বর্য্যের সমারোহের মাঝখানে এসে রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। হঠাৎ শুভ্র পোষাকপরা একটি তরুণীর দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। একদল পুরুষের মাঝে এই আঠাশ-উনত্রিশ বছর বয়স্কা তরুণীটি গর্ব্বিত ভঙ্গীতে বসে ছিল।

র‍্যাস্টিগনেককে দেখে সে ধীরে ধীরে উঠে মৃদু হেসে সাদর সম্ভাষণ জানাল। তার কণ্ঠস্বরে বীণার করুণ মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হল যেন। র‍্যাস্টিগনেক তার স্বাভাবিক দৃপ্তস্বরে আমাকে একজন প্রতিভাবান লেখক বলে পরিচয় করিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে সবাই কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করল। তাদের এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে আমার বিস্ময়ের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কয়েকজন পণ্ডিত, সাহিত্যিক, গুটিকয়েক ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও জমিদার মিলে ফিয়োডোরাকে ঘিরে আসর জমিয়ে বসেছিল। আমাদের আসার কয়েক মিনিট

পরেই তারা আবার আলাপ আলোচনা শুরু করলে। র‍্যাস্টিগনেক যে পরিচয় দিয়েছিল তার মান বাঁচাতে গিয়ে আমাকেও বাধ্য হয়ে এই আলোচনায় যোগ দিতে হল। কয়েকটি ব্যঙ্গোক্তি করতেই শ্রোতার দল প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কথাবার্ত্তা শুনে র‍্যাস্টিগনেক খুশী হয়ে আমার হাত ধরে একটু দূরে সরে এল। তারপর বলল

—দেখ বন্ধু, ফিয়োডোরা সম্বন্ধে বেশী গরজ দেখিও না কিন্তু, তাহলে তোমার আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য ওরা ধরে ফেলবে।

মহার্ঘ গৃহসজ্জায় গৃহস্বামিনীর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। প্রত্যেকখানি ঘর একটা বিশেষ ভঙ্গীতে সজ্জিত। শয়ন-কক্ষের সম্মুখে একখানা বড় মখমলের পর্দ্দা ঝুলছে। পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দামী পুরু বিছানা আর বিখ্যাত কোন ভাস্করের খোদিত মূর্ত্তিগুলির অংশ বিশেষ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লুপ্তপ্রায় আভিজাত্যের আভাস দিচ্ছিল। র‍্যাস্টিগনেক ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠে বলল—ভবিষ্যতে তোমার জীবন বেশ আরামেই কাটবে দেখছি, ঐ ঘরখানি দেখে লোভ হচ্ছে না? হঠাৎ সে আমার হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিছানাখানা দেখিয়ে বলল—এই শয্যাখানির পানে চাইলে কি মনে হয় না যে এ যেন মদন দেবের বিরুদ্ধে একটা মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ? আমি যদি স্বাধীন হতাম তাহলে এই বিদ্রোহিণীকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করতাম।

—তুমি কি ফিয়োডোরার কৌমার্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ?

—বহু গর্ব্বিত আর বিদ্বান তরুণ ফিয়োডোরাকে অঙ্কশায়িনী করতে চেয়েছে, কিন্তু তারা ওর বন্ধুত্বের গণ্ডী ডিঙিয়ে এক পা'ও অগ্রসর হতে পারেনি। অদ্ভুত এই নারী!

র‍্যাস্টিগনেকের কথা শুনে পৃথিবীর সমগ্র পুরুষ-সমাজের বিরুদ্ধেই

আমার মন বিদ্বেষে বিষিয়ে উঠল যেন। আবার ফিয়োডোরার ড্রয়িং রুমে ফিরে এলাম। কাউণ্টেস্ আমায় তার পাশে বসতে বলল। তারপর স্মিতহাস্তে আমার রচনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে। বেশ সহজ ভাষায় তাকে বুঝিয়ে বললাম যে মানব-মন হচ্ছে ষ্টীমের মতোই একটা সম্পূর্ণ বাস্তব শক্তি। পার্থিব কোন শক্তিই এর গতিরোধ করতে পারে না। এমন কি মানবতার শাশ্বত নিয়মগুলোকে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত করে দেয় মানুষের মন।

ফিয়োডোরা এই মতবাদের বিরোধিতা করলে। আর এই বিরোধিতার ভিতরেই তার মার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচয় পেলাম। আমি ডেস্কারটিস্, ডিডেরো আর নেপোলিয়নের উক্তি উদ্ধৃত করে তাকে বুঝাতে লাগলাম। আলোচনার শেষে মনে হল সে যেন বেশ খুশিই হয়েছে। আমায় আবার আসার জন্যে আহ্বান জানাল। তার এই নিমন্ত্রণের পিছনে সাধারণ ভদ্রতা ছাড়া আরও একটা অজ্ঞাত ইচ্ছার আভাস পেলাম যেন।

ফিয়োডোরার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে আমার অধীত মনস্তত্বের সমস্ত জ্ঞান একত্র করে তাকে ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তার দেহের প্রতিটি ভঙ্গী, পোষাকের বিন্যাস আর লীলাচাপল্যের কথা স্মরণ করে তার এই ভরা যৌবনে অখণ্ড কৌমার্য্যের কাহিনী মিথ্যা বলে মনে হল। তার বিলাসবিহ্বল হাব-ভাবে ফুটে উঠছিল কামনার উষ্ণতা। র‍্যাস্টিগনেকের কথাই যদি সত্য হয়—আজ যদি সে সত্যই প্রেমের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে থাকে তবে তা হচ্ছে তার অতীত জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া। ফিয়োডোরার বসবার ভঙ্গীতে পর্য্যন্ত ফুটে উঠছিল সম্ভোগলিপ্সা। তার ঈষৎ হেলান তনু দেহখানিতে মদন যেন

মরণ-শয্যা বিছিয়েছে। মৃদুতম স্পর্শেই ও লতার মতো জড়িয়ে ধরবে বুঝি। দুটি চোখে হরিণীর সচকিততা। প্রয়োজন হলে এখনই আবার ও হরিণীর মতোই ছুটে পালাতে পারে। অপূর্ব্ব লাবণ্যময় মুখশ্রী। সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ একটু বেশী ঘন বলে মনে হয়। দুটি চিকন অধরে বাসনার রাঙ্গা চিহ্নরেখা। চোখে মুখে বুকে তার সর্ব্বাঙ্গে আমি সুস্পষ্ট দেখতে পেলাম উদ্বেল যৌবনের ছায়া। ভেনাস্ ডি মিলোর মতো মোহিনী এই রমণীকে জিতেন্দ্রিয় বলে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ফিয়োডোরার ক্ষণিকের সঙ্গই আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল। দেহের সমস্ত স্নায়ু-শিরায় নেশা লেগে গেল যেন। অন্তরের নিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি সহসা ঝড়ো হাওয়ার মতো উদ্দাম হয়ে উঠল। এতক্ষণে বুঝলাম কিসের আকর্ষণে ফ্রান্সের সেরা বুদ্ধিজীবী ও ধনীর দল এই নারীর চারপাশে এসে ভিড় করেছে। বুঝলাম আমারই মতো ওদেরও স্নায়ু-শিরায় তপ্ত রক্তের স্রোত বইছে।

ফিয়োডোরার বাড়ী থেকে বেরিয়ে হোটেলের রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম। শীতের রাত, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। সম্বল মাত্র ত্রিশ ফ্রাঙ্ক, তাতে গাড়ী ভাড়া করা চলে না। ফিয়ো-ডোরার চিত্ত জয় করতে গিয়ে বহু দুঃখ সইতে হয়েছিল, আর এই হল তার সূচনা। প্রেমের অভিযান যদি হয় দীর্ঘতর তবে তা প্রেমিকের পক্ষে হয়ে উঠে মর্মান্তিক। তাই ভাবছিলাম যে এই দৈন্যদশার মধ্যে থেকে কি করে আমি ফিয়োডোরার ধনী, জ্ঞানী প্রেমপ্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করব। হঠাৎ কে যেন আমার অন্তরের নিভৃত কোণ থেকে দীপ্তস্বরে চিৎকার করে উঠল—'হয় ফিয়োডোরা না হয় মৃত্যু!

সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির সুমুখে ফুটে উঠল ফিয়োডোরার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি।

যখন হোটেলের সেই নগ্ন, ঠাণ্ডা, অন্ধকারাচ্ছন্ন চিলা ঘরে ফিরে এলাম তখনও আমার সারা মন জুড়ে ছিল ফিয়োডোরার অপরিমিত ঐশ্বর্য্যশ্রী। হঠাৎ দীনতায় ভরা পারিপার্শ্বিকের রূঢ় আঘাতে মনটা ভারী হয়ে এল।......এমনি করে মানব-মনে পাপের প্রথম ছোঁয়াচ লাগে। আমার এই তিন বছরের একমাত্র আশ্রয় চিলা ঘরখানির দৈন্যদশা দেখে রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। এতদিনের কৃচ্ছসাধনও সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অক্ষমের ব্যর্থ প্রয়াস বলে মনে হল। তীব্র আক্রোশে বিধাতাকে অভিশাপ দিতে লাগলাম—অভিশাপ দিতে লাগলাম বাবাকে, সমাজকে এমন কি গোটা পৃথিবীটাকে পর্য্যন্ত। মনের বিরক্তি কোনমতে চেপে রেখে সটান বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কবে কেমন করে ফিয়োডোরার ঐ কুসুমপেলব দেহখানি আমার করায়ত্ত হবে।

এইবার সংক্ষেপে আমার পূর্ব্বরাগের কাহিনীটা শোন। ক্রমে ক্রমে ফিয়োডোরার সাক্ষাতে তার রূপগুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলাম। তার চিত্ত জয় করবার জন্যে আমার প্রচেষ্টার আর অন্ত রইল না। হাজার রকমে তাকে বোঝাতে লাগলাম যে আত্মরতি ছেড়ে তার কোন পুরুষকে ভালবাসা উচিত। তার প্রতি আসক্তি আমার দিনের পর দিন বেড়েই চলল। অবশেষে ফিয়োডোরার প্রেমে আত্মহারা হলাম। কাব্যে কবিতায় প্রকৃত প্রেম যে কাকে বলে তা আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে সহসা এই যে এক দুরন্ত বাসনা উদ্বেল হয়ে উঠল, রুসোর লেখা সমগ্র অলঙ্কার-শাস্ত্র খুঁজেও এর কোন হদিস মিলল না। সমস্ত ফরাসী সাহিত্যে এমন কি

ইতালির শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা অমর চিত্রগুলিতেও এই প্রেমের বিন্দুমাত্র আভাস পেলাম না। ভাষার অতীত এই ভাবকে কোন রংয়ে আঁকতে পারেনি কেউ, কোন সঙ্গীতাচার্য্যের মধুকণ্ঠের রাগ-রাগিনীতে এর মূর্চ্ছনা জাগেনি কখনও। গোটা কলা-শাস্ত্রটাকেই এর কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়। জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবার আগে প্রেম অনেকগুলি ধাপ পেরিয়ে আসে। প্রেমের গতিশীলতার এই মূল ছন্দটি ধরতে পারেননি কোন শিল্পী, কুসুমাস্তীর্ণ পথ বেয়ে স্বচ্ছ সলিল-স্রোতের মতো প্রেম প্রথম তার যাত্রা শুরু করে। তারপর যাত্রাপথে বহু পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণী অতিক্রম করে সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক অসীম ভাব-সমুদ্রে। এইখানে এসে অপরিণত যারা তারা দিশা হারিয়ে ফেলে। জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য লুপ্ত হয়ে যায়। আর মহৎ ব্যক্তিরা প্রেমের এই পাকা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নব নব অভিযান শুরু করে। মানব-প্রেমের এই চির পরিবর্ত্তনশীলতার ঠিক ঠিক বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। সেই না বলা বাণীর মাধুর্য্য, সেই অসীম অর্থভরা অর্দ্ধস্ফুট কথা, কবিতায় ভরা সেই দুটি সুনীল নয়নের বিলোল কটাক্ষ, মুখে বলে বোঝান শক্ত। প্রিয়ার দেহের সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্য আর প্রেমবিহ্বল আত্মার অতীন্দ্রিয় আনন্দবোধ ভাষায় প্রকাশ করা যায় কি? কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুধু তার সৌন্দর্য্যের ধ্যান করেছি। অতৃপ্ত আত্মা সুখের সন্ধান পায় নাই। কি যে ভেবেছি তাও জানি না। ফিয়োডোরার হর্ষোজ্জ্বল মুখখানিতে প্রত্যক্ষ করেছি নবোদিত সূর্য্যের রশ্মিপ্রভা। গোলাপ-পাপড়ির মতো মসৃণ গাত্রচর্ম্মে দেখেছি দিগন্তে বিলীন সান্ধ্য সূর্য্যের শেষ আলোকরেখা। ফিয়োডোরার তনু দেহখানি আমার কাছে

আলোর উৎস বলে মনে হত। তার সৌন্দর্য্যের রেখায় রেখায় অনুভব করতাম এক অজ্ঞাত আকর্ষণ। মুখের একটুখানি স্মিত হাসিতে নিত্য নবীন আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতাম। তার কণ্ঠস্বর আমার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলত যেন। লীলাভরে ফিয়োডোরা যখন আমার চুলে হাত বুলাত তখন আবেশবিহ্বল দেহে আগুনের উত্তাপও কুসুমপেলব মনে হত। সে আর এখন কল্পনার মানস-লক্ষ্মী নয়—নয় ক্ষণিকের মোহ, সে এখন আমার জীবনের অনিবার্য্য আকর্ষণ। মনে মনে আমি তার সমগ্র সুখদুঃখের অংশীদার। কতদিন নিশীথ স্বপ্নে ফিয়োডোরা এসে আমায় দেখা দিয়েছে। লীলাভরে আমার হাতের কলম কেড়ে নিয়েছে। বইপত্র সব এক-পাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে আহ্বান করেছে নীরব দৃষ্টিতে তার সৌন্দর্য্যের অর্চ্চনা করতে। তারপর নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন গেছে মিলিয়ে, দুই চোখ ভরে উঠেছে ব্যর্থতার অশ্রু-ধারায়।

একদিন ফিয়োডোরা আমার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলে। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তার মত বদলে গেল। শরীর ভাল নেই বলে সে একটু নিরালায় থাকতে চাইল। একটা ক্রাউন খরচ করে ইতিমধ্যেই টিকিট কিনে ফেলেছিলাম। তাই হতাশ মনে একলাই থিয়েটার দেখতে গেলাম। হলে গিয়ে সবেমাত্র বসেছি হঠাৎ হাজার ভোল্টের শক্ খেয়ে চমকে উঠলাম যেন। ফিয়োডোরা থিয়েটার দেখতে এসেছে। আমার সিট থেকে কিছুদূরে সে বসেছিল। তাকে দেখামাত্র আমার মন মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতো তারই কাছে ছুটে যেতে চাইল। কিন্তু নিদারুণ অভিমানে নিজেকে সংযত করে রাখলাম। হঠাৎ ফিয়োডোরার দৃষ্টি আমার দিকে পড়তেই সে অপ্রতিভ হয়ে গেল। তার উজ্জ্বল মুখে ঘনিয়ে এল

গাম্ভীর্য্যের কালো ছায়া। যদিও আমরা এতদিন মুখ ফুটে পরস্পরের কাছে প্রেম-নিবেদন করি নাই, কিংবা আমার মনের গোপন আকাঙ্ক্ষারও কোন আভাস তাকে দেই নাই, তবুও আমাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। প্রায়ই সে আমার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে পরামর্শ করত। কোন অনুরোধ করবার সময় তার মুখ ব্রীড়ারক্তিম হয়ে উঠত। বিজ্ঞজনোচিত কোন কথা বলেই সে প্রশংসার আশায় আমার মুখের পানে চাইত। বিরক্ত হলে আমাকে খুশী করবার জন্যে তার চেষ্টার আর অন্ত থাকত না। ফিয়োডোরা কোন ভুল করলে তা সংশোধন করে দেবার অধিকারও আমার ছিল বলেই মনে করতাম। আর আমার কোন ত্রুটি হলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ক্ষমা না করত ততক্ষণ স্বস্তি পেতাম না। দুইজনের মধ্যে এই ঝগড়ার অভিনয়টুকু লাগত মন্দ না। তার লীলাচাপল্যে আমার অন্তরের প্রেম দ্বিগুণ হয়ে উঠত।

থিয়েটার শেষ হয়ে যাবার পর যখন ফিয়োডোরার কাছে এসে দাঁড়ালাম, তখন আমার মনে হল যেন এক অপরিচিতা নারীর সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছি। ওর রক্তহীন দেহ যেন ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গেছে।

—চল একসঙ্গে যাওয়া যাক, যথাসম্ভব শান্তস্বরে আহ্বান করলাম। ফিয়োডোরা নিঃশব্দে আমার অনুসরণ করল।

বহির্জগতে ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। অনর্গল তুষার পড়ছিল। আমাদের গাড়ী থিয়েটারের দরজা পর্য্যন্ত এল না। ফিয়োডোরাকে খোলা জায়গা দিয়ে হেঁটে গিয়ে গাড়ীতে উঠতে হবে দেখে থিয়েটারের একজন দরোয়ান ছুটে এসে ছাতা খুলে ধরল। আমরা এসে গাড়ীতে উঠলাম। দরোয়ান বকশিশের আশায় হাত

বাড়াল। হাত দিয়ে দেখলাম, পকেট একেবারে শূন্য। পৌরুষে ভয়ানক আঘাত লাগল। অপরিসীম লজ্জায় চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। অপ্রতিভের মতো ইতস্ততঃ তাকাতে লাগলাম। অবশেষে দরোয়ানটি সর্দার খানসামার তাড়া খেয়ে বিষণ্ণ মুখে সরে দাঁড়াল। গাড়ীতে বসে সারাটা রাস্তায় ফিয়োডোরা আর একটা কথাও বললে না। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে গম্ভীর মুখে হুঁ বা না বলে আবার চুপ করে যেতে লাগল। অবশেষে হতাশ হয়ে আমিও নিঃশব্দে বসে রইলাম। ফিয়োডোরার বাড়ীতে এসে দুইজনে আগুনের পাশে বসলাম। আমাদের মাঝে ঘনিয়ে এল একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। কয়েক মিনিট পরে ভৃত্য ঘর ছেড়ে চলে যেতেই ফিয়োডোরা গম্ভীর-স্বরে বলল—ফ্রান্সে ফিরে আসার পরদিন থেকেই আমার সম্পত্তির মোহ বহু তরুণকে আকৃষ্ট করেছে। অনেকেরই সনির্বন্ধ প্রেম-নিবেদন শুনতে হয়েছে আমাকে। তাদের অনুরোধের আন্তরিকতা দেখে মনে হত ওরা সত্যি সত্যিই আমায় ভালবাসে। আমি যদি গরীবের মেয়েও হতাম তবুও ওরা আমায় বিয়ে করতে পশ্চাৎপদ হত না। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার কৌলিন্য ও কাঞ্চনের লোভ দেখিয়েছে, কিন্তু কেউ সাহস করে দ্বিতীয়বার আর প্রেম-নিবেদন করেনি। ভবিষ্যতে অন্য কেউ আমায় ভালবাসা জানালে তাকেও আমি ঐ একই উত্তর দেব। তুমি আমায় ভুল বুঝবে না বলেই তোমার কাছে মনের কথা খুলে বললাম। ফিয়োডোরা থামল। তার কথা শুনে মনে হল যেন একজন উকিল তার মক্কেলের কাছে দুরূহ আইনের সূত্র-ব্যাখ্যা করছে—এমনই গম্ভীর অথচ নির্লিপ্ত তার কণ্ঠস্বর। মুখের পানে চেয়ে দেখলাম—সারা মুখে ফুটে উঠেছে প্রস্তরের কাঠিন্য। চোখের দৃষ্টি কুটিল। সুন্দরী নারী যখন অপরকে আঘাত করে আনন্দ পায় তখনও

তার দৃষ্টির হিংস্রতা পুরুষের মনে প্রশংসা জাগায় বুঝি। লোকে বলে নারী যাকে যত বেশী আঘাত দেয় ভবিষ্যতে আবার তাকে তত বেশী ভালবাসে। কিন্তু প্রিয়ার ঔদাসীন্য প্রেমিকের মনে যে নিদারুণ আঘাত হানে তার তুলনায় শারীরিক যন্ত্রণাও অনেকগুণ শ্রেয়। শিশু যেমন পরম নির্বিকার ভাবে প্রজাপতির পাখা ছিঁড়ে ফেলে ঠিক তেমনি নির্লিপ্ততার সঙ্গে ফিয়োডোরা মুহূর্তমধ্যে আমার মনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা—দীর্ঘদিন-পোষিত সোনার স্বপ্ন একটি পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। আমার জীবনতরীর পাল ছিঁড়ল।

একটু থেমে ফিয়োডোরা আবার বললে,—কিন্তু তাই বলে বন্ধুদের প্রতি আমার ভালবাসা নেই, একথা তোমরা বলতে পারবে না। তোমাদের আমি যথেষ্ট ভালবাসি—এমন কি প্রয়োজন হলে তোমাদের জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি। আর বেশী কি বলব? আশা করি আমার কথাগুলি মনে থাকবে তোমার।

বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে গেলাম। বহু কষ্টে অন্তরের উদ্বেলিত ভাবোচ্ছ্বাসকে দমন করতে হল। ম্লান হেসে বললাম—যদি তোমায় ভালবাসা জানাতাম তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে। আবার তোমার প্রতি ঔদাসীন্য দেখালেও ওর চেয়ে কোন ভাল ব্যবহার পেতাম কিনা সন্দেহ। বিচারক, পুরোহিত আর নারী কখনও আপনাকে পুরাপুরি প্রকাশ করে না। আজ আত্মীয়ার মতো অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তুমি যে আমায় সাবধান করে দিলে তা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে আমাকে চিরদিনের জন্যে হারাতে তুমি চাও না। এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সত্য কথা বলতে কি তুমি হচ্ছ একমাত্র নারী যার সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তুমি শুধু অনন্যা নও, তুমি বিচিত্রা। অত্যধিক

গর্ব্বিতা বলেই কি তুমি পুরুষের কাছে ধরা দিতে চাও না? চাও না প্রেমের সোনার শেকল পায় পরতে? অথবা কোন শারীরিক রোগ আছে তোমার, যার জন্যে তুমি পুরুষের নিবিড় সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে চাও? অবশ্য একথা ঠিক যে তোমার উপযুক্ত পুরুষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

আমার এই সমস্ত ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে ফিয়োডোরা একটি কথাও বলল না। সে হাসিমুখে সব শুনে গেল। ঐ হাসির মুখোস দিয়েই সে তার প্রকৃত পরিচয় ঢেকে রাখতে অভ্যস্ত ছিল। কিছুক্ষণ পরে ফিয়োডোরা বলল—অন্য কোন মেয়ে হলে তোমার ঐ কথাগুলো শুনে এখনই তোমায় বাড়ী থেকে বার করে দিত।

—ইচ্ছা হলে তুমিও আমায় তাড়িয়ে দিতে পার। মুখে এই কথা বললাম বটে কিন্তু বিচ্ছেদের আশঙ্কায় সারা অন্তরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। ফিয়োডোরা মৃদু হেসে স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলল—তুমি একটা আস্ত বোকা।

গম্ভীরস্বরে বললাম—ফিয়োডোরা, ব্যর্থ প্রেমের প্রতিক্রিয়া যে কি ভীষণ তা হয়ত তুমি জান না। আমি একজন হতাশ প্রেমিকের কথা শুনেছি, সে ব্যর্থতার জ্বালা সইতে না পেরে অবশেষে তার প্রণয়িনীকে খুন করেছিল। ফিয়োডোরা হিমেল কণ্ঠে বলল—দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করার চেয়ে মৃত্যু অনেকগুণ শ্রেয়। কামান্ধ পুরুষ তার স্ত্রীকে অবশ্যম্ভাবী অভাবের মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতেও দ্বিধাবোধ করে না। ফিয়োডোরার এই অকাট্য যুক্তি আমায় নির্ব্বাক্ করে দিল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার এবং আমার মধ্যে রয়েছে এক বিরাট্ ব্যবধান। আমরা পরস্পরকে বুঝে উঠতে পারব না কোনদিন। ভগ্নস্বরে বললাম—বিদায় ফিয়োডোরা!

—বিদায়, কাল আবার এস কিন্তু —

মুখের পানে তাকিয়ে দেখলাম, ওর নয়ন দুটি মমতা-মেদুর— অধরে স্নিগ্ধ হাসি। ঐ হাসিই আবার আমার মনের লুপ্ত প্রেমকে জাগিয়ে দিলে। তুষারাচ্ছন্ন পথ দিয়ে যখন বাড়ীতে ফিরে এলাম তখন সারা মনে ঘনিয়ে এসেছে বিষাদের ছায়া। ফিয়োডোরার সততা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলেও ঐ নিঠুরার নির্মমতম হৃদয়ের প্রেমের মোহ ছাড়তে পারলাম না।।

রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ ভয়ানক খিদে পেল। কিন্তু পকেট একেবারে শূন্য, তার উপরে একমাত্র টুপিটাও আবার বরফের আঘাত লেগে ভেঙ্গে চুরে নষ্ট হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এই টুপি পরে কোনদিন আর কোন সুন্দরী তরুণীর সুমুখে যাওয়া চলবে না। অভিজাত সমাজের যতগুলি অর্থহীন ফ্যাসন প্রচলিত আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে টুপি হাতে নিয়ে ঘোরা। এই ফ্যাসন রক্ষা করতে গিয়ে আমার কিন্তু লাভ হয়েছিল। জীর্ণপ্রায় টুপিটা অনেক দিন টিকে গেল। বার থেকে দেখলে ওটাকে খুব বেশী পুরানো বলে মনে হত না। কিন্তু ওর ভিতরটা ছিঁড়ে একেবারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। টুপিটার মালিকের দশাও হয়েছিল ঠিক ঐ রকমই। দরোয়ানকে মাত্র গোটা কয়েক স্যু বকশিশ দিতে পারলাম না বলে ফিয়োডোরার কাছে আমার এতদিনের আয়াসসাধ্য আভিজাত্যের অভিনয় ধরা পড়ে গেল। আভিজাত্যের এই মিথ্যা খোলসটাকে বজায় রাখতে কতদিন কত ত্যাগস্বীকারই না করতে হয়েছে। সারা সপ্তাহ ধরে রুটী না খেয়ে সেই পয়সায় ফিয়োডোরার জন্যে থিয়েটারের টিকিট কিনেছি। কাজকর্ম ফেলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছুটে চলে গেছি তাকে দেখবার আশায়। এমন কি কাদার ছিট লেগে পোষাক নষ্ট

হয়ে যাবার ভয়ে স্বচ্ছন্দে পথ চলতে পারিনি পর্য্যন্ত। খাবার না খেয়ে সেই পয়সার প্রসাধন সামগ্রী কিনে দেহের [illegible] সৌন্দর্য্য বাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজ সামান্যতম দীনতার আঘাতে এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল বুঝি।

হোটেলে পৌঁছে দেখলাম ম্যাডাম গাউডিনের ঘরে আলো জলছে। পলিন আর তার মা আমারই আসার প্রতীক্ষায় বসে রাত জাগছে। ঘরের কাছে আসতেই তাদের মুখে আমার নাম শুনে থমকে দাঁড়ালাম। পলিন বলছিল,

—সাত নম্বর ঘরের ছাত্রটির চেয়ে র‍্যাফেল ঢের ভাল। ওর চুলগুলো কি সুন্দর আর গলার স্বরটাও ভারী মিষ্টি। যখন ও কথা কয়, খুশিতে আমার বুক যেন নেচে উঠে। তবে লোকটা একটু অহঙ্কারী—তা হোক্, ঐ অহঙ্কারই ওকে আর সকলের চেয়ে আলাদা করে রেখেছে। একথা তোমায় জোর করে বলতে পারি মা, যে কোন মেয়েই ওকে পেলে লুফে নেবে।

—তোর কথা শুনলে মনে হয় যেন তুই ওকে ভালবেসে ফেলেছিস।

—হ্যাঁ ভালবাসি—ওকে আমি নিজের ভাইয়ের মতো ভালবাসি। আর ওকে ভাল না বাসাতো আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞের কাজ মা, ওর সাহায্য না পেলে আমার এই গান-বাজনা লেখাপড়া কিছুই শেখা হত না। আর কয়েকটা দিন পরেই আমি যে-কোন একটা স্কুলে মাষ্টারি করতে পারব। তখন তুমি ইচ্ছা হলে একজন চাকরও রাখতে পারবে।

নিঃশব্দে সেইখান থেকে সরে এলাম। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে একটা প্রদীপ হাতে করে অনাবশ্যক উচ্চ শব্দ করতে করতে আবার ম্যাডাম গাউডিনের ঘরে এলাম। পলিন উঠে আমার হাতের

দীপ জ্বালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণের প্রদীপও জ্বালাল যেন। পলিনের প্রশংসাবাণী উগ্র সুরার মতো শিরায় শিরায় উদ্দীপনার স্রোত বইয়ে দিল। হতাশ হৃদয় আবার নূতন আশায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ ম্যাডাম গাউডিনের ঘরখানির সমস্ত কুশ্রীতা আমার দৃষ্টি থেকে মুছে গিয়ে চারপাশে ফুটে উঠল একটা শান্ত সমাহিত সরল জীবনের প্রতিচ্ছায়া। ফিয়োডোরার ড্রয়িংরুমের প্রাণহীন ঐশ্বর্যের সমারোহ আমার চিত্ত কামার্ত করে তোলে। কিন্তু এই দরিদ্রকুটীরের সমস্ত দীনতার মাঝেও অহরহ প্রবাহিত হচ্ছে যে শান্ত ও সরল জীবনধারা তারই সংস্পর্শে এলে তৃপ্তিতে বুক ভরে যায়। প্রাচুর্যের মাঝে মন আপনা থেকেই মুষড়ে পড়ে যেন।

পলিন আমার হাতের প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিয়ে হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে উঠল—ওমা, একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি। আর মুখখানাও শুকিয়ে যেন আমসি হয়ে গেছে। শীগ্‌গির এক পেয়ালা গরম দুধ খেয়ে ফেলুন, বলেই সে চঞ্চল হাতে একটা পোর্সিলেনের পাত্র ভরে গরম দুধ এনে দিল। কিন্তু আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে তার কণ্ঠ অভিমানে ভারাক্রান্ত হয়ে এল। সে বললে—বিনা পয়সায় দুধটুকুও খাবেন না বোধ হয়? বুঝলাম আমার উদ্ধত স্বভাবের জন্যেই সে এই ভর্ৎসনা করলে। নিঃশব্দে তার হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে এক চুমুকে গরম দুধটুকু খেয়ে ফেললাম। পলিনের দুটি চোখে খুশির আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

একখানা চেয়ারের 'পরে বসে বললাম—শীগ্‌গিরই আমি এখান থেকে চলে যাব। এতদিন তুমি আর তোমার মা আমায় যে আদর-যত্ন করেছ তার জন্যে আজ অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—না-না সে কিছু না, এমন কিই বা আমরা করতে পেরেছি।

পলিন তার মুখের ম্লান হাসি দিয়ে চোখের জল ঢাকলে বোধ হয়। যেন তার কথা শুনতে পাই নাই এমনি ভাবে বললাম—আমার পিয়ানোটা হচ্ছে বাজারের সেরা জিনিস। ওটা তোমায় আমি দিয়ে দিলাম। ভবিষ্যতে যে অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা শুরু হবে তাতে ওটা আমার কোন কাজেই আসবে না। আমার কণ্ঠস্বরে বিষাদের আভাস পেয়ে মা ও মেয়ে দুইজনেই চমকে উঠে ভীতবিস্মিত দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাতে লাগল। এতদিন ধরে এই উদাসীন বিশ্বে যে স্নেহের আশায় ঘুরে বেড়িয়েছি আজ সহসা এই দুইটি অনাত্মীয়া নারীর চোখে তারই সন্ধান পেলাম যেন।

ম্যাডাম গাউডিন কোমলকণ্ঠে বললেন—তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। এইখানেই থেকে যাও। কর্ত্তা খুব শীগ্‌গিরই বাড়ী ফিরে আসবেন, আর তিনি যে অনেক টাকাকড়ি নিয়ে আসবেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। কাল রাত্রে স্বপ্নে ওঁকে দেখলাম। উনি একখানা নৌকায় চড়ে দেশে ফিরে আসছেন। সারা নৌকায় ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য সাপ। চারদিকের জল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই স্বপ্নের তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে উনি সাগর-পার থেকে অনেক সোনারূপা নিয়ে বাড়ী ফিরে আসবেন।

মায়ের ঘুমপাড়ানী গানের মতো ম্যাডাম গাউডিনের এ- স্নেহসিক্ত আশ্বাসবাণীতে আমার অশান্ত হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল। তাঁর দুটি আঁখিতারায় ফুটে উঠল অপূর্ব্ব বাৎসল্যের ছা। কিন্তু মার চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমতী পলিন সন্দেহ ও শঙ্কার দৃষ্টিতে বার বার আমার মুখের পানে তাকাতে লাগল। ম্যাডাম গাউডিনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

একলা ঘরে বসে নিরঙ্কুশ কল্পনায় ভবিষ্যৎ জীবনের অসম্ভব সব

ছবি আঁকতে লাগলাম। অনেকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও একেবারে সহায়সম্বলহীন হয়ে যায় না কিন্তু আমি যে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছি। নিজকে একটি ছোট মেয়ের মতো অসহায় বলে মনে হতে লাগল। বন্ধু! দারিদ্র্য মানব-জীবনে চরমতম অভিশাপ বটে কিন্তু এর একটা ভাল দিকও আছে। দারিদ্র্য মানুষকে শক্তিমান করে তোলে গোটা দুনিয়াটাকে উপহাস করবার শক্তি দিয়ে।

পরদিন র‍্যাস্টিগনেকের সঙ্গে দেখা করে তাকে ফিয়োডোরার কথা সব খুলে বললাম। সে মৃদু হেসে বলল—প্রত্যেকটি আত্ম-সচেতন মেয়ের মতো ফিয়োডোরাও পুরুষের মনের ভাষা পড়তে পারে। তুমি যখন মনে মনে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার ফন্দি আঁটছিলে খুব সম্ভব তখনই সে তা টের পেয়েছে, শত চেষ্টা করেও তুমি তার কাছে মনের ভাব গোপন রাখতে পারনি। বন্ধু, তোমায় আমি ভুল পথ দেখিয়েছিলাম। ফিয়োডোরা পুরুষের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেই আনন্দ পায়, ও কারও বাহুবন্ধনে ধরা দিবে না কোনদিন—। র‍্যাস্টিগনেককে তার কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে আমার আর্থিক অবস্থার কথা জানালাম। উত্তরে সে বলল—আমার হাতে যা-কিছু ছিল সব কাল সন্ধ্যাবেলা একজনকে দিয়ে দিয়েছি। নইলে তোমায় হয়ত সামান্য-কিছু সাহায্য করতে পারতাম। আচ্ছা, চল আগে খাওয়াটা সেরে ফেলি, ইতিমধ্যে হয়ত কোন মূর্খের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

র‍্যাস্টিগনেক সাজগোছ করে নিল। তারপর দুজনে এসে প্যারীকাফেতে ঢুকলাম। চুপ করে বসে খাচ্ছিলাম হঠাৎ একটি শৌখীন যুবককে কাফেতে ঢুকতে দেখে র‍্যাস্টিগনেক নীচু গলায়

বলল—এতক্ষণে একটা সুযোগ পাওয়া গেল বোধ হয়। বলেই সে হাত নেড়ে আগন্তুককে আহ্বান করল। তারপর আবার বলল—এই লোকটা কয়েকখানা বই প্রকাশ করেছে। অবশ্য বইগুলির এক বর্ণও ও নিজে বুঝতে পারেনি। ও একাধারে কেমিষ্ট, ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক আর প্রকাশক। কতগুলো থিয়েটার কোম্পানীতে ওর শেয়ার আছে ঠিক জানি না তবে ও যে একটা আকাট মূর্খ সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। ও মানুষ নয়, নামের একটা লেবেল মাত্র। লোক হিসাবে ভালও নয় মন্দও নয়। ওকে এক কথায় বলা চলে সম্মানিত ব্যক্তি।…এই যে বন্ধু এস-এস! তারপর কেমন আছ বল।

আগন্তুক র‍্যাস্টিগনেকের পাশের চেয়ারটায় বসে বলল—এই এক রকম দিন কেটে যাচ্ছে আর কি। বড্ড ব্যস্ত আছি ভাই। বিপ্লবের পটভূমিকায় একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখব বলে মনস্থ করেছি। কিন্তু বইখানা যে কার নামে প্রকাশ করা যায় তাই ভেবে উঠতে পারছি না।

র‍্যাস্টিগনেক সহসা হেসে উঠে বলল—হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল দেখছি। ইনি হচ্ছেন মঁসিয়ে র‍্যাফেল ভেলেণ্টাইন, আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। ডাচেস্ অব্ মণ্টবোর্ণ হচ্ছেন ওঁর পিসীমা। শুনেছি একদা তিনি নাকি রাজসভায় যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিলেন। তারপর গলার স্বর নামিয়ে যেন কথাগুলি আমাকে শুনাতে চায় না এমনি স্বরে বললে—মঁসিয়ে ভেলেণ্টাইন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি আর তাই বোধ হয় একটু বোকা। তুমি শ'খানেক ক্রাউন খরচ করলে ওঁর পিসীর নামে বইখানা প্রকাশ করবার সুযোগ পেতে পার বোধ হয়।

—বেশ তাই দেব। বয়, খানা দাও।

—আমাকে কিন্তু পঁচিশ লুই কমিশন দিতে হবে। আর ঐ একশো ক্রাউনও অগ্রিম দিয়ে দাও।

—না, আমি পঞ্চাশ ক্রাউন অগ্রিম দেব।

র‍্যাস্টিগনেক আগন্তুকের সঙ্গে তার যে আলোচনা হল তার সারমর্ম্ম আমাকে শুনিয়ে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই আবার বললে—বেশ উনি রাজী আছেন। কখন তুমি টাকাটা দিতে চাও?

—কাল সাতটার সময়, এখানে এস।

আমরা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। র‍্যাস্টিগনেক বেয়ারাটাকে কিছু বকশিশ দিয়ে হোটেলের বিলটা পকেটে রাখল। দুইজনে বাইরে এলাম। পিসীমার নাম বিক্রী করে অর্থোপার্জ্জন করবার প্রস্তাব শুনে রীতিমত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। রাস্তায় এসে র‍্যাস্টিগনেককে বললাম—আমি বরং ব্রাজিলে গিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের অঙ্ক শিখাব তবুও টাকার লোভে পরিবারের নাম কলঙ্কিত করতে পারব না।

আমার কথা শুনে র‍্যাস্টিগনেক হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বললে—তুমি একটা অপদার্থ। এখন টাকা হাতে পাচ্ছ নিয়ে নাও। তারপর বই যখন লেখা হয়ে যাবে তখন তোমার পিসীমার নামে প্রকাশ করতে দিও না, তাহলেই সব লেঠা চুকে যাবে। ডাচেস্ অব্ মন্টবোর্ণের মতো সুন্দরী মহিলার চটিজুতো-জোড়ার দামও হাজার টাকা। এই বইওয়ালাটা তখন যদি তোমায় নগদ হাজার ফ্রাঙ্ক না দেয় তাহলে সে যেন তার বই কোন ব্যবসাদার কিংবা ভ্রষ্টার নামে প্রকাশ করে। বুঝলে হে, ডাচেস্ অব্ মন্টবোর্ণের নাম অত সস্তা নয়।

হতাশ স্বরে বললাম—দুনিয়াটা যে এত নোংরা তা আগে জানতাম না।

—তুমি এখনও নাবালকই আছ দেখছি, র‍্যাস্টিগনেক গম্ভীর-স্বরে বলল—শোন বন্ধু, বইখানা যদি সত্যই বেরোয় তাহলে তার গুণাগুণ বিচার করবে জনসাধারণ। তুমি মাঝ থেকে কিছু টাকা যখন পাচ্ছ নিয়ে নাও।

—হ্যাঁ টাকার প্রয়োজন আমার আছে। আর তোমারই সাহায্যে এই টাকাগুলো পাচ্ছি বলে তোমায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—বেশ-বেশ, চল এখন একটু বাউলগ্‌উডস্‌ থেকে ঘুরে আসি। তোমার ফিয়োডোরাও সেখানে আসবে। আর আসবে আমার ভাবী স্ত্রী—একটি সুন্দরী বিধবা। অনেক টাকার মালিক সে। তাকে দেখে তুমি খুশী না হয়ে পারবে না। কাণ্ট, শিলার আর রুসোর লেখা সমস্ত বইগুলি সে পড়ে ফেলেছে। বড্ড কবিতার ভক্ত। তার পাল্লায় পড়ে আমাকে পর্যন্ত মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে গ্যেটের কবিতা আওড়াতে হয়। নিখুঁত একখানি নারীদেহ আর পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের জন্যে অনেক কষ্টই সহ্য করা যায় তো।

বাউলগ্‌উডস্‌য়ে ফিয়োডোরার সঙ্গে দেখা হল। সে একখানা সুদৃশ্য গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছিল। আমাদের দেখে হাত নাড়ল। আমার উদ্দেশ্যে এক ঝলক প্রেমের হাসিও ছড়াল বুঝি। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হল ফিয়োডোরা এখনও আমায় ভালবাসে। আবার নূতন আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর রং গেল বদলে। ফিয়োডোরার ক্ষণিকের হাসির স্পর্শে আকাশ বাতাস আলো সব-কিছুই নব রঙ্গে নবীন অর্থ লয়ে আমার চোখের সামনে

ফুটে উঠল। র্যাস্টিগনেকের ভাবী স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা হল। তারপর একটা দর্জির দোকানে গিয়ে নূতন জামা ও টুপির অর্ডার দিলাম। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় আমি আবার ফিয়োডোরার জন্যে তার অসংখ্য প্রণয়মুগ্ধ যুবকদের সঙ্গে নূতন করে প্রতিযোগিতায় নামব ঠিক করলাম।......বাড়ী ফিরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে অতীত জীবনের সুখদুঃখের স্মৃতিসায়রে সাঁতার কেটে যাই। মানুষের মনটা হচ্ছে পরীর মতো। যাদুদণ্ডের সামান্যতম আঘাতেই সে আমাদের কল্পনারাজ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারে হীরার ফুল।

পরদিন দুপুর বেলা পলিন এসে ঘরের রুদ্ধ দরজায় আঘাত করল। দরজা খুলতেই সে আমার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি লিখেছে ফিয়োডোরা। সে তাকে নিয়ে মিউজিয়ামে যাবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছে। পলিন একটু থেমে তারপর বললে—কাউন্টেসের ভৃত্য উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে।

তাড়াতাড়ি পত্রের উত্তর লিখে পলিনের হাতে দিলাম। তারপর উঠে পোষাক পরতে লাগলাম। হঠাৎ একটা বিক্ষিপ্ত চিন্তার আঘাতে আমার শিরায় শিরায় হিমেল প্রবাহ ছুটল যেন। ফিয়োডোরা যদি হেঁটে না গিয়ে গাড়ীতে যেতে চায়? নারীর মন দেবাঃ ন জানন্তি। হয়তবা সে কোন ভিখিরীর গায়ে পরিষ্কার কম্বল দেখে তাকে একশো স্যু বকশিশ দিতে চাইবে। আর তখন পৌরুষের খাতিরে টাকাটা দিতে হবে আমাকে। কিন্তু এদিকে পকেট যে একেবারে খালি। আজ সন্ধ্যায় অবশ্য কিছু টাকা পাবার আশা আছে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় হোটেলে গিয়ে ফিনোর সঙ্গে দেখা করারই বা সম্ভাবনা কোথায়? আকাশের দিকে চাইলাম, আবহাওয়ার অবস্থা অনিশ্চিত। হঠাৎ জল এসে পড়লে গাড়ী

ভাড়া করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। একসঙ্গে এতগুলি দুর্ভাবনার বোঝা বইতে পারলাম না। কোথাও কিছু পড়ে নেই জেনেও হতাশভাবে অর্থের সন্ধানে ইতস্ততঃ হাতড়াতে লাগলাম। টেবিল চেয়ার বই খাতা বিছানাপত্র এমন কি জুতার তলা পর্য্যন্ত খুঁজে দেখলাম। কোথাও কিছু পড়ে নাই। হঠাৎ রাইটিং প্যাড্‌টার তলা থেকে একটা একশো স্যু'র ক্রাউন এক ঝলক আলোর মতো উঁকি মেরে চাইল। আমার তখনকার আনন্দ বর্ণনাতীত। ওটা যে কোত্থেকে এল তা ভাববার মতো অবসর ছিল না। শুধু পরম স্নেহে ক্রাউনটাকে তুলে চুম্বন করে আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। গোটা বাড়ীময় আমার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি উঠল। চিৎকার শুনে পলিন ছুটে এসে দরজার পাশে দাঁড়াল। তার মুখখানি ভয়ে শ্বেতপাথরের মতো সাদা হয়ে গেছে। সে স্খলিতকণ্ঠে বললে—আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাউণ্টেসের ভৃত্য—সে কথা থাক্‌, মা তাকে আপনার হয়ে বকশিশ্‌ দিয়ে দিয়েছেন। বলেই সে প্রায় ছুটে অদৃশ্য হল। আমার মনের কানায় কানায় তখন খুশির জোয়ার বইছে। পলিনকে সব কথা খুলে বলবার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ হল না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফিয়োডোরার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম। পূর্ব্বেই বলেছি নারীর মন দেবাঃ ন জানন্তি। সে হেঁটেই মিউজিয়ামে যেতে চাইল। বাধা দিয়ে বললাম—কিন্তু জল আসবে বলে মনে হচ্ছে যে। ফিয়োডোরা সে কথায় কানও দিল না। অপরের মতের বিরুদ্ধে চলতেই সে আনন্দ পায় বোধ হয়। আমরা হেঁটেই লুক্সেমবুর্গে এসে পৌঁছলাম। সহসা আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল সুতরাং গাড়ী ভাড়া করতে হল। গাড়ী এসে যখন মিউজিয়ামের

দরজায় পৌছল, তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘমুক্ত আকাশে সুনীল ঔজ্জ্বল্য। আমি গাড়ীখানা ছেড়ে দিতে চাইলাম কিন্তু ফিয়োডোরা নিষেধ করলে। এই আর এক যন্ত্রণা। ভাড়াটে গাড়ী। প্রতি মিনিটে ভাড়া বাড়ছিল কিন্তু ছেড়ে দেবার উপায় নাই। পাছে ফিয়োডোরার কাছে দৈন্যতা প্রকাশ পায় এই ভয়ে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখেই বাগানে ঢুকতে হল। চলতে চলতে এক সময় বাহুতে ফিয়োডোরার তনুদেহের স্পর্শ অনুভব করে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মুহূর্ত্তে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলে গিয়ে যেন দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আমার মুখের তৃপ্তির রেখা দেখে ফিয়োডোরা মনের অবস্থাটাও বুঝল বোধ হয়। কিন্তু তার আকার ইঙ্গীতে সহজাত লীলাচাপল্য ছাড়া আর অন্য কোন আভাসই পেলাম না। কথাবার্ত্তার মধ্যে যতবারই আমার জীবন তার জীবনের সঙ্গে যুক্ত করবার প্রস্তাব করছিলাম ততবারই সে কৌশলে জবাবটা এড়িয়ে যাচ্ছিল। বুঝলাম সে কিছুতেই আমার জীবনসঙ্গিনী হতে রাজী নয়।

এক সময় ফিয়োডোরা বললে—ইচ্ছা করলেই তুমি আমার একটা উপকার করতে পার। বন্ধুত্বের দাবীতে তোমায় একটা অনুরোধ করব। বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাইলাম। কিন্তু সে মুখে স্নেহ কিংবা বন্ধুত্বের কোন ছায়াই চোখে পড়ল না। বরং মনে হল সে যেন মুখ টিপে ছলনার হাসি হাসছে। সার্থক অভিনেত্রী এই ফিয়োডোরা। মুহূর্ত্তমধ্যেই সে তার গলার স্বর আর চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমার মনের লুপ্ত আশাকে উদ্দীপিত করে তুলল। ফিয়োডোরা বলছিল—তোমার আত্মীয় ডিউক অব্ নেভারিনের রুস রাজ-দরবারে যথেষ্ট প্রভাব আছে শুনেছি। উনি

কাছ থেকে আমার জন্যে যদি একখানা পরিচয় পত্র এনে দাও তাহলে বড্ড উপকার হয়। এমন কি বলতে গেলে আমার সম্পত্তি এবং সুনাম দুই-ই রক্ষা পায়।

—তোমার জন্যে আমি সব-কিছুই করতে রাজী আছি।

—সত্যই চমৎকার লোক তুমি, ফিয়োডোরা আমার হাত ধরে বললে—আজকে আমার ওখান থেকেই খেয়ে যাবে'খন। তখন তোমায় সব কথা খুলে বলব।

আশ্চর্য্য হলাম। প্যারীর সবচেয়ে রহস্যময়ী নারী তার জীবন-ইতিহাস আমার কাছে স্বেচ্ছায় খুলে বলতে চায় কেন? অসংখ্য পুরুষ শত চেষ্টা করেও আজ পর্য্যন্ত যা জানতে পারেনি তাই শোনবার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম।

পূর্ব্বের ভাড়াটে গাড়ীতেই ফিয়োডোরার বাড়ী ফিরে এলাম। গাড়োয়ানের দাবী মিটাতে আমার পকেটের শেষ কপর্দ্দকটিও নিঃশেষ হয়ে গেল। তবু দুঃখ নাই। ফিয়োডোরা সঙ্গে একই ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে নিজেকে অপরিসীম সুখী মনে হল—মনে হল যেন ফিয়োডোরা আমারই। জীবনে আজ এই প্রথম পুরা একটা দিন তার সঙ্গে কাটাবার সুযোগ পেয়েছি। তাকে টুপি ও শাল খুলতে সাহায্য করতে পেয়ে কৃত কৃতার্থ হলাম। আমাকে কয়েক মিনিটের জন্য বসতে বলে ফিয়োডোরা অন্য ঘরে চলে গেল। যখন ফিরে এল দেখলাম তার চুলগুলি পরিপাটী করে সাজান, সারা মুখে ফুটে উঠেছে সদ্যঃ প্রসাধনজনিত স্নিগ্ধতা। আহার শেষ করে আমরা আগুনের পাশে বসলাম।

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে পুরুষচিত্তবিজয়িনী এই রমণীর একান্ত সান্নিধ্যে এসে খুশির উচ্ছ্বাসে যখন চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠছিল ঠিক

তখনই মনে পড়ে গেল ফিনোর কথা। আজ সন্ধ্যায় হোটেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে চুক্তির টাকাটা নিয়ে আসতে হবে। আমাকে টুপির জন্যে হাত বাড়াতে দেখে ফিয়োডোরা বাধা দিয়ে বললে—সে কি? তুমি এখনই চলে যাবে?

তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল অপরিসীম সোহাগের সুর। সেই মধুকণ্ঠের আহ্বান উপেক্ষা করে আমার আর উঠা হল না। আর এত সামান্য টাকা, প্রয়োজন হলে তখন আমি বোধ হয় প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে জীবনের কর্মবহুল দুটা বছরও বিনিময় করতে পশ্চাৎপদ হতাম না। যখন ফিয়োডোরার ওখান থেকে ছাড়া পেলাম তখন রাত দুপুর। নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে পরদিন ভোর হতে না হতেই গিয়ে র‍্যাস্টিগনেককে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। তারপর তাকে নিয়ে ফিনোর বাসায় গেলাম। ফিনো আমাকে একখানা চুক্তিপত্র সই করতে দিলে এবং সই হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক অগ্রিম দিয়ে দিল। তার থেকে বিশ ফ্রাঙ্ক দিয়ে টুপি আর আমার দরুণ দর্জির দেনা পরিশোধ করলাম। বাকি ত্রিশ ফ্রাঙ্ক পাথেয় করে এক নবতম জীবন যাত্রা শুরু হলো।

লেখা ও পড়াশুনা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে ফিয়োডোরার ওখানে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতে লাগলাম। পিসিমার নাম বিক্রী করে যে টাকা পেয়েছিলাম তা জলের মতো খরচ হতে লাগল। ফিয়োডোরার অন্যান্য প্রণয়প্রার্থীরা কয়েকদিনের জন্যে—শুধু মাত্র কয়েকদিনের জন্যে অর্থের প্রতিযোগিতায় আমার কাছে হেরে গিয়ে দূর থেকে বাহবা দেয়। তারা আমার মানসিক স্থৈর্য্যের প্রশংসা করে। তাদের ধারণা যে কোন নারীর প্রেমের কাছে আত্মবিক্রয় করিনি বলেই আমার

মনের স্ফূর্তি আজও পুরা মাত্রায় বজায় আছে। কিন্তু ফিয়োডোরার সম্মুখে এলেই আমি কেমন যেন মুষড়ে পড়ি। মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। যে কথা একান্ত বলা প্রয়োজন তা বলবার ভাষা খুঁজে পাই না। পণ্যনারীর মতো মুখের হাসি দিয়ে মনের দুঃখ ঢেকে রাখি। রোজ ফিয়োডোরার বাড়ীতে গিয়ে তার প্রতিটি আদেশ—প্রতিটি ইঙ্গিতে সাড়া দিয়ে ভালবাসা জানাতে প্রাণপণ চেষ্টা করি। কিন্তু দিন কয়েক পরেই আমার অর্থ ফুরিয়ে এল। তবুও এই বিলাসিনীর প্রতি প্রেম পুরা মাত্রায় বজায় রাখতে গিয়ে নিরন্ন দেহে আভিজাত্যের রং চড়াতে হয়। সে এক প্রাণান্তকর যন্ত্রণা। সারাদিনে শুধু মাত্র এক পেয়ালা চা আর এক টুকরা কেক্ খেয়ে সন্ধ্যায় ফিয়োডোরার ড্রয়িংরুমে বসে হাসিমুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্প করে যাই। মাঝে মাঝে যে আমায় নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতো, তারই ফলে দেহটাকে কোনমতে চলনক্ষম রেখেছিলাম। যতক্ষণ ফিয়োডোরার কাছে থাকতাম ততক্ষণ তার দুর্গম চরিত্র বোঝার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে তখনও তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। কিন্তু দেহ ও মনের এই অবিশ্রান্ত সংগ্রামের শেষ করবার জন্যে অন্তরে অন্তরে আকুল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু ফিয়োডোরা আর আমার মধ্যের ব্যবধান যে দুর্লঙ্ঘ্য। থিয়েটারে গিয়ে কোন বিয়োগান্ত দৃশ্য দেখে যখন আমরা চোখের জল রাখতে পারিনি তখনও ফিয়োডোরা তার স্বাভাবিক লীলায়িত ভঙ্গীতে হাসি-তামাসা করে গেছে। নিজের সুখ-সুবিধা নিয়েই সে ব্যস্ত। অপরের দুঃখ তার মনের 'পরে বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে না। তারই অনুরোধে একদিন ডিউক অব্ নেভারিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে চূড়ান্ত অপমানিত হলাম। শুধু মাত্র আমাকে অপমানিত করবার জন্যেই

সে এমন ভাব দেখালে যেন আমার দারিদ্র্যের জন্মে সে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছে। এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও লোকটার আত্মার দীনতা দেখে দুঃখ হল। কিছুক্ষণ সাধারণ কথাবার্ত্তার পর তাকে আমার আসার উদ্দেশ্যটা খুলে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে ডিউকের স্বর কড়ি থেকে কোমলে নেমে এল। তার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। তবুও ফিয়োডোরার প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে এই দাম্ভিক লোকটার সমস্ত ঔদ্ধত্য মুখ বুজে সয়ে আসতে হল।

তারপর ডিউক একদিন ফিয়োডোরার সঙ্গে দেখা করতে এল, এবং ক্রমে ক্রমে তাদের সৌহার্দ্য বেড়েই চলল। আমার চোখের উপরে আমারই পিসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে নিভৃতে বসে ফিয়োডোরা তার গোপন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করত। আর আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখতাম। ডিউককে পেয়ে তার আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। একদিন সে ডিউকের সুমুখে আমায় এমন রূঢ়ভাবে অপমানিত করলে যে চোখের জল রাখতে পারলাম না। প্রতিহিংসার নানারূপ ফন্দি আঁটতে আঁটতে তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম।······

প্রায়ই ফিয়োডোরাকে নিয়ে আমাকে গানের জলসায় যেতে হত। ওরই পাশে বসে একসঙ্গে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আর প্রেমের মাধুর্য্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতাম। কখনও কখনও ভাবের আতিশয্যে তার কুসুমপেলব হাতখানি ধরে মুখের পানে চেয়ে অন্তরের ভাষা পড়তে চাইতাম—দেখতে চাইতাম যে সঙ্গীতের সুরধারা ওর হৃদয়ে কোন তরঙ্গ তোলে কি না? কিন্তু ওর হিমেল হাতে কোন কম্পনই জাগত না, ফুটত না দৃষ্টিতে কোন চাঞ্চল্যের

রেখা। আমার দেহের প্রতিটি ভঙ্গীতে অন্তরের রুদ্ধ কামনার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েও সে তার অভ্যস্ত হেলার হাসি হাসত। ফিয়োডোরা প্রায়ই জলসায় যেত বটে কিন্তু গানের দিকে তাকে মনোযোগ দিতে দেখিনি কখনও। রোজিনি, কিমারোজা কিংবা জিংগারেলির অমর সঙ্গীতসুধা তার প্রাণে কোন সাড়াই জাগায় না। মনে হয় ওর আত্মা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। অসংখ্য প্রাণহীন চিত্রের মাঝে ও যেন আর একখানি চিত্র। থিয়েটার-হলে যদিও সে শান্তভাবেই বসে থাকত কিন্তু তার উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি এক বক্স্ থেকে অন্য বক্সে ঘুরে বেড়াত—সে অনবরত পরখ করে দেখত যে ফ্যাসনের পাল্লায় তাকে আর কেউ হারিয়ে দিলে কি না।

মানব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার যেটুকু জ্ঞান আছে তাই দিয়ে ফিয়োডোরাকে বিচার করে বুঝেছি যে ওর ঐ কুসুমকোমল দেহের মধ্যে যে মনখানি লুকিয়ে আছে তা নিরেট—ব্রোঞ্জের মতো শক্ত। দয়া আর পরার্থপরতাই যদি হয় বংশগত আভিজাত্যের লক্ষণ তাহলে একথা আমি জোর করে বলতে পারি যে ফিয়োডোরা যত ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরই দেখাক না কেন ওর ধমনীতে বিন্দুমাত্র অভিজাত রক্ত নাই। কিন্তু ভক্তরা ওর মুখের মিষ্টি কথা শুনে মনে করে যে ওর হৃদয়খানি স্নেহ ও মমতায় ভরা। শুধু মাত্র আমারই দৃষ্টির সুমুখে তার সব-কিছু ছলাকলা—সর্ব্ব আবরণ খসে গিয়েছিল। আমাকে ও আর ঠকাতে পারবে না কোনদিন। তাই অন্য সবাই যখন ফিয়োডোরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে আমি তখন মনে মনে হাসি। তবুও ওকে ভাল না বেসে পারি না। আমি চাই ভালবেসে ওর ঐ পাষাণ-হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করতে। চাই ওকে

স্নেহে, প্রেমে, দয়া-দাক্ষিণ্যে মহীয়সী করে তুলতে। একদা এক সন্ধ্যায় কথাটা ওকে খুলে বললাম। উত্তরে সে বললে—আমি চাই টাকা, কারণ টাকা হলেই মানুষ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করতে পারে।

ফিয়োডোরার এই যুক্তি শুনে বজ্রাহতের মতো নিথর হয়ে গেলাম। ওর শৌখীন জীবনের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে ওকে ভাল-বেসেছি বলে নিজকে শতসহস্র বার ধিক্কার দিতে লাগলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল গরীব বলে পলিনকে যদি আমি অবহেলা করতে পারি তাহলে ধনী ফিয়োডোরারও ধিক্কার আছে আমার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করবার। মানুষ যদি তার আত্মাকে গলা টিপে হত্যা না করে তাহলে আত্মা অনেক সময় ইঙ্গিতে তাকে অনেক অজ্ঞাত সত্যের সন্ধান দেয়। এই আত্মার ইঙ্গিতেই সহসা আমার মনে হল ফিয়োডোরা জীবনে কাউকে কোনদিন ভালবাসেনি। এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বিত্তশালিনী বটে কিন্তু একদা নিশ্চয়ই ওকে অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রী করতে হয়েছে। স্বামী হিসাবেই হোক্ অথবা প্রণয়ী হিসাবেই হোক্ ও যে রাশিয়ার কোন কাউন্টকে কিছুদিনের জন্যে দেহ দান করতে বাধ্য হয়েছিল তার প্রমাণও পেয়েছি। তবু—তবু এই মোহময়ীর মোহ আমি কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।

একদিন ফিয়োডোয়ার সঙ্গে থিয়েটার দেখে ফিরছিলাম, হঠাৎ ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি এল। সঙ্গে সঙ্গে ফিয়োডোরা দ্রুতপদে একখানা ভাড়াটে গাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আমার পকেট শূন্য কিন্তু চেষ্টা করেও তাকে এড়িয়ে যেতে পারলাম না। বার বার বললাম যে বৃষ্টিতে ভিজতে পেলে আমার কবি-মন তৃপ্তি পায়, কিন্তু

কোন কথাই সে কানে তুলল না। আমার বিমূঢ় মুখের পানে চেয়েও ওর মনে কোন সন্দেহই জাগল না। সুতরাং গাড়ীতে উঠতে হল। কিন্তু গাড়ীর চাকার প্রতিটি আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছি। গাড়ীর মেঝের তক্তা ভেঙে পালাতে পারলেও তখন আমি বেঁচে যাই যেন। কিন্তু সে সব কিছু করাই সম্ভব ছিল না, অগত্যা চুপ করে বসে বোকার মতো হাসতে লাগলাম। অবশেষে গাড়ী এসে ফিয়োডোরার বাড়ীর কাছে থামল। সে গাড়ী থেকে নেমে বললে—তোমার কাছে কোন টাকা নাই বোধ হয়?

আঃ রোজিনির কোন সঙ্গীতও বোধ হয় কোনদিন আমার কানে এমন মধুবর্ষণ করে নাই। * * * * * * আজকের থিয়েটার দেখবার টাকাটা কি ভাবে সংগ্রহ করেছিলাম সেই কাহিনীটুকু না বললে আমার এই আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ফিয়োডোরার প্রস্তাব মতো তাকে থিয়েটার দেখতে নিয়ে যাব বলে কথা দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম আমার বাক্সে একটি পয়সাও আর অবশিষ্ট নাই। কি করব ভেবে উঠতে পারছিলাম না। হঠাৎ মাথায় একটা ফন্দি এল। সোনার ফ্রেমে মোড়া মার একখানা ছবি আমার কাছে ছিল। ছবিখানি থেকে সোনার ফ্রেমটা খুলে পুরানো জিনিসের দোকানে বিক্রী করব বলে মনস্থ করলাম। কিন্তু পুরানো জিনিসের দোকানে কোন-কিছু বিক্রী করতে যাওয়াটাকে আমি জেলখানায় যাবার চেয়েও বেশী অসম্মানজনক বলে মনে করতাম। অনেক ভেবে অবশেষে পলিনের সাহায্য নেব স্থির করলাম। ওদের ঘরে এসে দেখি পলিন কি একটা কাজে ব্যস্ত। ম্যাডাম গাউডিন ঘুমাচ্ছেন। মশারির ফাঁক দিয়ে তাঁর শুভ্র মুখখানি দেখা যাচ্ছে।

পলিন আমাকে দেখে কোমল কণ্ঠে বললে—কি ব্যাপার, আপনার মুখখানা অমন করে শুকিয়ে গেছে কেন ?

—পলিন, আমার একটা উপকার করবে? উত্তরে সে ডাগর দুটি চোখ মেলে এমনভাবে আমার পানে চাইলে, মনে হল যেন এ তার সপ্রেম কটাক্ষ। ওর পাশে বসে বললাম—পলিন, তুমি কি আমায় ভালবাস ?

—হ্যাঁ ভালবাসি বইকি—খুব ভালবাসি। লজ্জায় ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। একটু থেমে তারপর কোনমতে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ওকে সোনার ফ্রেমটা বিক্রী করতে নিয়ে যাবার জন্ম অনুরোধ করলাম। সব শুনে সে গম্ভীরস্বরে বললে—আপনি নিজে যেখানে যেতে চান না সেইখানে আমাকে পাঠাতে চাইছেন ? একটি সুন্দরী বয়স্থা মেয়ের পক্ষে পুরানো জিনিসের দোকানে কোন-কিছু বিক্রী করতে যাওয়াটা যে আরও বেশী অসম্মানজনক একথাটা আমি একবারও ভেবে দেখিনি সুতরাং পলিনের কথায় যথেষ্ট লজ্জা পেলাম। আমার ব্রীড়ারক্তিম মুখের পানে চেয়ে ও মনের ভাবটা আন্দাজে বুঝে নিল বোধ হয়। পরম স্নেহে আমার হাত ধরে বলল—আচ্ছা আমি যাব, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন হবে না। তোমার পিয়ানোর পাশে আমি এইমাত্র দুখানা একশো স্যু'র নোট রেখে এসেছি।

হঠাৎ ম্যাডাম গাউডিন মশারির তলা থেকে মুখ বার করে বললেন—মঁসিয়ে র‍্যাফেল, আমার মনে হয় আপনি শীগ্‌গিরই কিছু টাকা পাবেন। টাকাটা হাতে না আসা পর্যন্ত ইচ্ছা হলে আমার কাছ থেকে কিছু কিছু ধার নিতে পারেন।

পলিনের হাতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে বললাম—পলিন, আমি ধনী হতে চাই।

—কেন? বলেই সে আমার হাতখানি খুলে মনোযোগ দিয়ে রেখাগুলি দেখতে দেখতে বলল—তোমার সঙ্গে কোন একটি ধনীর মেয়ের বিয়ে হবে। কিন্তু সে তোমার জীবনে বয়ে আনবে অশেষ দুঃখ দুর্গতি। এমন কি সেই হবে তোমার মৃত্যুর কারণ।

তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর অখণ্ড বিশ্বাস। মৃদু হেসে বললাম—পলিন, তুমি কি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ?

—নিশ্চয়ই, সে ভয়ার্তকণ্ঠে বলল—যে মেয়েটিকে তুমি ভালবাস, সেই একদিন তোমায় হত্যা করবে।

পলিন আবার তার রং আর তুলি নিয়ে কাজে মন দিল। তার ভবিষ্যদ্‌বাণীতে বিশ্বাস করবার মতো কুসংস্কার আমার ছিল না। সুতরাং ওর কথায় বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ না করে ঘরে ফিরে এলাম। পিয়ানোটার পাশে সত্যি সত্যিই দুইটা ক্রাউন পড়ে ছিল। ঐ দিয়ে কালকের থিয়েটারের খরচটা চলবে কিনা সেই হিসাব করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরবেলা থিয়েটারের টিকিট কিনতে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় পলিন আমার ঘরে এল। সে কুণ্ঠিতস্বরে বললে—তোমার হয়ত আরও টাকার দরকার হতে পারে, তাই মা এই ক্রাউন তিনটে পাঠিয়ে দিলেন। বলে সে ক্রাউনগুলি টেবিলের উপর রেখে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ধরে ফেললাম। হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার আবেগে চোখের কৃতজ্ঞতার অশ্রু শুকিয়ে এল। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললাম—পলিন, তুমি দেবী। তোমাদের বিনয় ও ভদ্রতা-বোধ দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি। এতদিন ধরে আমি জীবনসঙ্গিনী হিসাবে এমন একটি মেয়ে চেয়েছি, যে হবে ধনিকন্যা—তার থাকবে অভিজাত বংশ-পরিচয়, থাকবে ভদ্রতা

ও রুচি-বোধ। কিন্তু এখন আমি নিজে ধনী হতে চাই এবং জীবনসঙ্গিনীরূপে চাই তোমার মতো একটি গরীবের মেয়েকে। তুমি ঠিকই বলেছ, ভোগ ও কামের এই তীব্র আকর্ষণকে যদি ছাড়তে না পারি তবে এটাই হবে আমার মৃত্যুর কারণ।

পলিন একটা অস্ফুট আনন্দধ্বনি করে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। জান্তব কামনার তাড়নায় গত কয়েকমাস ধরে যে তীব্র যন্ত্রণা সয়ে আসছি তাই স্মরণ করে আপন মনে বলে উঠলাম—ওর ভালবাসায় এখনও কামের স্পর্শ লাগেনি, তাই ও সুখী।

পলিনের প্রদত্ত ক্রাউন তিনটে আমার যথেষ্ট কাজে এল। থিয়েটার-হলে এসে লোকের ভীড়ে ফিয়োডোরা ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল। ঘামের গন্ধে তার মাথা ধরে গেল সুতরাং বাধ্য হয়ে ঐ ক্রাউন তিনটে দিয়ে তার জন্যে একটা ফুলের তোড়া কিনে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাতেও সে খুশী হল না। জসমিন ফুলের উগ্র গন্ধ সে সইতে পারে না বলে ব্যঙ্গ করলে আমার রুচিবোধকে। কাঠের চেয়ারের কাঠিন্যের জন্যেও দোষী হলাম আমি। অবশেষে বিরক্তিতে বিড়বিড় করতে করতে সে থিয়েটার শেষ হবার আগেই হল থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠল। গাড়ীতে তার পাশে বসে প্রতি মুহূর্ত্তে তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করছিলাম, লুব্ধ-দৃষ্টিতে দেখছিলাম তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপৈশ্বর্য্য। দেহাবয়বে, আবেশে-বিলাসে ও সম্পূর্ণ নারী কিন্তু মনের দিক থেকে যেন পুরোপুরি নারী নয়। রাত্রে বাড়ীতে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওরই কথা ভাবছিলাম। আমার মতো একজন যুবকের তরুণ হৃদয়ের সর্ব্বগ্রাসী প্রেমকে এমনভাবে অবহেলা করা শুধু ফিয়োডোরা নয় যে কোন নারীর পক্ষেই অস্বাভাবিক বলে মনে হল। ভেবে

কি ওর কোন অসুখ আছে? লেডী ডিলাকোর মতো ফিয়োডোরাও কি ক্যান্সারে ভুগছে না কি? শারীরিক বিকলাঙ্গ না হলে কোন তরুণীর পক্ষেই এমনধারা অস্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। কথাটা ভাবতেই ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর হিম হয়ে এল। লুকিয়ে ওর নগ্নদেহ পরীক্ষা করব মনস্থ করলাম।

কয়েক দিন পরেই একটা সুযোগও মিলে গেল। একদিন ফিয়োডোরা তার বন্ধুবান্ধবদের একটা পার্টি দিলে। সেই পার্টিতে এত লোক এসেছিল যে তাদের কে গেল কে রইল সেই হিসাব রাখা দরোয়ানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আহার ও গল্পগুজবের পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা যখন একে একে বিদায় নিতে লাগল সেই সুযোগে আমি সকলের অলক্ষ্যে গিয়ে ফিয়োডোরার শয়নকক্ষে ঢুকলাম। দরজায় একটা পুরু পর্দ্দা ঝুলছিল সুতরাং বার থেকে কেউ যে আমায় দেখে ফেলবে সে সম্ভাবনা রইল না। শঙ্কিত বক্ষে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত্ত দুপুরের দিকে সাবধানে ঘরের জানালার উপর উঠে কবাটের ফাঁকে কোনমতে লুকিয়ে রইলাম। জানালায় একটা পুরু সিল্কের পর্দ্দা ঝুলছিল। যাতে ফিয়োডোরার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব ভাল করে পরখ করতে পারি তাই জন্যে পকেট থেকে ছুরি বার করে পর্দ্দায় গোটা কয়েক ছেঁদা করে রাখলাম। ফিয়োডোরার ড্রয়িংরুমের হাসি-ঠাট্টার শব্দ ক্রমশঃ কমে আসছিল। আমার পিছনের পর্দার ওধারের টেবিল থেকে নিমন্ত্রিতেরা তাদের টুপি ও লাঠি তুলে নিয়ে চলে গেল। ফিয়োডোয়ার একজন পুরানো বন্ধু তার টুপিটা তুলে নিতে নিতে কাউন্টেসের শূন্য শয্যার পানে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে। সে শব্দও স্পষ্ট শুনতে পেলাম। দু'চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর সবাই চলে যাবার পর ফিয়োডোরা তাদের নিয়ে এসে খাসকামরায়

বসল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল পরনিন্দা, পরচর্চা আর পরস্পরের মধ্যে বুদ্ধির কসরৎ। র‍্যাস্টিগনেকের একটা ব্যঙ্গোক্তি শুনে সবাই উচ্চস্বরে বোকার মতো হেসে উঠল। ফিয়োডোরা হাসতে হাসতে বললে —শাঁসিয়ে র‍্যাস্টিগনেককে চেষ্টা করেও চটান যায় না।

—নিশ্চয়ই না, র‍্যাস্টিগনেক বললে—কারণ আমি সব সময় খাঁটি কথা বলি। শত্রুই হোক্ আর বন্ধুই হোক্ কারও সঙ্গেই কোন ভণ্ডামির ধার ধারি না। কিন্তু তোমাদের ব্যবহার ঠিক উল্টা। তোমরা যা ভাব তা বলতে পার না। তোমাদের বন্ধুদের মধ্যের একজনকে দেখে মনে হল একটা নিরেট মূর্খ কিন্তু তোমরা তার বুদ্ধির উচ্চ প্রশংসাকরলে। আর একজনের লেখা একটা অতি কদর্য্য বইকে তোমরা সাহিত্যের একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করলে। এই অদ্ভুত ব্যবহারের জন্যে লোকে তোমাদের ভালমানুষ বলে বটে কিন্তু বন্ধু হিসাবে তোমরা বিশ্বস্ত নও।

হঠাৎ ফিয়োডোরার গোঁড়া ভক্ত একটি তরুণ যুবক র‍্যাস্টিগনেকের কথার প্রতিবাদ করলে। সে তার যুক্তির সমর্থনে আমার নামোল্লেখ করে আমার প্রতিভা ও চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। তার বাচনিক ভঙ্গীতে ফিয়োডোরা একটু ক্রুদ্ধ হল বোধ হয়। সে সহসা আমার নিন্দা শুরু করে দিল। র‍্যাস্টিগনেক প্রতিবাদ করলে— আপনারা যাই বলুন না কেন, আমার কিন্তু মনে হয় র‍্যাফেলের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল। ওর প্রতিভা ও সাহস দুই-ই আছে।

ফিয়োডোরা ব্যঙ্গের স্বরে বলল—হ্যাঁ সাহস যে আছে সে কথা আমিও স্বীকার করি—সাহস না থাকলে আমার কাছে অমন করে প্রেম-নিবেদন করতে পারত না। ম্যাকবেথের ব্যাঙ্কোর ভূতের মতো হঠাৎ সশরীরে দর্শন দেবার ইচ্ছা আমায় পেয়ে বসল। এই মুহূর্তে

জানালা থেকে ওদের মাঝখানে লাফিয়ে পড়লে হয়ত প্রণয়িনীকে হারাতে হবে কিন্তু ফিরে পাব আমার বন্ধুকে। কিন্তু মনের কোণে হীন আশা গুঞ্জন করে উঠল—ফিয়োডোরা হয়ত আমায় ভালবাসে বলেই মৌখিক নিন্দার আড়ালে ওর প্রেমকে গোপন রাখতে চাইছে। নারীর অন্তর যা চায় মুখে তা সে প্রকাশ করে কদাচিৎ।

কিছুক্ষণ পরে অতিথিরা বিদায় নিল। শুধু সেই তরুণ যুবকটি আরও খানিকক্ষণ বসে থেকে তারপর উঠে দাঁড়াল। ফিয়োডোরা বাধা দিয়ে বলল—ওকি এত শীগ্‌গিরই উঠছ যে? আর একটু বস না, আমাকে কিছু বলবে না?

কিন্তু যুবকটি বসল না, সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিয়োডোরা ক্লান্তস্বরে আপন মনে বলে উঠল—কি বিরক্তিকর এই লোকগুলোর ব্যবহার!

তারপর সে ধীরে ধীরে শোবার ঘরে এসে একটা গানের মাঝখান থেকে একটা কলি গাইতে আরম্ভ করল। কেউ কোনদিন ওকে এখন পর্য্যন্ত গান গাইতে শোনেনি, শুনলে নিশ্চয়ই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। ফিয়োডোরার ভক্তেরা বলে তার প্রথম প্রেমিক না কি শেষ বিদায়ক্ষণে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে গেছে যে সে আর দ্বিতীয় কোন পুরুষের সমক্ষে গান গাইবে না। ফিয়োডোরার কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্রমে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি থেকে সুপরিস্ফুট সঙ্গীতে রূপায়িত হল। সে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিল যেন। তার কণ্ঠের সহজাত মাধুর্য্যের স্পর্শে এই মামুলী প্রেমের গানেই ফুটে উঠল স্বর্গীয় সুষমা। মুহূর্ত্তে আমার মনের সমস্ত গ্লানি মুছে গিয়ে অন্তরাত্মা একটা অজ্ঞাত পুলকে নেচে উঠল। সে আত্মহারা হয়ে গাইছিল আর নিজের গান শুনে

নিজেই আবেশ-বিহ্বল হয়ে উঠছিল। গানের প্রথম পদটা গাইতে গাইতে সে লাস্যের ভঙ্গীতে আগুনের কাছে এগিয়ে গেল। তারপর থামল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখশ্রীতে নেমে এল পূর্ব্বের দম্ভভরা গাম্ভীর্য্য। একটু যেন ক্লান্তও মনে হল ওকে।

প্রকাণ্ড একখানা আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে গা থেকে গয়নাগুলো খুলতে খুলতে সহসা সে আপন মনে বলে উঠল—একি দিন দিন গায়ের রং কালো হয়ে যাচ্ছে যে! নাঃ জীবনটাকে অনর্থক নষ্ট করে ফেলছি। কিন্তু জাস্টিনের কি হল? বলে সে ঘণ্টা বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে দাসী এসে হাজির হতেই ফিয়োডোরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে—তুই কি কালা হয়ে গেছিস নাকি?

—আমি আপনার জন্যে বাদামের শরবত তৈরী করছিলাম।

ফিয়োডোরা একটা সোফার 'পরে গা এলিয়ে দিল। দাসী তার পা দু'খানি থেকে মোজা খুলতে থাকে। এখন পর্য্যন্ত ফিয়োডোরার ব্যবহারে রুগীর কোন লক্ষনই প্রকাশ পায়নি। সে বিরক্ত স্বরে বললে—জর্জ্জ কি প্রেমে পড়েছে নাকি? নইলে কাজকর্ম্মে আজকাল ওর এত ভুল হচ্ছে কেন? ঐ দেখ জানালার পর্দ্দাটা পর্য্যন্ত গুটিয়ে রাখতে ভুলে গেছে সে। পর্দ্দার আড়ালে থেকে কথাটা শুনে আমার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে উঠল। কিন্তু আমার বরাত ভাল। ফিয়োডোরা ইতিমধ্যেই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছে। সে ব্যথিত স্বরে বলছিল—জীবনটা বড্ড খালি খালি মনে হয়···সাবধান জাস্টিনা, কালকের মতো আমার পা-খানা আবার আঁচড়ে দিস্‌না যেন। এই দেখ্ এখানে কেমন একটা বিশ্রী দাগ হয়ে আছে। বলে সে তার সুন্দর ছোট্ট পা-খানা তুলে দেখাল।

জাস্টিনা মোজা খুলে ফিয়োডোরার পায়ে একজোড়া ভেলভেটের চটি পরিয়ে দিল। তারপর তার পোষাক খুলে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে—ম্যাডাম, আপনার এখন বেঁধা করে ছেলেমেয়ের মা হওয়া উচিত।

—ছেলেমেয়ে হলেই হয়েছে আর কি? ওরা যে আমায় শেষ করে দেবে। আর স্বামী? আমার স্বামী হবার উপযুক্ত পুরুষ কে আছে বলত? আচ্ছা আজ সন্ধ্যায় আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল রে?

—চমৎকার ম্যাডাম।

—তুই একটা আস্ত বোকা।

—আপনি খোঁপা বাঁধবেন না, এলোচুলেই আপনাকে ভাল মানায়।

—সত্যি?

—হাঁ ম্যাডাম। যাদের চুল কম, খোঁপা বাঁধলে তাদেরই মানায় ভাল।

—তুমি বলছ আমার বিয়ে করা উচিত? না-না-না বিয়ের জন্যে আমার জন্ম হয়নি।

প্রেমিকের চোখে এর চেয়ে আর মর্মান্তিক দৃশ্য কি হতে পারে? আত্মীয় বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা বইতে না পেরে হতভাগ্য নারী অবশেষে দাসীর কাছে মন খুলতে বাধ্য হয়েছে। ফিয়োডোরার জন্যে আমার মায়া হল। জাস্টিন ওর দেহ থেকে পোষাকগুলি একটার পর একটা খুলে ফেলছিল। আলোর নীচে রৌপ্যমূর্ত্তির মতো ওর নগ্ন দেহের শুভ্র আভায় আমার দৃষ্টি বেঁধে গেল। ওর অখণ্ড কৌমার্য্যের প্রতীক ক্ষীণ কটিতটের পানে

চেয়ে অন্তরের সুপ্ত কামনা আবার জেগে উঠল। নাঃ পূর্ণ স্বাস্থ্য-বতী এই নারী। রোগের মলিন স্পর্শে ওর দেহ কোনদিন প্রেমিকের চোখে কুৎসিত হয়ে দেখা দেবে না। জাস্টিন গরম জল দিয়ে ওর হাত পা পুঁছিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চলে গেল। ফিয়োডোরা বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিল। ওর ঘনঘন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে মনে হল যেন অপরিসীম ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে। ফিয়োডোরা সহসা উঠে একগ্লাস দুধের মধ্যে কয়েক ফোঁটা বাদামী রংয়ের ওষুধ মিশিয়ে এক চুমুকে দুধটুকু খেয়ে ফেললে। তারপর একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল—হে ঈশ্বর!

ওর ঐ আর্ত্তস্বর শুনে আমার পাঁজরখানা যেন ভেঙ্গে শতধা হয়ে গেল। এদিকে ফিয়োডোরা নীরব নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। ভয় হল বুঝিবা তার কোন অমঙ্গল ঘটেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই নিদ্রিত ব্যক্তির দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে বুঝলাম যে সে ঘুমিয়েছে। পর্দাটা সরিয়ে জানালা থেকে নেমে এসে ওর বিছানার কাছে দাঁড়ালাম। ফিয়োডোরা স্বপ্ন দেখছিল। শুভ্র বাহুর উপরে মাথা রেখে ছোট্ট শিশুর মতো ঘুমিয়ে রয়েছে, ওর শান্ত মুখশ্রীর পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। হঠাৎ একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার তীব্র কশাঘাতে চমকে উঠলাম। এত কাছে—একান্ত সান্নিধ্যে রয়েছে আমার চির-ঈপ্সিত প্রেয়সী তবুও ও যেন কত দূরে। ঐ চির-আকাঙ্ক্ষিত মুখখানির পানে চেয়ে আত্ম-সংবরণ করা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। কল্পনায় অনুভব করছিলাম, আমি যেন ফিয়োডোরার উষ্ণ তনুদেহখানি আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তার বিছানায় শুয়ে আছি। পরম আবেগভরে তাকে শুনিয়ে যাচ্ছি প্রেমের কথা। আমার সংগ্রামমুখর জীবন-কাহিনী শুনিয়ে তার দু'টি

চির-শুষ্ক আঁখি-তারায় অশ্রুসঞ্চার করারও চেষ্টা করছিলাম যেন। হঠাৎ এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার একটা দুর্দ্দমনীয় লোভ আমায় পেয়ে বসল। হয়ত একটা অসঙ্গত কিছু করে ফেলব এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ফিয়োডোরার শয়নকক্ষ ছেড়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

দিন দুই পরে একজন নতুন লেখকের নাটক শুনতে আবার ফিয়োডোরার ওখানে যেতে হল। আচরণটা একটু অদ্ভুত হলেও সবাই চলে যাবার পর আরও কিছুক্ষণ থেকে পরদিন আমার সঙ্গে নিরালায় একবার দেখা করবার জন্যে তাকে অনুরোধ করব মনস্থ করলাম। যথারীতি নাটক পড়া হল। অতিথিরাও একে একে বিদায় নিলেন। আমি আর ফিয়োডোরা মুখোমুখি বসে আছি। নিস্তব্ধ ঘর। ঘড়ির কাঁটার টিক্‌টিক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মিনিটের পর মিনিট নিঃশব্দে অতিবাহিত হতে লাগল। কিন্তু আমার মুখে ভাষা নাই। মুহূর্ত্তে কথা বলার সাহসটুকুও অন্তর্হিত হয়ে গেছে যেন। অসীম বিরক্তিতে ইচ্ছা হচ্ছিল দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরি। আবেগে সমস্ত অন্তরটা একটা ভিজা স্পঞ্জের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। সহসা ফিয়োডোরা স্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে উঠল,

—তোমাকে ভয়ানক বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, কি হয়েছে বলত ?

—তোমাকে একটা অনুরোধ করব কি না ভাবছিলাম।

ফিয়োডোরার মুখের স্মিত হাসি দেখে বুঝলাম সে আমার কথা শুনতে রাজী আছে সুতরাং অনুরোধ জানালাম। উত্তরে সে বললে—বেশত, কিন্তু তোমার যা বক্তব্য তাতো এখনও বলতে পার ?

—মিথ্যা বলে তোমায় আমি প্রতারণা করব না। কালকের সন্ধ্যাটা তোমার সঙ্গে কাটাতে চাই। অবশ্য আমার ব্যবহারে

তোমার কোন অমর্য্যাদা হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এতদিনের বন্ধুত্বের দাবীতে কাল তোমার কাছ থেকে আমি শেষ বিদায় নিতে চাই—চুপ কর ফিয়োডোরা, আজ আর কোন কথা নয়। বলে তাকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সেইদিনের মতো বিদায় নিলাম।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ফিয়োডোরার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম। সে একাকী ড্রয়িংরুমে বসে আমার প্রতীক্ষা করছিল। দৃঢ়পদে এগিয়ে গেলাম। আজ আর মনে কোন শঙ্কা নাই—নাই কোন দ্বিধা। এখনই আমরা দু'জনে একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হব। হয় ফিয়োডোরা আমার হবে, না হয় আমি শেষ আশ্রয় নেব মৃত্যুর তুহিন-শীতল বাহুবন্ধনে। সুনীল রংয়ের পোষাক পরে একখানা কৌচের 'পরে পা-তুলে দিয়ে সোফায় গা এলিয়ে সে বসেছিল। টুপির নীচ থেকে কয়েকটি চূর্ণ অলক শুভ্র ললাটের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অসীম বৈচিত্র্যভরা ওর সুন্দর মুখের রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে নিত্য-নূতনের লীলা। ওযে এত সুন্দর এর আগে কোনদিন তা চোখে পড়েনি। আমাকে দেখে সে শান্ত স্বরে বলল—তোমার এই অদ্ভুত ব্যবহারে আমি উৎসুক হয়ে উঠেছি।

ফিয়োডোরার পাশে বসে তার কুসুমপেলব হাতখানি ধরে কম্পিত কণ্ঠে বললাম—তোমার গলার স্বরটা কি মিষ্টি!

—এর আগে তুমি আর কোনদিন আমার গলার স্বর শোননি নাকি?

—শুনেছি, কিন্তু আজ যেন তোমার সব-কিছুই বড় সুন্দর—বড় মধুর মনে হচ্ছে। তুমি কি বিরক্ত হচ্ছ ফিয়োডোরা?

—না-না।

তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নানা অসংলগ্ন প্রলাপ বকে গেলাম। তার মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল তার সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। মনে হল যেন ফিয়োডোরা পরম আগ্রহভরে সব শুনছে। এমন কি এক সময় সে আমাকে তার হস্ত চুম্বন করতে পর্য্যন্ত অনুমতি দিলে। সে তার চির অভ্যস্ত লীলাভরে দস্তানা খুলে গোলাপ-কুঁড়ির মতো হাতখানি এগিয়ে দিল। একটি ক্ষণস্থায়ী চুম্বনের মধ্যে অন্তরের সমস্ত আবেগ—সমস্ত অনুভূতি উজাড় করে ঢেলে দিলাম। অর্থহীন স্তুতি শুনতে আর সোহাগ খেতে ফিয়োডোরা আপত্তি করে না কখনও, তা সে যার কাছ থেকেই পাকনা কেন। সুতরাং আমি আমার অধিকারের সীমা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন ছিলাম। জানি আর এক পা এগিয়ে গেলে ওর ঐ কোমল হাতের চম্পক-অঙ্গুলিগুলি নিমিষে বিড়ালের থাবার মতো কর্কশ ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। সুতরাং শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের যে প্রবল ঝড় বইছিল তাকে সবলে সংযত করতে হল। চুপ করে বসে রইলাম।······ফিয়োডোরার মতো নারীকে যতখানি নিকটে পাওয়া সম্ভব তা পেয়েছি। কিন্তু আমি যে চাই ওর আত্মার সান্নিধ্য—চাই ওর জীবনপথের সহযাত্রী হতে। আমার যৌবনের স্বপ্নের স্বপ্ন, জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ওরই মাঝে মূর্ত্ত করে তুলতে চাই। উত্তেজনার চরম মুহূর্ত্তে হঠাৎ বলে উঠলাম—ফিয়োডোরা শোন, তোমায় আমি ভালবাসি। বহুবার আভাসে-ইঙ্গিতে আমার প্রকৃত মনোভাব তোমায় জানিয়েছি। তোমার জন্যে অনেক দুঃখ আমায় সইতে হয়েছে। পৃথিবীতে দুই রকম দুঃখ আছে। এক হচ্ছে নিরঙ্কুশ দৈন্য—যা সদম্ভে ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে সদর রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। আর এক হচ্ছে ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণাবরণে

আচ্ছাদিত আত্মার দৈন্যতা। প্রথমটা হচ্ছে জনসাধারণের দারিদ্র্য। দ্বিতীয়টা হচ্ছে অভিজাত, ঠক আর প্রতিভাশীলদের আত্মার দৈন্যদশা। আমি অভিজাত কিংবা প্রবঞ্চক নই। কিন্তু কিছু প্রতিভা আমার আছে। তাই সুনাম নষ্ট হবার ভয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ভিক্ষা করতে পারি না। ভয় পেওনা ফিয়োডোরা, আত্ম-হত্যা আমি সহজে করব না। আচ্ছা তোমার সঙ্গে যেদিন মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম সেইদিনটার কথা মনে আছে ?

ও ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

—শুধু মাত্র তোমায় দেখবার জন্যে সেদিন আমার শেষ কপর্দকটি খরচ করতে হয়েছে। তারপর গাড়ীভাড়া মিটিয়ে দিতে গিয়ে আমি সত্য সত্যই নিঃস্ব হলাম।

এখন যেমন করে বলছি তখনও ঠিক তেমনি করে তার কাছে আমার দুঃখদুর্দশার কাহিনী সব খুলে বললাম। কারণ তখনও আমি মত্ত ছিলাম তবে সুরায় নয়, প্রেমে। আমার অন্তরের পুঞ্জীভূত কামনা-প্রবাহ সহসা যেন কথার ফুলঝুরিতে আত্মপ্রকাশ করল। জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, ব্যর্থ প্রেমের মর্মান্তিক কাহিনী এমন স্বরে এমন ভঙ্গীতে বলে গেলাম, শুনে মনে হল যেন ভাষার রং দিয়ে ভগ্নহৃদয়ের একখানি ছবি আঁকছি। এ যেন সমর-ক্ষেত্রে মৃত্যু-আহত সৈনিকের শেষ বিলাপ। ফিয়োডোরা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলাম। সার্থক আমার অভিনয়। ফিয়োডোরার ঐ অশ্রুর প্রকৃত মূল্য কতটুকু তা আমি জানি। একখানা ভাল ট্রাজিডির শেষ দৃশ্য দেখলেও ওর চোখ দিয়ে ঠিক অমন ধারা অশ্রুই গড়িয়ে পড়ত। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—আগে যদি জানতাম তাহলে—।

—ওকথা বলনা। তোমায় আমি এখনও এত ভালবাসি যে তোমাকে হত্যা করতে—।

চকিতে ফিয়োডোরার মুখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠল। সে ঘন্টা বাজিয়ে চাকর ডাকতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলাম। তারপর বললাম,—ভয় নাই, তোমায় আমি শান্তিতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে দেব। যদি শারীরিক বল প্রয়োগ করতে চাইতাম তাহলে তার সুযোগ আমি বহু পূর্ব্বেই পেয়েছিলাম। তোমার শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার নগ্ন সৌন্দর্য্যের পানে চেয়ে ইতিপূর্ব্বে একটা রাত কাটিয়ে গেছি।

—ম্‌সিয়ে, ফিয়োডোরার সারা মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। সে ঘৃণা-মিশ্রিত স্বরে বললে—তুমি কি মানুষ, না আর কিছু?

—ফিয়োডোরা, একবার ভেবে দেখ তোমার সৌন্দর্য্য আমায় কি নিদারুণভাবে আকর্ষণ করেছে। তোমার ঐ সুন্দর মুখে দেখতে পেয়েছিলাম সুন্দরতর আত্মার প্রতিচ্ছায়া। যে পুরুষেরা নারীকে মনে করে শুধু দেহসর্ব্বস্বিনী, তারা প্রতিসন্ধ্যায় নবাব-হারেমের বাঁদীদের মতো সুন্দরী মেয়ে ভাড়া করে এনে প্রেমের সাধ মিটায়। আমি তাদের দলে নই। তাই চেয়েছিলাম তোমার মতো হৃদয়-হীনার হৃদয় জয় করতে, কিন্তু সফল হতে পারলাম না। তবে এই কথা ঠিক জেনো, তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করলে তাকে আমি হত্যা করে আমার এই সুদুঃসহ দুঃখের প্রতিশোধ নেব।

ফিয়োডোরা অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলল—এই প্রতিশ্রুতি পেলে তুমি যদি সুখী হও তাহলে শোন, জীবনে আমি কোনদিন বিয়ে করব না।

বাধা দিয়ে বললাম—তুমি স্রষ্টার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে তাঁকে

অপমানিত করতে চাইছ। এই বিদ্রোহের অনিবার্য্য শাস্তিও তোমায় একদিন পেতে হবে। একদা আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘরে বসে নিঃসঙ্গ জীবনের অসহ্য বেদনায় গুমরে গুমরে কেঁদে উঠবে আর ব্যর্থপ্রয়াসে বারবার তোমার সেই অসীম দুঃখের কারণ খুঁজে বেড়াবে। তখন স্মরণ কর আমাকে, স্মরণ কর তাদের—যারা তোমার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে রেখে যাচ্ছে সুতীব্র অভিশাপ, আর তুমি অঞ্জলি ভরে তাই কুড়িয়ে নিচ্ছ।

ফিয়োডোরা মৃদু হেসে বলল—তোমাকে ভালবাসতে পারিনি বলে কি আমি অপরাধী? ভালবাসতে না পারাটা কি আমার দোষ? শুধু তুমি কেন পৃথিবীর কোন পুরুষকেই আমি ভালবাসি না। চাই না অপর কারও ইচ্ছার বেদীমূলে আমার জীবন উৎসর্গ করতে। বিবাহবন্ধন আমাদের জীবনে বয়ে আনে শুধু দুঃখ আর দৈন্য। তাছাড়া ছেলেমেয়ে দেখলেই আমার মন বিরক্তিতে ভরে উঠে। তুমি এতদিন আমার জন্যে যে সব ত্যাগ-স্বীকার করেছ তাতে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি তোমার আজকের এই নাটুকেপনা ক্রমেই অসহ্য বোধ হচ্ছে।

অতিকষ্টে কান্না চেপে বললাম—জানি আমার ব্যবহার ক্রমেই অর্থহীন হয়ে উঠছে। কিন্তু তোমার প্রেমে সারা মন এমন ভাবে ছেয়ে আছে যে তোমার দেওয়া কোন আঘাতই আঘাত বলে মনে হয় না। এই প্রেমের গভীরতা একবার যদি প্রমাণ দিয়ে দেখাতে পারতাম!

—পুরুষেরা প্রায় সকলেই কম-বেশী ঐ একই গৎ আওড়ায়। কিন্তু এদিকে রাত প্রায় দুপুর হল। আমি এইবার শুতে যাব।

—এবং ঘটা দুয়ের মধ্যেই মানসিক যন্ত্রণা সইতে না পেরে আর্ত্তকণ্ঠে ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করবে।

—ওঃ সেদিন একটা ব্যবসার লেন-দেনের কথা ভাবতে ভাবতে একবার ভগবানের নাম করেছিলাম।

ক্রোধে আমার চোখ জ্বলে উঠল। মনে হল প্রচণ্ড পাপের মধ্যে কখনও কখনও কাব্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায়। নিরন্তর কামনার তাপে তপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রেম-নিবেদন শুনতে অভ্যস্ত ফিয়োডোরা ইতিমধ্যেই আমার সমস্ত অশ্রু, সমস্ত কাকুতি বেমালুম ভুলে গেছে। তিক্ত স্বরে জিগ্যেস করলাম—তুমি ফ্রান্সের কোন ধনী ব্যক্তিকে বিয়ে করতে রাজী আছ?

—হ্যাঁ, অবশ্য তিনি যদি একজন ডিউক হন।

টুপি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ফিয়োডোরা ব্যঙ্গের স্বরে বলল—তোমায় সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেব কি?

—ম্যাডাম···

—মঁসিয়ে···

—জীবনে আর কোনদিন তোমার মুখ দেখব না।

—আমিও তাই চাই।

দুঃসহ অপমানে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বললাম,

—তুমি ডাচেস্ হতে চাও, উপাধির উপর তোমার খুব লোভ দেখছি। বেশত, আমায় বিয়ে করে আমাকেই তোমার ডিউক করে নেও না?

—আইন পড়ে তোমার বুদ্ধি কিঞ্চিৎ বেড়েছে দেখছি। ফিয়ো-ডোরার অধরে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল।

উত্তেজিত স্বরে বললাম—শোন ফিয়োডোরা, তুমি বর্তমান আর আমি ভবিষ্যৎ। আমি এক নারীকে হারালাম বটে কিন্তু

তুমি খ্যাতি ও প্রতিপত্তিশালী এক পরিবারের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হলে। কিন্তু সময় তোমার এই বিদ্রোহের প্রতিশোধ নেবে। একদা বার্দ্ধক্যের করাল স্পর্শে তুমি ভগ্নদেহে ভগ্নহৃদয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। আর আমি?—আমার জন্যে রইল খ্যাতি ও সম্মান।

ফিয়োডোরা নিরাসক্ত নিরস কণ্ঠে বলল—তোমার এই ভবিষ্যৎ-বাণীর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বিজাতীয় ঘৃণায় তার মুখের পানে চাইলাম। ও যেন জীবনে আর আমার মুখ দেখতে চায় না ঠিক এমনি ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। অসহ্য মনে হল ওর দম্ভ। দ্রুতপদে রাস্তায় নেমে এলাম।

ফিয়োডোরাকে ভুলতে হলে এখন আমার সম্মুখে মাত্র দুইটা পথ খোলা আছে। হয় মৃত্যু না হয় আবার আমার পুরানো তপস্যায় ফিরে যাওয়া। পুরানো জীবনেই ফিরে এলাম। রাত দিন পড়াশুনার মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে রেখে ভুলতে চাইলাম তাকে। কিন্তু ভোলা কি যায়? আমার প্রেরণার উৎস হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেছে। ব্যর্থ প্রেমের আঘাতে যে সাহসটুকু ফিরে পেয়েছিলাম তারই উপরে নির্ভর করে কাজে মন দিতে চাই। কিন্তু ভূতের ভয়ের মতো ফিয়োডোরার স্মৃতি এসে আনমনা করে তোলে। প্রতিটি চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় তারই মুখ। প্রাচীন মিশরের সন্ন্যাসীদের মতো আত্মাকে বাহিক সুখদুঃখ থেকে নির্লিপ্ত রাখতে চাই। কিন্তু দেহের দাবী আত্মার দাবীকে ছাপিয়ে উঠে। এমনি করে দিন পনের কাটল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা পলিন এসে আমার ঘরে ঢুকল। সে

ব্যথিত স্বরে বললে—একি করছ তুমি? এ যে আত্মহত্যা। মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা শুনা গল্প-গুজব কর।

—আমি মরতে চাই। পলিন, তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমার মৃত্যুর কারণ ফিয়োডোরা। ওরই জন্যে আজ আমার জীবন দুর্বিষহ।

পলিন ম্লান হেসে বলল—কেন মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছ, পৃথিবীতে কি ফিয়োডোরা ছাড়া আর কোন মেয়ে নাই?

অবাক্ বিস্ময়ে দৃষ্টি তুলে তার মুখের পানে চাইলাম। ওর কথার অর্থ যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠবার আগেই সে ছুটে পালিয়ে গেল। অগত্যা পাণ্ডুলিপিখানি হাতে করে প্রকাশকের বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। দেখি যদি কিছু টাকা পাওয়া যায়। এদিকে দেনায় যে একেবারে তলিয়ে গেছি। রাস্তায় র‍্যাস্টিগনেকের সঙ্গে দেখা হল। সে বিস্মিত স্বরে বলল—হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলে নাকি হে?

—ফিয়োডোরাই আমায় শেষ করেছে। কিছুতেই ওকে ভুলাতে পারছি না।

র‍্যাস্টিগনেক হেসে উঠে বলল—তুমিও ওকে শেষ করে দাও, তাহলেই চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবে।

—আমি নিজেও সে কথা অনেকবার ভেবেছি। খুন করেই হোক্ অথবা ধর্ষণ করেই হোক্ যেমন করে পারি প্রতিশোধ নেব। এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়েছে। ঐ সুন্দরী শয়তানীটার পানে চাইলেই আমার অন্তরের সমস্ত বিদ্বেষ নিমিষে জল হয়ে যায়।

—শুধু ফিরোজোরা নয়, অভিজাত সমাজের প্রত্যেকটি মেয়েই তাদের কাছে আলেয়ার মতো। দেখা দেয় কিন্তু ধরা দেয় না।

-কিন্তু আমি যে আর পারছি না বন্ধু, করুণ কণ্ঠে বললাম—মরণ ছাড়া এখন আমার আর কোন গতি নাই। আফিম খেলে কেমন হয়?

—বড্ড বিদকুটে।

—গলায় দড়ি?

—বৈচিত্র্যহীন।

—সিনের জলে ডুবে মরা?

—কিন্তু সিনের জল যে ভয়ানক ঘোলা।

—পিস্তল?

—যদি লক্ষভ্রষ্ট হও চিরদিন বিকলাঙ্গ হয়ে থাকতে হবে। শোন বন্ধু, একদা তোমাদের মতো আমিও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম আত্মনিধনের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। চরম উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে ডুবে যাও, ধীরে ধীরে মৃত্যু এসে তোমায় মুক্তির পথ দেখাবে। ব্যভিচার হচ্ছে মৃত্যুকুল-সম্রাজ্ঞী। সম্রাজ্ঞীর মতোই অকৃপণ হস্তে সে তোমায় এনে দেবে ক্ষয়রোগ। তোমার বক্ষপঞ্জরে তার আঘাত হবে পিস্তলের গুলির মতোই অব্যর্থ। আফিমের মতোই অনিবার্য্য তার বিষের ক্রিয়া। যাদের প্রতিভার কোন বালাই নাই আত্মহত্যা করে তারাই। কিন্তু তোমার মতো অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তির মৃত্যুর মাঝেও অসাধারণত্ব থাকা উচিত। চরম উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠো তারপর নিভে যাও—নিঃশেষ হয়ে যাও।

র‍্যাস্টিগনেক আমায় অনেক বোঝালে। তার সমগ্র পরিকল্পনাটা যথেষ্ট কাব্যিক এবং রোমাঞ্চকর বলে মনে হল। নূতন নেশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে হলেও যে টাকা চাই। কথাটা র‍্যাস্টিগনেককে বলতেই সে বললে—তুমি পাবলিশারের কাছ থেকে সাড়ে চার শ ক্রাঙ্ক তো পেয়েছ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আমার দর্জির কাছে দেনা আছে, বাড়ীওয়ালাও কিছু পাবে বোধ হয়—।

—দর্জির দেনা শোধ করে দাও, আর বাকী টাকা দিয়ে জুয়া খেলতে শুরু কর।

জুয়া খেলতে শুরু করবো? কথাটা ভাবতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল। র‍্যাস্টিগনেক আমার মনের ভাব কতকটা বুঝল বোধ হয়। সে মৃদু হেসে বলল—চরিত্রহীন হতে চাও তুমি অথচ জুয়ার টেবিলে বসতে ভয় খাচ্ছ?

—বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে জীবনে কোনদিন জুয়ার আড্ডায় যাব না। শুধু যে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যেই জুয়া খেলতে চাই না তা নয়, জুয়ার টেবিলের কাছে গেলেই আমার হাত-পা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আসে। বরং তুমি এক কাজ কর। এই একশ' ক্রাউন নিয়ে তুমিই আমার হয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করবে। আর আমি ওদিকের সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে এসে তোমার ঘরে বসে প্রতীক্ষা করব ভাগ্যচক্রের নবতম আবর্ত্তনের।

র‍্যাস্টিগনেক রাজী হল। তাকে একশ' ক্রাউন দিয়ে বাসার দিকে রওনা হলাম। জীবনে আজ এই প্রথম মর্ম্মে মর্ম্মে এই সত্য উপলব্ধি করছিলাম যে কোন পুরুষ যদি এমন কোন নারীর ঘনিষ্ঠ

সংস্পর্শে আসে যাকে ভালবাসতে পারে না কিংবা অত্যধিক ভালবাসে, তাহলে পুরুষটির জীবন বিষিয়ে উঠে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ আর দুর্দশায়। কারণ নিরন্তর সুখ-সম্ভোগে আমাদের কর্মশক্তি নষ্ট হয়ে যায় আর দুঃখের নির্মম স্পর্শে অন্তরের সদ্‌গুণগুলি মুকুলে শুকিয়ে আসে। বাসায় ফিরে এসে আমার এতদিনের আশ্রয় এই ক্ষুদ্র ঘরখানির চারদিকে শেষবারের মতো স্নেহের দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। দীর্ঘ দিনের সাধনার পীঠস্থান এই ঘরখানি থেকে শেষ বিদায় নিতে মন ভারী হয়ে উঠছিল। এমন সময় পলিন এল।

—কি হলো তোমার? সে শুধাল।

ধীরে ধীরে উঠে তার মার প্রাপ্য টাকাগুলি গুনতে লাগলাম। সে ভীত ব্যথিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

—পলিন, আমি তোমাদের এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

—তুমি যে যাবে তা আমি আগেই জানতাম।—আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। সান্ত্বনার স্বরে বললাম—দুঃখ করোনা পলিন, হয়ত আমি আবার ফিরেও আসতে পারি, তাইজন্যে তোমাদের ঘরের ছয় মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে যাচ্ছি। যদি নভেম্বর মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে ফিরে না আসি তাহলে আমার যা কিছু রইল সব তুমি নিয়ে নিও। শুধু আমার লেখা বইখানির পাণ্ডুলিপিটা যে কোন একটা ভাল লাইব্রেরীতে দান করে দিও।

পলিন আঙ্গুল দিয়ে পিয়ানোটা দেখিয়ে ব্যথিত স্বরে বলল—তুমি চলে গেলে আমার আর বাজনা শেখা হবে না।

তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে নিরুত্তর রইলাম। সে আবার শুধালে—তুমি আমার কাছে চিঠি লিখবে তো?

—না, এই আমাদের শেষ বিদায়, বলে পরম স্নেহে পলিনকে

বুকের কাছে টেনে এনে তার তুষারশুভ্র ললাটে একটা চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দিলাম। ও লজ্জায় ছুটে পালাল।

ম্যাডাম গাউডিনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল না সুতরাং ঘরের চাবিটা দেয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। প্রায় যখন ক্রুগ্নি রোড পর্য্যন্ত এসে পৌছেছি তখন সহসা পিছনে নারীসুলভ পদশব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি পলিন আসছে। সে বলল,

—এই টাকার থলেটা আমি তোমার জন্যে সেলাই করেছিলাম, এটা নিয়ে যাও।

থলেটা নিলাম। তাকিয়ে দেখলাম ওর দুটি চোখে টলটল করছে মুক্তা-বিন্দুর মতো শুভ্র অশ্রু। হঠাৎ চোখের সামনে ভূত দেখলে মানুষ যেমন করে চমকে উঠে ছুটে পালায় তেমনি করে পলিনের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে এলাম।

র‍্যাস্টিগনেকের আসার প্রতীক্ষায় তার ঘরে বসে ছিলাম। অদূর ভবিষ্যতে যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা শুরু করবো বলে মনস্থ করেছি তার সঙ্গে র‍্যাস্টিগনেকের গৃহসজ্জার হুবহু মিল রয়েছে দেখে বিস্মিত হলাম। চিমনির পাশে ভেনাসের একখানা প্রতিমূর্ত্তির মাথার উপরে একটা আধপোড়া-সিগারেট পড়ে আছে। দামী আসবাব-পত্রগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। একখানা সুন্দর কৌচের উপরে কতকগুলি ছেঁড়া মোজা স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। যে সোফাটার 'পরে বসেছিলাম। সেটার ভাঙ্গা হাতল আর ছেঁড়া গদি বৃদ্ধ সৈনিকের দেহের আঘাত-চিহ্নের মতো দৃষ্টিকে পীড়িত করে। জুয়ারীর জীবনের মতোই এই ঘরখানিরও সব কিছুই বিশৃঙ্খল। একটা নগ্ন মেয়ের প্রতি-কৃতির পানে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ

একটা শব্দ শুনে চমকে উঠে দেখলাম র‍্যাস্টিগনেক ফিরে এসেছে। সে লাথি মেরে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল, তারপর চিৎকার করে বলে উঠল—জিতেছি—জিতেছি বন্ধু, অন্ততঃ কয়েকটা দিন এখন শান্তিতে মৃত্যুর আরাধনা করা যাবে। বলে টেবিলের উপর কতকগুলি মোহর ছড়িয়ে দিল। আনন্দে আদিম যুগের নরমাংস-লোলুপ বর্ব্বরদের মতো লাফাতে শুরু করে দিলাম। মনে হলো আমাদের ইহকাল পরকালের সমস্ত সুখের সম্ভাবনা যেন রূপপরিগ্রহ করেছে ঐ মুদ্রা কয়টির মধ্যে।

র‍্যাস্টিগনেক টেবিলের 'পরে আরও কতকগুলি ব্যাঙ্ক-নোট রাখতে রাখতে বললে—সবসুদ্ধ সাতাশ হাজার ফ্রাঙ্ক জিতেছি। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে এই টাকাই হয়ত যথেষ্ট কিন্তু লালসার আগুনে আত্মাহুতি দিতে হলে আরও অনেক—অনেক—অনেকগুণ বেশী টাকার প্রয়োজন।

তারপর সমস্ত টাকাগুলি দুইজনে আধাআধি ভাগ করে নিলাম।

—এখনই ঘুমাতে পাবে না, বলে র‍্যাস্টিগনেক চাকরকে ডেকে বলল—যোসেপ, মদ নিয়ে আয়। যোসেপ টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন আমি টেইটবাউট্ রোডে একখানা ঘর ভাড়া নিলাম। লিসেগের বাজার থেকে আসবাবপত্র কিনে এনে প্যারীর সেরা সজ্জাকরকে ডেকে ঘর সাজান হলো। তারপর শুরু হলো বিলাসের অথৈ জলে সন্তরণ। নাচের আসরে আর বন্ধুদের আড্ডায় নিয়মমত জুয়া খেলছিলাম। বন্ধুও জুটে গিয়েছিল অনেক। একই পথের পথিক সবাই। এই সময় সাহিত্য-সম্বন্ধে আমার কয়েকটি লেখা বেরুল। বন্ধুরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে। সমালোচকেরা আমার লেখায় তাদের সমকক্ষ এক নবীন প্রতিযোগীর আবির্ভাবের কোন সম্ভাবনা

দেখতে পেল না বোধ হয়। তাই তারাও রচনাগুলির প্রশংসা করল। হাসিখুশী দিলদরিয়া মেজাজের একজন বুদ্ধিজীবী হিসাবে সর্ব্বত্র সম্মান পেতে লাগলাম। কিন্তু শীঘ্রই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভয়াবহ রূপ দেখে শিউরে উঠলাম। ইন্দ্রিয়ের সেবাও কাব্যচর্চ্চার মতোই একটা কঠিন কলাবিদ্যা। পরিপূর্ণরূপে চরিত্রহীন হতে হলে চাই শক্তিশালী মন। উচ্ছৃঙ্খল রতিলীলার সমস্ত রহস্য—সবটুকু মাধুর্য্য উপভোগ করতে হলে মানসিক শক্তির প্রয়োজন। মানুষের চরম সম্ভোগের পথ বন্ধুর। স্নায়ু-শিরার যে প্রচণ্ডতম স্পন্দনে শরীরের শক্তি ক্ষয় হয়ে আসে তারই নাম দিয়েছি আমরা সুখ। এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক সংঘর্ষকেও ঐ একই আখ্যা দেওয়া যায়। মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করলে দেখবে যৌবনে তাঁরা প্রায় সকলেই ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। তাঁদের এই ইন্দ্রিয়াসক্তিই প্রশমিত করেছে তাঁদের প্রতিভার প্রচণ্ডতাকে। নইলে কোন মহৎ কাজই তাঁরা করে যেতে পারতেন না।······উচ্ছৃঙ্খল সম্ভোগে উন্মত্ত মানুষের চোখে সমগ্র দুনিয়াটাই রঙিন হয়ে দেখা দেয়। মনে হয় যেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশক্তিমান অধীশ্বর হচ্ছ তুমি—তুমি ইচ্ছা করলে আপনার খেয়াল খুসিমতো একে পরিবর্ত্তিত করতে পার। তারপর দীর্ঘ দিনের অনাচারের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় একদা জেগে উঠে দেখবে তোমার দেহ-মনের উপরে সর্ব্বগ্রাসী আধিপত্য বিস্তার করে বসে আছে এক শয়তান। অপরাজেয় সে—অখণ্ড তার প্রভাব। আমার ভবিষ্যৎও প্রায় নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে। ক্ষয়রোগের করাল স্পর্শে একদা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে আমাকে। এই ভোগ-কলুষিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা শুরু করবার দিনকয়েক পরে এক থিয়েটারের দরজায় ফিয়োডোরার সঙ্গে দেখা হলো। গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল সে।

আমাকে দেখতে পেয়ে তার ঠোঁটে ফুটে উঠল মৃদু হাসির রেখা। তার ঐ হাসি যেন নীরব ভাষায় বলছিল—সে কি! এখনও বেঁচে আছ তুমি? হঠাৎ হৃৎপিণ্ডটা প্রচণ্ড বেগে দাপাদাপি শুরু করে দিল। সারাটা মন চিৎকার করে বলে উঠল—ওকে না পেয়ে হতাশায় মরণ কামনা করছ তুমি, সুরায় আকণ্ঠ ডুবে থেকে ওকে ভুলতে চাইছ, কিন্তু পারছ কি? মত্ত অবস্থায় বারবনিতার শয্যায় শুয়েও ওরই কথা বলছ।. তোমার শয্যাসঙ্গিনীকে ওরই নাম ধরে ডেকে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলছ। তার চেয়ে—তার চেয়ে দুই হাতে হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ওর পায় লুটিয়ে দাও। একদিনে সব শেষ হয়ে যাক্।······

এদিকে টাকাকড়ি যা ছিল তাও প্রায় শেষ হয়ে এল। হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা ধার করতে বাধ্য হলাম। প্রথম যখন টাকা ধার করি তখন সহসা আত্মগ্লানিতে আমার সারা মন ভরে উঠল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্যে। পরক্ষণেই মনের সঙ্গে দেহের দাবীর সন্ধি হল। তারপর দেনায় একেবারে তলিয়ে গেলাম। এখন ধূসর রঙের উর্দি পরা ব্যাঙ্কের কোন কর্ম্মচারীকে দেখলেই ভয়ে কেঁপে উঠি। মনে হয় এখনই বোধ হয় সে এসে ঋণ পরিশোধ করতে বলবে। এমন কি হয়ত আমার ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারের কৈফিয়ত চাইবে। হয়ত বলবে—দেনার দায়ে টিকি পর্য্যন্ত বাঁধা তবু দামী পুডিং আর শরবত খেতে লজ্জা করে না তোমার? আমার পাওনা টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে যত খুশি স্ফূর্ত্তি কর না বাপু। কবিতা-রচনার সময় কিংবা কোন চিন্তার ফাঁকে অথবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে যখন চা খেতে বসি তখন সহসা কোন ছেঁড়া টুপি পরা লোককে ভিতরে আসতে দেখলে পাওনাদার বলে ভুল করে চমকে উঠি। আমার দেনার মূর্ত্তিমান অভিব্যক্তি-রূপে ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীগুলো জীবনের সমস্ত সুখশান্তি হরণ করে

নিয়েছে। ভূতের মতো ভয় করি ওদের। রাস্তায় চলতে চলতে যখন কোন পাওনাদারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মনে মনে তাকে যতই ঘৃণা করি না কেন মুখে হাসি ফুটিয়ে নমস্কার করি। সে পরম অবজ্ঞাভরে প্রত্যভিবাদন করে পরক্ষণেই শুধায়—আমার টাকাটা শোধ দিচ্ছেন কবে? তাকে মিথ্যা আশ্বাস দেই। তারপর আবার নবতম ধারের সন্ধানে ঘুরতে থাকি। দেনার দায়ে আমার সমগ্র সত্তাই যেন বন্দী হয়ে গেছে ব্যাঙ্কের লেজারের পাতায় লাল কালির অক্ষরে। জামা কাপড় চেয়ার টেবিল আলনা সোফা স্লেটি এক কথায় আমার নিজের বলতে যা-কিছু ছিল তাই থেকেই পাওনাদারের মুখগুলো ঝিঁঝি পোকার মতো উঁকি মেরে চায়। ঋণ হচ্ছে চরিত্রবান লোকের পক্ষে একটা জীবন্ত অভিশাপের মতো। দেনার দায়ে অতি বড় সৎলোকও প্রবঞ্চক হয়ে উঠে। অভাবের তাড়নায় আমি একটা মনগড়া সম্পত্তির মিথ্যা দলিল বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা ধার করেছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই এই প্রবঞ্চনা ধরা পড়ে গেল। অবশেষে অনিবার্য্য কয়েদ-বাস থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমার মহান তীর্থ সেই ক্ষুদ্র দ্বীপটি, যেখানে মাকে কবর দেয়া হয়েছিল, সেইটিও বিক্রী করতে বাধ্য হলাম। নোটারি-আপিসে বসে চুক্তিপত্রখানি সই করতে করতে দুঃসহ দুঃখের হিমেল স্পর্শে অভিভূত হয়ে গেলাম।

ঠিক এমন ধারা একটা অনুভূতি আমার আর একবার হয়েছিল বাবার মৃত্যুদিনে তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে। সহসা মার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম যেন। তিনি আমার নাম ধরে ডেকে ঐ পুণ্যভূমি বিক্রী করতে নিষেধ করে দিলেন। তাঁর শুভ্র শান্ত মুখখানি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু তবুও জমিখানি বিক্রী করতে হল। যে টাকা পেলাম তাই দিয়ে সমস্ত দেনা

শোধ করবার পরও আমার হাতে দুই হাজার ক্রাঙ্ক রইল। ইচ্ছা করলে এই টাকার উপর নির্ভর করে আবার আমার পিছনে ফেলে আসা জীবনপথে ফিরে যেতে পারতাম। ফিরে যেতে পারতাম দুর্দিনের আশ্রয় পলিনদের সেই ছোট্ট ঘরে অসমাপ্ত তপস্যার সমাপ্তির প্রয়াসে। কিন্তু আমার মনের 'পরে ফিয়োডোরার বজ্রমূর্তি তখনও বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। প্রায়ই তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেত। এমন কি আমার আর্থিক সাফল্যে বিস্মিত হয়ে সে বন্ধুবান্ধবদের কাছে যে সব কানাঘুষা করত তাও শুনতে পেতাম। তবু তার ব্যবহারে কোন পরিবর্তন এল না। নিদারুণ প্রতিহিংসায় পৃথিবীটাকে সুদ্ধ বিষিয়ে দিতে চাইলাম। কামনার পঙ্কপল্বলে আকণ্ঠ ডুবে গেছি তবুও তাকে ভুলতে পারি না—ভুলতে পারি না আমার প্রথম প্রেম। উচ্ছল রজনীর উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে, মত্ত দেহের অসংযত রতিলীলার মধ্যেও তার স্মৃতি আমায় ছায়ার মতো অনুসরণ করে। অবশেষে যখন ভুল ভাঙ্গল—যখন বুঝলাম ফিয়োডোরা আমার জীবনে একটা দুরা-রোগ্য ব্যাধির মতো এসে দেখা দিয়েছিল তখন শঙ্কিত দৃষ্টিতে মনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ইতিমধ্যেই সেখানে দুষ্টক্ষতের সৃষ্টি হয়ে গেছে। শয়তান আমার ললাটে এঁকে দিয়েছে চিরস্থায়ী কলঙ্ক-তিলক। এখন আর নিঃসঙ্গ নিরালা জীবন নয়, এখন চাই বারবনিতা আর চাটুকারদের মধ্যে বসে দিবারাত্র সুরার স্রোতে গা ভাসাতে। সাংসারিক, সামাজিক বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত আমি, দিনের পর দিন ছুটে চলেছি চরম পরিণতির দিকে। মৃত্যু! হ্যাঁ মৃত্যুই হচ্ছে এখন আমার জীবনের শেষ আশ্রয়। সারারাত ধরে মৃত্যুর আরাধনা করি কিন্তু ভোরের আলো আবার আমায়

জীবনের স্বাদ স্মরণ করিয়ে দেয়। তারপর যখন মাত্র বিশটি ক্রাঙ্ক ছাড়া আর সমস্ত অর্থই নিঃশেষিত হয়ে গেল তখন র‍্যাস্টি-গনেকের কথা স্মরণ হলো। প্রসিদ্ধ জুয়ার আড্ডা প্যালেস রয়েলে গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হলাম। * * * * *

র‍্যাফেল থামল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর মদের নেশায়ই হোক্ অথবা অতীত স্মৃতির আলোড়নেই হোক্ সে সহসা উত্তেজিতভাবে তারস্বরে চিৎকার করে উঠে—মরণ—মরণ হোক্ শয়তানের। কিন্তু আমি বাঁচতে চাই। আজ অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক আমি। ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তে তোদের সব-কিছু কিনে নিতে পারি। এই কুকুরের দল! কার্পেটের উপর পড়ে গড়াগড়ি না দিয়ে উঠে দাঁড়া। সেলাম কর্ আমায়। অভিজাত সমাজের অপদার্থের দল, তোদের আমি আশীর্ব্বাদ করছি। আমি পোপ্। বলে র‍্যাফেল বৃদ্ধের দেয়া সেই চামড়াখানা নাড়তে থাকে। তার চিৎকারে মাতালদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। স্খলিতপদে উঠে দাঁড়িয়ে তারা মত্তকণ্ঠে চেঁচামেচি শুরু করে। র‍্যাফেল ধমক দেয়—চুপ্ কর্ কুকুরের দল, শীগ্‌গির খাঁচায় গিয়ে শুয়ে পড়্ বলছি। এমিল, আজ অনেক টাকার মালিক আমি। তোমায় হ্যাভেনা সিগারেট খাওয়াব।

—তোমার গল্প আমি শুনছি, এমিল জড়িত স্বরে বলে—বলে যাও। হয় ফিয়োডোরা না হয় মৃত্যু। ফিয়োডোরা তোমায় ঠকিয়েছে? ঠকাবেইতো, গোটা মেয়ে-জাতটাই যে ইভের সন্তান। নাঃ তোমার গল্পে নূতনত্ব নেই কিছু।

—অপদার্থ! তুইও ঘুমিয়েছিলি?

—না আমি শুনেছি, হয় ফিয়োডোরা না হয় মৃত্যু।

র‍্যাফেল হাতের চামড়াখানা দিয়ে এমিলকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে—উঠে দাঁড়া বলছি। শোন্ আজ আমি লক্ষপতি।

—তুমি মাতাল হয়েছ।

—হ্যাঁ, ক্ষমতার মদে মাতাল হয়েছি আমি। চুপ, ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তেই তোমায় খুন করে ফেলতে পারি। আমি সর্ব্ব-শক্তিমান নিরো—আমি নেবুচ্যাড্‌নেজার।

—ছিঃ র‍্যাফেল চুপ করো, অমন করে চেঁচালে মান-সম্মান সব যাবে।

—অনেক—অনেকদিন চুপ করে ছিলাম। কিন্তু আর না, এইবার আমি প্রতিশোধ নেব। ইতরের মতো কতকগুলি টাকা খরচ করে কোন লাভ নাই। চাই জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ। চাই পীত—নীল—সবুজ সব রকম্ জরের সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুঞ্জয় হতে। চাই ফিয়োডোরাকে। না—না—না ফিয়োডোরাকে আমি চাই না। তাকে ভুলতে দাও—ভুলতে দাও।

—র‍্যাফেল, তুমি যদি এমনি করে চেঁচাতে থাক তাহলে তোমাকে পাশের ঘরে আটকে রাখতে বাধ্য হব।

—এমিল, এই চামড়াখানা দেখতে পাচ্ছ? এখানা হচ্ছে সোলেমনের দানপত্র। এরই বলে আজ আমি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর। সাবধান, ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তে তোমায় সুদ্ধ কিনে নিতে পারি। তুমি আমার কেনা গোলাম হয়ে আমার জন্যে কবিতা লিখবে আর কাগজ চালাবে। গোলাম—কেনা গোলামের দল! এমিল র‍্যাফেলকে প্রায় জোর করে টানতে টানতে ড্রয়িংরুমে নিয়ে আসে তারপর বলে—হ্যাঁ র‍্যাফেল, আমি তোমার চাকর। শীগ্‌গিরই তুমি একখানা নামজাদা সংবাদপত্রের সম্পাদক হতে

চলেছ, তোমার এই মাতলামি শোভা পায় না। লক্ষীটি অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে একটু চুপ করো। তুমি কি আমায় ভালবাস না?

—তোমায় ভালবাসি কি না? নিশ্চয়ই ভালবাসি। তোমায় আমি হাভেনা সিগারেট খাওয়াব। আর তোমার পায় যদি কড়া পড়ে থাকে তো বল, এখনই তুলে ফেলছি।

—তোমায় কখনও তো এমন ধারা বোকামি করতে দেখিনি।

—বোকা? নিশ্চয়ই না। আমার প্রতিটি অভিলাষ পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে চামড়াখানি সঙ্কুচিত হয়ে আসবে, বিটকেলে বামুন এই নিয়ম করে দিয়েছে—কারণ—

—নিশ্চয়ই—

—আমি বলছি—

—ঠিক বলছ তুমি।

—আমি বলছি এই চামড়াখানার কথা।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তুমি আমার কথা মোটেই বিশ্বাস করনি। তোমায় আমি বেশ ভাল করেই চিনি।

—মাতালের প্রলাপে বিশ্বাস করা যায় কি?

—বেশ বাজি রেখে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করে দিচ্ছি। দাঁড়াও আগে এটা মেপে নিই। বলে র‍্যাফেল স্খলিতপদে সারা ঘরময় ঘুরতে থাকে।

—না, হতভাগাটা কিছুতেই ঘুমাবে না দেখছি, বলে এমিল বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওর গতিভঙ্গীর পানে চায়।

র‍্যাফেল সহসা বানরের মতো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একখানা চাদর টেনে এনে বিছিয়ে ফেলে। তারপর মত্তকণ্ঠে আপন মনে

বলে যায়—আগে চামড়াখানা একবার মেপে দেখি—মেপে দেখি একবার।

এমিল তাড়াতাড়ি সায় দিয়ে বলে—হ্যাঁ র‍্যাফেল, এস চামড়াখানা একবার মেপে দেখি।

দুই বন্ধু চামড়াখানা একটা সাদা চাদরের উপর বিছিয়ে মাপতে শুরু করে। এমিল অকম্পিত হাতে পেন্সিল দিয়ে চামড়াখানার চারপাশে লাইন টানে। র‍্যাফেল সুরাজড়িত কণ্ঠে বলে যায়—আমি দুই হাজার পাউণ্ড চেয়েছি, যখন টাকাটা পাব তখন তুমি দেখবে—

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু এখন তুমি ঘুমাও। এস তোমায় ঐ কৌচটার 'পরে শুইয়ে দিই।

—তাই দাও বৎস, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন? এমিল, তোমায় আমার সমস্ত শক্তি ও সম্পদের সাথী করে নেব। তোমায় আমি—তোমায় আমি সিগারেট—হাভেনা সিগারেট খাওয়াব।

—হে ধনকুবের, এসে শুয়ে পড়। আর এক ঘুমে তোমার ঐ সোনার স্বপ্ন কেটে যাক্।

—আর তুমি? তুমিও ঘুমাও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কবিতা লেখ। শুভরাত্রি। নেবুচ্যাড্‌নেজারকে শুভরাত্রি জানাও। শুভরাত্রি জানাও সর্ব্বশক্তিমান নিরোকে,—প্রেম-সুরা-যশ-ঐশ্বর্য্যকে।

তারপর দুই বন্ধু ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রি গভীর হয়। একটির পর একটি করে প্রদীপ নিভে আসে। অবশেষে রজনীর নিবিড় কালো আস্তরণের নীচে কামপিষ্ট মানবের সমস্ত আর্ত্তনাদ ঢাকা পড়ে যায়। নিখিল চরাচর শ্রান্তিতে শান্ত হয়ে আসে।

পরদিন বেলা যখন প্রায় দুপুর তখন একুালিনা ক্লান্ত দেহে শয্যার 'পরে উঠে বসল। শব্দ পেয়ে এক্রোসিয়ারও ঘুম ভেঙে

যায়। সে বিরক্তিতে একটা অস্ফুট উক্তি করে উঠে। গত রজনীর প্রদীপের রঙিন শিখায় তার মুখখানি বড় সুন্দর মনে হয়েছিল কিন্তু প্রখর দিবালোকে তাকে কুৎসিত দেখায়। প্রসাধন মুছে গিয়ে তার রোগ-পাণ্ডুর মুখের সমস্ত কদর্য্যতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ক্রমে ক্রমে অতিথিরাও একে একে জেগে উঠে। নৈশ অত্যাচারের ফলে তাদেরও হাত-পাগুলি অসাড় মনে হয়। সারা গায়ে রজনীর অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ প্রকট হয়ে উঠে। মেয়েগুলোর অবস্থা আরও মর্ম্মন্তুদ। মাথার বিস্রস্ত চুলগুলি ঝুলে পড়েছে। সমস্ত ঔজ্জ্বল্য মুছে গিয়ে শুষ্ক মুখে ফুটে উঠেছে নির্ব্বোধের হাসি। অত্যধিক শ্রান্তিতে দৃষ্টি শীর্ণ, রং উঠে গিয়ে ঠোঁটগুলি বিশ্রী রকম ফ্যাকাশে দেখায়। বেশবাস অসংবৃত। রজনীর নর্ম্মসহচরীদের এই বাস্তব রূপ দেখে পুরুষেরা চমকে উঠে। প্রস্ফুটিত পুষ্প-স্তবকের উপর দিয়ে জনতার এক বিরাট্ মিছিল চলে গেলে ফুলগুলি যেমন থেঁতলে গিয়ে পথের ধারে পড়ে থাকে, মেয়েগুলোর চেহারা হয়েছে ঠিক তেমনি। লুপ্তশ্রীর এই বিশ্রী ব্যঙ্গে পুরুষেরা ঘৃণায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু তাদের চেহারাও কিছু কম কুৎসিত হয়নি। কোটরাগত চোখগুলি জল্ জল্ করছে। গালের হাড় যেন চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। ঘরের আসবাবপত্রের অবস্থা দেখে ওদের মুখে আর কথা ফোটে না। চেয়ার টেবিল সোফা প্লেট ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে। কামের জান্তব তাড়নায় গতরাত্রে ওরাই আসবাবপত্রগুলি সব ভেঙে চুরে একাকার করে ফেলেছে।

কিছুক্ষণ পরে টেলিফার স্খলিতপদে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে। তার অদ্ভুত ভঙ্গীতে অতিথিরা হেসে উঠে—শ্মশানের হাসির মতো বীভৎস সেই হাসি। সম্পদ ও দৈন্যের যুগপৎ সমাবেশে

নারকীয় এই উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্যে টেলিফার আপ্রাণ চেষ্টা করে। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে মহাপাপে অভ্যস্ত ভ্রষ্টার দল অতীত কুমারী-জীবনের গৌরবময় দিনগুলি স্মরণ করে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। পুরুষদেরও মনে জাগে হেলায় ফেলা আসা পারিবারিক জীবনের শান্ত শ্রীর স্মৃতি। এই সময় পিতা অথবা সন্তানদের সঙ্গে প্রাতরাশে বসত তারা—সরল অনাড়ম্বর হলেও প্রাণরসে ভরপুর ছিল সে জীবন। শিল্পী তার স্টুডিও এবং সুন্দরী মডেলের কথা ভাবে। ছাত্রের মন ছেড়ে আসা বিদ্যায়তনের স্মৃতিতে ভারী হয়ে উঠে। ঝড়ের পর প্রকৃতির মতো সবাই শ্রান্তিতে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। সহসা এমিল এসে দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢোকে। তারপর মৃদু হেসে বলে—অমন গোমড়া মুখ করে বসে আছ যে সব? এদিকে বেলা দুপুর হয়ে গেছে, আজ আর কোন কাজকর্ম হবে না। এস প্রাতরাশটা এখান থেকেই সেরে নেয়া যাক্।

টেলিফার খাবারের আয়োজন করতে বেরিয়ে যায়। মেয়েগুলি শিথিল দেহ টানতে টানতে আয়নার কাছে গিয়ে বিপর্যস্ত প্রসাধনের যথাশক্তি সংস্কার করে। মুহূর্তে এই ভোগ-বিধ্বস্ত পরিবেশে আবার জীবনের সাড়া জাগে। ভৃত্যের দল টেবিল চেয়ারগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে প্রচুর খাদ্যসম্ভার পরিবেশন করে গেল। পুরুষেরা উঠে ঐ পরিত্যক্ত নারীদের মধ্য থেকেই আবার যথাসম্ভব মনোমত সঙ্গিনী বেছে নিয়ে ভোজনে বসে যায়। এতক্ষণে ওদের জীবন্ত বলে মনে হয়।

নোটারি কাল নৈশ ভোজনের পরই পদোচিত মর্যাদা বজায় রাখতে বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন। আজ আবার প্রাতরাশের সময় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে আসতে দেখে কসি বলে উঠে—সে কি, আমরা নোটারিকে ফেলেই খেতে যাচ্ছিলাম যে!

—আপনি ঠিক সই দিবার সময়টিতেই এসে হাজির হয়েছেন, ব্যাঙ্কার বলে।

—কিন্তু সই দিবেন কিসে? এখানে তো কোন উইল রেজিস্ট্রি হবার সম্ভাবনা নেই। তবে হ্যাঁ, দুই-একখানা বিয়ের চুক্তিপত্র হয়ত তৈরী হতে পারে।

—ঠিক-ঠিক।

—হাঃ হাঃ হাঃ।

এই ধরণের অশ্লীল হাসি-ঠাট্টায় কতকটা যেন বিরক্ত হয়ে নোটারি বললে—আপনারা একটু থামুন, আমি একটা জরুরী কাজে এখানে এসেছি। আপনাদের মধ্যে একজন হঠাৎ অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন।

সবাই উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সেই পরম ভাগ্যবান ব্যক্তির নাম শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

নোটারি র‍্যাফেলকে লক্ষ্য করে বলেন—মঁসিয়ে, আপনার মা'র নাম ও'ফ্লাহাটি ছিল কি?

র‍্যাফেল টেবিলক্লথে মুখ মুছতে মুছতে ঔদাসীন্যভরে জবাব দেয়—হ্যাঁ।

—আপনার নিকট-আত্মীয় মেজর ও'ফ্লাহাটি আঠারশ' চৌদ্দ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় মারা গেছেন। আপনি এখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র আইনসম্মত উত্তরাধিকারী।

—কি সৌভাগ্য, অতিথিরা সমস্বরে বলে উঠে।

নোটারি একটু থেমে আবার বলেন—মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানা উইল করে তিনি সমস্ত সম্পত্তি তাঁর ভায়েকে দিয়ে গেছেন। তারপর সুদীর্ঘ পনের বছর ধরে আমি মেজরের ভগ্নী মেরী ও'ফ্লাহাটির

পুত্র র‍্যাফেলকে খুঁজে বেড়িয়েছি। কাল ভোজসভায় আপনার পরিচয় পেলাম।

র‍্যাফেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। ভাবে মনে হয় ও যেন একটা সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে। অতিথিরা প্রথমে একটু ঈর্ষা বোধ করলেও পরক্ষণেই মুক্তকণ্ঠে র‍্যাফেলকে অভিনন্দন জানায়। সে মুহূর্তে যুক্তিশক্তি হারিয়ে ফেলে, স্থানকালপাত্র ভুলে গিয়ে এমিলের দাগ দেওয়া সেই চাদরখানা বিছিয়ে তার উপরে চামড়াখানা রাখে। একি? চামড়াখানা একটু ছোট হয়ে গেছে যে! ভয়ে র‍্যাফেলের সারা দেহ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। তার অবস্থা দেখে রিস্তন চেঁচিয়ে উঠে—এমিল, শীগ্‌গির ওকে ধর। মনে হচ্ছে যেন ও অজ্ঞান হয়ে যাবে।

ভয়ে র‍্যাফেলের মুখ মৃতের মত সাদা হয়ে গেছে। ভীত দৃষ্টিতে সে বারবার চামড়াখানার দিকে চায়। আজ সে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। সমস্ত কামনাই তার পূর্ণ হবে। কিন্তু প্রত্যেকটি সার্থক-কামনা তার জীবন থেকে ছিনিয়ে নেবে কয়েকদিনের পরমায়ু। এ যেন পথ হারিয়ে ঊষর সাহারার বুকে বিচরণ—প্রতি গণ্ডূষ জল পানের পর তৃপ্ত আত্মা সভয়ে স্মরণ করবে মৃত্যুর কথা।

একুয়লিনা তোষামোদের স্বরে বলে—মঁসিয়ে র‍্যাফেল, আপনি এখন খেয়ালখুশি-মতো পৃথিবীর সব সুখই উপভোগ করতে পারবেন। আমায় কি বকশিশ দেবেন বলুন!

—এস আমরা ওর মামা—মেজর ও'ফ্লাহাটির আত্মার শান্তি কামনা করি।

—ও এখন ফ্রান্সের একজন পিয়ার হবে।

—বাঃ জুলাই বিপ্লবের পর আবার পিয়ার হবে কেন?

—আশা করি মাঝে মাঝে তুমি এখন আমাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে!

—নিশ্চয়ই, টাকা কি করে খরচ করতে হয় তা র‍্যাফেলের জানা আছে।

নিথর নিস্পন্দ র‍্যাফেল। পাথরের মূর্ত্তির মতো নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে বন্ধুবান্ধবদের অভিনন্দন শুনে যায়। কোন প্রশংসাই তার মনের উপর সামান্যতম রেখাপাত করতে পারে না। তার মানসপটে ফুটে উঠে অনাড়ম্বর, আত্মতৃপ্ত, সরল কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি। সারাদিন ক্ষেতখামারে হাড়ভাঙা খাটুনির পর কালো রুটি আর আপেলের মদ দিয়ে পানাহার। রাজা আর ঈশ্বরের 'পরে অখণ্ড বিশ্বাস তাদের। রোব্‌বারদিন খোলা মাঠে প্রাণ খুলে নাচে তারা, ইস্টারের পর্ব্বোপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে উৎসব করে। কোন উচ্চ আশা নেই তাদের—নেই ঐশ্বর্য্যের 'পরে অস্বাভাবিক আসক্তি। হঠাৎ চারপাশের ঐ অভিজাত সম্প্রদায়, বারবনিতার দল আর বিলাসের অজস্র উপকরণগুলোর পানে চেয়ে র‍্যাফেলের দম আটকে আসে। সে খক্ খক্ করে কাশতে থাকে।

—আপনাকে গোটাকয়েক অ্যাস্‌পেরাগাস্ দেব কি? ব্যাঙ্কার প্রশ্ন করে।

—কিছু চাই না আমি, র‍্যাফেল বিরক্তিতে প্রায় চিৎকার করে উঠে।

টেলিফার খুশী হয়ে বলে—বহুত আচ্ছা। এই ত চাই, এতক্ষণে আপনি একজন প্রকৃত লাখপতির মতো কথা বলেছেন। ভদ্রমহোদয়-গণ, আসুন আমরা স্বর্ণশক্তির স্বাস্থ্য পান করি। মঁসিয়ে র‍্যাফেল এখন একজন সম্রাটের মতো শক্তিমান। সব-কিছুরই ঊর্দ্ধে তিনি

আবার সব-কিছুই তাঁর করায়ত্ত? "আইনের চক্ষে সব সমান" ভবিষ্যতে এই অনুশাসন আর তাঁর উপরে প্রযুক্ত হবে না। তিনি কোন আইন মেনে চলবেন না বরং আইনই তাঁকে মেনে চলবে। লাখপতিদের জন্যে কোন কারাগার কিংবা কারারক্ষী আজও সৃষ্ট হয় নাই। কোন জল্লাদই তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না।

র‍্যাফেল ধরা গলায় বলে—তা ঠিক, কারণ তারা নিজেরাই হচ্ছে নিজেদের জল্লাদ।

ব্যাঙ্কার জবাব দেয়—এটা আপনার একটা কুসংস্কার।

—আসুন মদ পান করা যাক্, বলে র‍্যাফেল চামড়াখানা পকেটে রাখে।

এমিল র‍্যাফেলের হাত চেপে ধরে বলে—কি করছ তুমি?—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা প্রায় সকলেই র‍্যাফেলকে চেনেন। কিন্তু একথা বোধ হয় কেউ জানেন না যে ও সম্পদ-সৃষ্টির একটা গুপ্ত কৌশল জানে। ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে ও আমাদের সকলকে বড়লোক করে দিতে পারে।

—মঁসিয়ে র‍্যাফেল, আমি একছড়া মুক্তার হার চাই, একোসিয়া বলে।

—আর আমি দুই ঘোড়ার একখানা ভাল গাড়ী, এক্যুলিনাও দাবী জানায়।

—আমাকে ফি বছর হাজারখানেক করে টাকা দিও।

—আমায় খানকয়েক সিল্কের কাপড়।

—এইবার আমার দেনাটা শোধ দিয়ে দাও।

—বন্ধু, বছরে লাখখানেক করে টাকা পেলেই আমি যথেষ্ট মনে করব, এমিল গম্ভীরস্বরে বলে।

র‍্যাফেল তাকে লক্ষ্য করে জবাব দেয়—তুমি জান এইজন্যে আমায় কি মূল্য দিতে হবে ?

—চমৎকার ওজর দিচ্ছ তুমি !—বন্ধুদের জন্যে আমাদের ত্যাগ-স্বীকার করা উচিত নয় কি ?

র‍্যাফেল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে—তোমরা সবাই জাহান্নামে যাও।

এমিল হেসে বলে—ধনীরা এমনি হৃদয়হীনই বটে ! র‍্যাফেল, তুমি এখন ধনী সুতরাং আত্মম্ভরিতা একটু দেখাবে বই কি ? ইতিমধ্যেই তোমার বুদ্ধি এমনভাবে হ্রাস পেয়েছে যে একটা সাধারণ ঠাট্টা পর্য্যন্ত বুঝতে পার না। এর পর একদিন হয়ত দেখব যে তুমি সত্যি সত্যিই তোমার ঐ চামড়াখানার যাদুশক্তিতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ। বন্ধুদের ঠাট্টার ভয়ে র‍্যাফেল চুপ করে বসে মদ গিলতে থাকে। মদের নেশায় সে মস্তিষ্ককোষগুলিকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে আপনার ঐ আত্মঘাতী শক্তির কথা ভুলতে চায় যেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ডিসেম্বর মাস। অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। এই জল-ঝড়ের মধ্যেই এক ব্যক্তি ভেরেনা রোড ধরে চলছিল। সে হাটে আর দৃষ্টি তুলে রাস্তার দুই পাশের বাড়ীগুলির ফটকের পানে চায়। লোকটি মার্কুইস্ অব্ ভেলেন্টাইনের আবাসখানি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পথিকের দৃষ্টিতে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে শিশুর সারল্য আর দার্শনিকের চিন্তাশীলতা। তার সারা মুখে অতীত দুঃখের অসংখ্য চিহ্ন। দেখলেই মনে হয় বিরূপ ভাগ্যের জলন্ত হাপরে ওর মুখখানি ঝলসে গেছে, পুড়ে খাক হয়ে গেছে ওর অস্থিচর্ম্মসার দেহের সবটুকু জীবনীশক্তি। ওর মাথার রুক্ষ লম্বা চুলগুলি ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। পথিক আরও কিছুক্ষণ চলে একখানা প্রাসাদ-অনুপম অট্টালিকার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। তারপর বাড়ীর নম্বর ভাল করে মিলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে কড়া নাড়ে। দরোয়ান এসে দরজা খুলে দেয়।

—মঁসিয়ে র‍্যাফেল বাড়ী আছেন কি? পথিক শুধায়।

—হ্যাঁ বাড়ীতেই আছেন, কিন্তু মার্কুইস্ তো কারও সঙ্গে দেখা করেন না।

—ওঁর গাড়ী প্রস্তুত রয়েছে দেখছি, নিশ্চয়ই উনি এখন কোথাও বেরুবেন। আমি না হয় এইখানেই অপেক্ষা করি।

দরোয়ান রুক্ষস্বরে বলে—আরে মশাই, চব্বিশ ঘণ্টাই মার্কুইসের গাড়ীতে ঘোড়া জোতা থাকে। কিন্তু আপনি যদি সারাদিন এখানে বসে থাকেন তবুও তাঁর দেখা পাবেন না, কারণ তিনি কোথাও বেরোন না। তাই বলছি দয়া করে এখান থেকে সরে পড়ুন নইলে আমাকে চাকরিটি খোয়াতে হবে।

ঠিক এমন সময় খানসামার পোষাক পরা একজন বৃদ্ধ ভৃত্য এসে সেইখানে উপস্থিত হল। তাকে দেখেই দরোয়ান বলে উঠে—এই যে মিষ্টার যোনাথাস্ এসেছেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলুন।

মামার সম্পত্তি পাবার পরই র‍্যাফেল তার পৈতৃক আমলের পুরানো ভৃত্য বৃদ্ধ যোনাথাস্‌কে খুঁজে বার করে। শৈশবে র‍্যাফেল তার কোলে-পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছিল। বহুদিন পরে যোনাথাস্ নেহাত অপ্রত্যাশিতরূপে প্রভুপুত্রকে আবার ফিরে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে কেঁদে ফেলে। তারপর র‍্যাফেল যখন তাকে নিজের সর্দার খানসামা নিযুক্ত করলে তখন বৃদ্ধের খুশির আর সীমা রইল না। র‍্যাফেল এখন তারই মাধ্যমে বহির্জগতের সঙ্গে একান্ত প্রয়োজনীয় সম্বন্ধটুকু রক্ষা করে চলেছে। টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভারও যোনাথাসের উপর। তাকে র‍্যাফেলের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না।

যোনাথাস্ আগন্তুকের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাতেই সে আবেদনের ভঙ্গীতে বলে উঠে—আমি র‍্যাফেলের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—কথা বলতে চান মার্কুইসের সঙ্গে? যোনাথাস্ যেন ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেছে এমনি স্বরে বলে—আমি তাঁর ধর্ম্মপিতা তবুও তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য আমার কদাচিৎ হয়।

—আমিও তার ধর্মপিতা, আগন্তুক দৃঢ়স্বরে বলে—আপনার স্ত্রী হয়ত তাকে স্তনদানে মানুষ করেছেন কিন্তু আমি তাকে পান করায়েছি অসীম জ্ঞান-সমুদ্রের অনন্ত সুধা। সে আমার মানসপুত্র—আমার আধ্যাত্মিক সন্তান। তার তরুণ মনকে প্রস্ফুটিত করেছি আমি, আমারই সাহায্যে তার প্রতিভা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যদিও সে বর্ত্তমান যুগের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কিন্তু একদা সে আমার ছাত্র ছিল। আমি তার অধ্যাপক।

যোনাথাস্ সসম্ভ্রমে বলে—আপনিই তাহলে মঁসিয়ে পরিকোয়েট?

—হ্যাঁ।

হঠাৎ দুইটা রাঁধুনী ঝগড়া শুরু করে দিতেই বাড়ীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। যোনাথাস্ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ধমক দেয়—এই চুপ-চুপ!

—র‍্যাফেল কি অসুস্থ? অধ্যাপক জিগ্যেস করেন।

—আরে মশাই, তাঁর যে কি হয়েছে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তিন লক্ষ টাকা দিয়ে মার্কুইস্ এই বাড়ীখানা কিনেছেন, বুঝলেন মশাই নগদ তিন লক্ষ টাকা। এই বাড়ীর প্রত্যেকখানি ঘর একটা দেখবার মতো জিনিস বটে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একজন অতিথিকেও তিনি নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে আনেন নি। কেউ এলে তার সঙ্গে দেখাও করেন না। এক অদ্ভুত জীবন যাপন করছেন তিনি। শীত গ্রীষ্ম বার মাস রোজ সাতটার সময় ঘুম থেকে উঠে একই পোষাক পরেন। ইচ্ছা করলেই হাজার হাজার টাকা খরচ করতে পারেন কিন্তু কোন-কিছু চাইতে—এমন কি একটা নতুন পোষাক তৈরীর হুকুম দিতেও তাঁর মুখে গভীর বেদনার ছায়া পড়ে। প্রতিদিন একই খাবার খান, একই সোফায় বসেন। নতুন কিছু করতে হলেই তাঁর

বিরক্তির আর অন্ত থাকে না। আবহাওয়া ভাল থাকলে আমি হয়ত শুধাই—মার্কুইস্, বেড়াতে যাবেন কি? হ্যাঁ বা না বলেই তিনি জবাব শেষ করেন। বেশী কথা কইতে চান না, কদাচিৎ বাইরে বেড়াতে যান। সারাদিন বই পড়ে কাটান। ঠিক যেন একটি ছোট্ট ছেলে, বুঝলেন মশাই ঠিক যেন একটি ছোট্ট ছেলে। এক কথায় বলতে গেলে তিনি আমার সন্তান আর আমি তাঁর প্রভু—পিতা।

—এ যে ঠিক কাব্যের মতো শুনাচ্ছে, অধ্যাপক বলে উঠেন।

—ঠিক তাই, গতকাল একটা ফোটা ফুল দেখিয়ে তিনি আমায় বললেন,—যোনাথাস্ এইতো জীবন।

অধ্যাপক গম্ভীর স্বরে বলেন—যোনাথাস্, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে র‍্যাফেল নিশ্চয়ই কোন মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। তাই সে পার্থিব জীবনের অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে চায় না। অসামান্য প্রতিভাবান ব্যক্তিরা কোন বড় কাজে আত্মনিয়োগ করলে পৃথিবীর আর সব-কিছু ভুলে যায়। একদা পণ্ডিতপ্রবর নিউটন—

যোনাথাস্ বাধা দিয়ে বলে—নিউটন, কিন্তু তার সঙ্গে তো আমার আলাপ নেই!

—নিউটন একজন প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ছিলেন। একদিন তিনি টেবিলের উপর মাথা রেখে চিন্তা করতে করতে একাদিক্রমে একুশ ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। পরদিন যখন বাইরে এলেন তখনও তিনি বুঝতে পারেন নি যে ইতিমধ্যে পুরা একটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। র‍্যাফেলও বোধ হয় কোন বড় কাজ হাতে নিয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত প্রয়োজন।

—থামুন মশাই থামুন, আপনি হয়ত স্বয়ং ফরাসী সম্রাট্ হতে পারেন কিন্তু আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ এই ফটক পেরিয়ে ভিতরে যেতে পারবেন না। তার চেয়ে আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি তাঁকে গিয়ে বলি—মার্কুইস্, মঁসিয়ে পরিকোরেট উপরে আসতে চান, তাঁকে নিয়ে আসব কি? উত্তরে তিনি হ্যাঁ অথবা না একটা-কিছু বলবেন। তিনি আমাকে বারবার নিষেধ করে দিয়েছেন যে তাঁকে যেন কখনও এমন প্রশ্ন না করি যার উত্তর দিতে হলে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয়। একদিন ভয়ানক বিরক্ত হয়ে তাঁকে বলেছিলাম—আপনি কি আমায় মেরে ফেলতে চান? তাইতেই তিনি রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন।

অধ্যাপককে ফটক ছেড়ে আর একপা'ও অগ্রসর হতে বারবার নিষেধ করে যোনাথাস্ বাড়ীর ভিতরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলে—আপনি আসুন স্যার। পরিকোরেট যোনাথাসের পিছু পিছু বাড়ীর ভিতরে এসে দেখলেন, আগুনের পাশে একখানা সোফায় বসে র‍্যাফেল খবরের কাগজ পড়ছে। তার আনত দেহে ফুটে উঠেছে তীব্র মানসিক যন্ত্রণার চিহ্ন। মুখখানা বাসি ফুলের মতো শুকিয়ে গেছে। মাথার ঘন কোঁকড়া চুলগুলি উঠে উঠে পাতলা হয়ে এসেছে। হাঁটুর 'পরে তৃণমণির তৈরী আলবলার নলটা সাপের মতো জড়িয়ে পড়ে আছে। কিন্তু বিস্ময়কর তার দুটি চোখের ঔজ্জ্বল্য। শরীরের সমস্ত শীর্ণতাকে সবলে অস্বীকার করে দৃপ্ত তেজে জ্বলছে যেন। অনবরতই সে যেন চাইছে উদ্গত কামনাকে সবলে অন্তরের অন্তস্তলে ঠেলে দিতে। ভোগের সমস্ত উপকরণই হাতের কাছে তৈরী রয়েছে তবু সে ভোগ করতে পারছে না। বন্দী প্রমেথিয়াসের মতো অসহায় দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাইছে। বন্দী

প্রমেথিয়াসের মতোই তার মৃত্যুভীত দেহ নিরুদ্ধ কামনার সহস্র শকুনে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে যেন।

র‍্যাফেলের এই নিঃসঙ্গ নির্জনবাসের ইতিহাস আছে একটু। উত্তরাধিকারসূত্রে মৃত মাতুলের অগাধ সম্পত্তির মালিক হবার দিন দুই পরে সে একদিন নোটারির আপিসে গিয়েছিল। সেইখানে তার সঙ্গে একজন ডাক্তারের দেখা হয়। ডাক্তারবাবু কথায় কথায় তাকে এক সুইচ ভদ্রলোকের গল্প বলেন। সেই ভদ্রলোকের নাকি ক্ষয়রোগ হয়েছিল এবং ছয় বছর ধরে নির্জনবাস ও সংযত আহারবিহারের ফলে তার ঐ দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণ আরাম হয়ে যায়। এই গল্প শোনবার পর থেকেই র‍্যাফেল এই নির্জন জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেছে। তাকে দেখে পরিকোয়েট চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হলো এ যেন সেই র‍্যাফেল নয়—তার কঙ্কালটিকে কে এনে অধ্যাপকের সম্মুখে বসিয়ে দিয়েছে। র‍্যাফেল অধ্যাপকের ঠাণ্ডা হাতখানা চেপে ধরে বলে—সুপ্রভাত মঁসিয়ে পরিকোয়েট, কেমন আছেন?

—ভালই, তুমি কেমন আছ?

—ভাল, ধন্যবাদ।

—বর্ত্তমানে তুমি বোধ হয় কোন বই লিখছ?

—না, শূন্যে সৌধনির্ম্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলাম মঁসিয়ে পরিকোয়েট, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। আমার পাণ্ডুলিপিগুলো যে কোথায় আছে সে খোঁজ পর্য্যন্ত রাখি না।

—আশা করি তুমি নিজস্ব ভঙ্গীতে লিখেছ, আধুনিক লেখকদের মতো রোঁসার্ডের স্টাইল নকল করনি!

—আমি বইখানা লিখেছিলাম শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে।

—যে কোন বিষয়ই হোক না কেন, স্টাইলই হচ্ছে রচনার প্রাণ!

ম্যাসিলন, বাকুন অথবা র‍্যাকিনের ভাষায় যতটা প্রাঞ্জল ভাষায় যা-কিছু লেখ না কেন তা একেবারে খারাপ হবে না।

বক্তৃতায় অভ্যস্ত অধ্যাপক ভাষা ও বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে অনর্গল বক্তৃতা করতে থাকেন। তাঁর বক্তৃতার তোড়ে র‍্যাফেল বিরক্ত হয়ে উঠে। এই বাক্যবাগীশটার সঙ্গে দেখা করেছে বলে সে মনে মনে অনুতপ্ত হয়। ইচ্ছা হয় ওকে ঘর থেকে বার করে দেয়। আবার ইচ্ছা? শঙ্কিত দৃষ্টিতে র‍্যাফেল চামড়াখানার দিকে চাইল। একখানা সাদা চাদর বিছিয়ে তার উপরে চামড়াখানা রেখে চারদিকে বেশ স্পষ্ট করে একটা লাল দাগ দিয়ে রেখেছে সে। পাছে চামড়াখানা সঙ্কুচিত হয়ে যায় এই ভয়ে সে কিছুই কামনা করে না—অন্তরের প্রতিটি ইচ্ছাকে সবলে দমিয়ে রাখে। এ যেন বন্য ব্যাঘ্র নিয়ে ঘর করছে সে—সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে বাঘটা জেগে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে।

মঁসিয়ে পরিকোয়েট পুরা একটি ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করে যান। জুলাই বিপ্লবের পরে কি করে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হলেন তাই বুঝাতে গিয়ে কঠোর শাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অজস্র যুক্তি দেখান। জনগণের নির্ব্বাচিত মন্ত্রিসভা তাঁকে কার্ল্‌ইজমে বিশ্বাসী বলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে। ফলে আজ তিনি রিক্তহস্ত এবং বেকার। অবশ্য নিজের জন্যে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন না। কিন্তু তাঁর ঘাড়ের উপরে তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষাদীক্ষার ভার পড়েছে বলেই র‍্যাফেলের কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছেন। সে যদি মন্ত্রি-সভাকে একবার অনুরোধ করে তাহলে তিনি তাঁর পুরানো চাকরি ফিরে না পেলেও যে কোন একটা মফস্বল কলেজে চাকরি পেয়ে যাবেন। অধ্যাপক যতক্ষণ কথা বলছিলেন, ততক্ষণ র‍্যাফেল নেহাত

ভদ্রতার খাতিরেই তাঁর বার্দ্ধক্য-শিথিল দুটি সাদা চোখের পানে তাকিয়ে থাকে। অধ্যাপকের কথা শেষ হয়ে যাবার পর সে অসীম বিরক্তির স্বরে বলে—ম'সিয়ে পরিকোয়েট, আপনার জন্যে আমি কিছুই করতে পারব না। আমার একান্ত ইচ্ছা যে—

কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে র‍্যাফেল ভীতচকিত দৃষ্টিতে চামড়াখানার দিকে চায়। তার মনে হয় চামড়াখানার এক প্রান্ত চাদরের উপরের লাল দাগ থেকে একটুখানি সরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠে ভীতা হরিণীর সচকিততা। অধ্যাপককে স্তম্ভিত করে দিয়ে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে সে—বুড়ো জানোয়ার কোথাকার, এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, আমাকে দিয়ে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করাবার চেষ্টা না করে তুমি যদি হাজার ফ্রাঙ্কও চাইতে তাহলে তাই তোমায় দিয়ে দিতাম। দেশে চাকরির কোন অভাব নেই, অভাব হচ্ছে জীবনের—যোনাথাস্!

যোনাথাস্ এসে দাঁড়ায়।

র‍্যাফেল পূর্ব্বের মতোই তিক্তস্বরে বলে—মূর্খ, এমনি করে তুমি আমার সেবা করছ? কেন তুমি ওঁকে এখানে নিয়ে এলে? অযথা নষ্ট করবার জন্যেই আমার জীবনটা তোমার হাতে তুলে দিয়েছি নাকি? নাঃ তুমি আমায় মেরে ফেলবে দেখছি। জীবনের বিনিময়ে যদি পরের উপকার করতে হয় তাহলে সুন্দরী ফিয়োডোরাই বা কি দোষ করেছিল? দুনিয়ায় যত পরিকোয়েট আছে তারা সবাই যদি না খেয়ে মরে তাতে আমার কি?

ক্রোধে র‍্যাফেলের ঠোঁট দুইখানি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। তার সম্মুখের বৃদ্ধ দুইজন ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়। উত্তেজনায় র‍্যাফেল একখানা চেয়ারের পরে গা এলিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে সে অশ্রুসিক্ত

চোখ তুলে ভয়ঙ্করে বলে উঠে—হায়রে জীবন! কত প্রেম কত আশা ছিল মনে কিন্তু সব-কিছুই শেষ হয়ে যাবে মৃত্যুতে। তারপর অধ্যাপকের দিকে ফিরে বলে—মঁসিয়ে পরি্গোয়েট, যে ক্ষতি আমার আজ হলো তা পূরণের কোন সম্ভাবনা নাই। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে আর তাইজন্তে আমাকে হারাতে হবে দশ বছরের পরমায়ু।

র‍্যাফেলের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের এই কাতরোক্তি অধ্যাপকের মর্ম স্পর্শ করে। তাঁর শীর্ণ চোখ দুইটি অশ্রুতে ছাপিয়ে আসে। তিনি আপন মনে বলে উঠেন—ছেলেটা স্নায়বিক রোগে ভুগছে বোধ হয়।

র‍্যাফেল অধ্যাপকের উদ্দেশে আবার বলে—মঁসিয়ে, আমি জানি আপনি একজন উদারহৃদয় ব্যক্তি, আশা করি আমার অভদ্রতা ক্ষমা করবেন। দয়া করে আপনি এখন যান। খুব সম্ভব কাল আপনার চাকরির নিয়োগপত্র পাবেন। আচ্ছা বিদায়।

স্তম্ভিত বিস্মিত অধ্যাপক ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। র‍্যাফেল সহসা যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে এমনি স্বরে বলে—শোন যোনাথাস্, তোমাকে যে দায়িত্বভার দিয়েছি তার গুরুত্ব ভাল করে বোঝা দরকার।

—হ্যাঁ, মার্কুইস্।

—আমি হচ্ছি সাধারণ নিয়মের মূর্তিমান ব্যতিক্রম। বুঝেছ?

—হ্যাঁ, মার্কুইস্।

—এই পৃথিবীর সমস্ত সুখ-সম্ভোগ আমার চোখের সামনে সুন্দরী নর্তকীর মতো নেচে যাবে শুধু। যদি ভোগ করতে চাই—পাব মৃত্যু। হ্যাঁ, পার্থিব সম্ভোগের মধ্যে আমার মরণ লুকিয়ে আছে। তাই আমার আর পৃথিবীর মাঝখানে বাধার প্রাচীর নির্মাণ করে দাঁড়াতে হবে তোমাকে। বুঝেছ?

—হ্যাঁ মার্ক্ ইস্, যোনাথান্ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে—আপনি যদি নাচ-ঘরের সুন্দরী নর্তকীদের দেখতে না চান তাহলে একবার থিয়েটার থেকে ঘুরে আসুন। হয়ত আনন্দ পাবেন।

ততক্ষণে র‍্যাফেল আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। সে যোনাথানের কথার উত্তরে হ্যাঁ বা না কিছুই বলে না।

সন্ধ্যার দিকে র‍্যাফেল থিয়েটার দেখতেই বেরিয়ে পড়ে। তার দামী গাড়ীখানি প্যারীর শকট-সঙ্কুল রাজপথেও যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। গাড়ীর সাটিনে মোড়া গদির পানে চেয়ে পথচারিণীদের চোখে ফুটে উঠে বিস্ময়ের রেখা। ফেভার্ট থিয়েটারের কাছে এসে র‍্যাফেল সুদৃশ্য উর্দি পরা দুইজন সইসের কাঁধে ভর দিয়ে গাড়ী থেকে নামে। তাকে দেখবার জন্তে ইতিমধ্যেই ছোটখাট একটা ভীড় জমে উঠেছিল। ভীড়ের মধ্যে একটি গরীব ছাত্র দাঁড়িয়ে ছিল। সে একান্ত ইচ্ছা সত্বেও পয়সার অভাবে থিয়েটার দেখতে যেতে পারে নাই। র‍্যাফেলকে দেখে সেটি ঈর্ষাতিক্ত কণ্ঠে বলে—ধনী হয়েই বা লাভ কি?

র‍্যাফেল ধীরে ধীরে হলে গিয়ে ঢোকে। একদা যেখানে বসতে পেলে সে নিজেকে ধন্য মনে করত আজ সেইখানে বসেও কিন্তু তার কিছুই যেন ভাল লাগে না। নাটকের প্রথম অঙ্কটা শেষ হতেই বিরক্তিতে সে উঠে লবীতে চলে যায়। বিভিন্ন বয়সের বহু স্ত্রী-পুরুষ সেইখানেও ভীড় করে বসে ছিল। মাত্র হাত কয়েক দূরে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধকে দেখে সে চমকে উঠে। অদ্ভুত—অস্বাভাবিক তার চেহারা। দেখলে মনে হয় কে যেন এক যুবকের বলিষ্ঠ দেহে একটা বুড়োর মুখোস পরিয়ে দিয়েছে। তার বলি-কলঙ্কিত মুখ আর বার্দ্ধক্য-শিথিল চোখের পানে চেয়ে র‍্যাফেলের লোকটাকে

যেন চেনা চেনা মনে হয়। বৃদ্ধের স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহখানি দামী পোষাকে সুসজ্জিত। এই পড়ন্ত বয়সেও ওর বাবুগিরির বহর দেখে সে বিস্মিত হয়ে যায়। কোথায়—কোন্ অসাধারণ পারি-পার্শ্বিকের মধ্যে ওকে দেখেছিল সেই কথা ভাবতে ভাবতে তার হঠাৎ মনে পড়ে সেই পুরানো জিনিসের দোকানখানার কথা। মাত্র কয়েক বছর আগে এই বুড়োই তাকে যাদুমন্ত্রপূত চামড়াখানা দিয়ে একসঙ্গে তার চরম দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের সূচনা করেছিল। সহসা বৃদ্ধটি কি একটা কথা বলে হেসে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাফেলের মনে পড়ে গ্যেটের কল্পিত মেফিস্টোফেলেজের পৈশাচিক হাসি। তার অন্তরে মধ্যযুগের কুসংস্কারগুলি মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠে। ফাউস্টের পরবর্ত্তী জীবনের কথা ভেবে শঙ্কায় সে স্মরণ করে কুমারী মেরীকে।

এমন সময় মুক্তাখচিত একটা উজ্জ্বল পোষাক পরে ইক্লোসিয়া এসে বৃদ্ধের পাশে বসে। তার দৃপ্ত চোখের দৃষ্টি নীরব ভাষায় সকলকে যেন বলছে—চেয়ে দেখ, কত বড় একটা ধনীর সর্ব্বস্ব শোষণ করবার সুযোগ পেয়েছি আমি। বৃদ্ধটি ইক্লোসিয়ার কুসুমপেলব বাহু জড়িয়ে ধরে নবীর একধারে ঘুরতে থাকে। ভ্রষ্টা রমণী টাকার লোভে এই লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের কানে কানেও প্রেমের কথা কয়।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একটি সুশ্রী যুবক ওদের লক্ষ্য করে ব্যঙ্গের স্বরে বলে—এই ঘাটের মড়াটাকে কোথা থেকে তুলে নিয়ে এলে সুন্দরী ?

তার কথার ভঙ্গীতে অন্য সবাই হেসে উঠে।

র‍্যাফেল ভাবে—হায় ! প্রবৃত্তির তাড়নায় কত জ্ঞানী বৃদ্ধও পাপের পথে নেমে আসে। এই বুড়োটা কবরের তলায় পা বাড়িয়েও প্রেম

করতে এসেছে। তারপর সে বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে তীব্রস্বরে বলে—মশাই, আপনার জীবনের সমস্ত আদর্শগুলি সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন নাকি?

বৃদ্ধ ভগ্নস্বরে উত্তর দেয়—বন্ধু, আমি এখন যে কোন যুবকের মতোই সুখী। রূপ-রস-গন্ধভরা এই জীবন এতদিন আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এতদিন জানতাম না যে প্রেমবিহ্বল জীবনের সামান্য কয়েকটা মুহূর্তের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায় চিরঈপ্সিত ধন।

এই সময় থিয়েটারের দ্বিতীয় অঙ্কের ঘন্টা বাজে। দর্শকেরা লবী ছেড়ে আবার হলের ভিতরে যায়।

র‍্যাফেল বক্সে ঢুকেই দেখতে পেল তার ঠিক বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফিয়োডোরা। তার সঙ্গে রয়েছে একটি সুশ্রী যুবক—বোধ হয় ওর নবতম শিকার। ফিয়োডোরা তার সহজাত লীলায়িত ভঙ্গীতে স্কার্ফখানা খুলে যুবকটির হাতে দেয়। হঠাৎ দর্শকদের সব কয়-জোড়া চোখের দৃষ্টি এসে ওদের উপর পড়ে। হত-ভাগ্য যুবকটির ভবিষ্যৎ ভেবে র‍্যাফেলের দুঃখ হয়। ফিয়োডোরার সর্পিল আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে ঐ যুবকটিও বোধ হয় তারই মতো অনবরত সংগ্রাম করছে ঐ মোহিনীর ঔদাসীন্যের প্রাচীর ভাঙ্গতে। কিন্তু সেও র‍্যাফেলের মতোই ব্যর্থ হবে, আর সারাজীবন ধরে নীরবে সয়ে যাবে ব্যর্থপ্রেমের অপরিসীম বেদনা।

ফিয়োডোরা আসনে বসেই চকিতে একবার হলের অন্যান্য মেয়েদের দিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। ফ্যাসনের আধুনিকতায় কিংবা প্রসাধন-নৈপুণ্যে অন্য কেউ তাকে হারাতে পারে নাই দেখে তার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। লুব্ধ পুরুষদের তার সুন্দর দাঁত কয়টি দেখাবার জন্যেই সম্পূর্ণ অকারণে একবার হেসে উঠে। তারপর চারদিকে তাকিয়ে পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টির নীরব প্রশংসা কুড়ায়

হঠাৎ র‍্যাফেলের স্থির দৃষ্টির উপর চোখ পড়তেই ফিয়োভোরার মুখের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য নিমেষে নিঃশেষে মুছে যায়। যাকে সে চরম অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করে ভেবেছিল যে ও নিশ্চয়ই হতাশায় আত্মহত্যা করে তার গৌরব আর একটু বাড়াবে, সেই র‍্যাফেল এখনও জীবিত রয়েছে, আর শুধু জীবিত নয় অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে তারই সুমুখে এসে বসেছে। এখন সে একজন মার্কুইস্। এই মুহূর্তে তার মুখ থেকে একটা প্রশংসার বাণী নির্গত হলে আগামী কালই প্যারীর অভিজাতদের প্রতিটি মজলিসে তার প্রতিধ্বনি উঠবে। ঈর্ষা আর পরাজয়ের বেদনায় ব্যভিচারিণীর সারা দেহ জ্বলতে থাকে। প্যারীর এই শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ের সেরা আসনে বসেও তার মনে হয় সে যেন বাস্তিলের রুদ্ধ কক্ষে বসে আছে। তবুও উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে সে-ই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী এই ধারণা তাকে খানিকটা সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার সেই সর্বশেষ গর্বেও চরম আঘাত লাগে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের যবনিকা উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সহসা সেই বিরাট জনসমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠে। র‍্যাফেলের পাশের আসনখানি এতক্ষণ খালি পড়ে ছিল। সেইখানে একটি তরুণী দর্শকের আবির্ভাবই জনতাকে চঞ্চল করে তুলেছে। মুগ্ধ পুরুষদের সমবেত দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে নবাগতার উপর। তার রূপের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে সবাই। দর্শকদের এই আকস্মিক চাঞ্চল্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে মঞ্চের উপর থেকে অভিনেতারাও তরুণীর পানে চায়। সঙ্গে সঙ্গে তারাও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নীরব ভাষায় তার রূপের প্রশংসা করে। দর্শকদের প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি ক্রমে ক্রমে থেমে আসে। নিজেদের এই অসঙ্গত উচ্ছ্বাসে লজ্জিত হয়ে তারা

সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায়। কোন-কিছুতেই হর্ষ বা বিস্ময় প্রকাশ করাটা হচ্ছে অভিজাত সমাজের রীতিবিরুদ্ধ। মনের প্রকৃত ভাব গোপন রেখে সব-কিছুতেই ত্রুটি ধরা হচ্ছে আভিজাত্যের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং তরুণীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশ্রী দেখে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল বলে অভিজাত দর্শকেরা মনে মনে লজ্জিত হয়। তারা মনের ভাব যথাসাধ্য চেপে রেখে আবার মঞ্চের দিকে নজর দেয়। অভিনেতারাও অভিনয় শুরু করে।

র‍্যাফেল এতক্ষণ ধরে অবাক্ বিস্ময়ে দর্শকদের এই চাঞ্চল্য দেখছিল। প্রত্যেকটি মেয়ে এবং পুরুষ বারবার চোখের ইঙ্গিতে তাকে যেন বলছিল—তোমার পাশের ঐ সুন্দরীর দিকে একবারটি চেয়ে দেখ। কিন্তু সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে। জীবনে আর কোনদিন কোন মেয়ের সংস্পর্শে এসে জীবনীশক্তির অপব্যবহার করবে না, এই হচ্ছে তার পণ। সুতরাং কারও কোন ইঙ্গিতই তাকে চঞ্চল করতে পারলে না। অনূঢ়া কিশোরীর মতো আনত দৃষ্টিতে চুপ করে বসে রইল সে। র‍্যাফেলের পার্শ্ববর্ত্তিনী সেই সুন্দরী মেয়েটিও ঠিক ঐ একই ভঙ্গীতে সুমুখের রেলিংয়ে কনুই ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে বসে। ওদের দেখলে মনে হয় যেন দুটি প্রেমিক প্রেমিকা—অভিমান-ভরে পরস্পরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। কিন্তু দুজনের মধ্যের একজন একটু আদর করে ডাকলেই অপরটি এক্ষুণি তাকে চুম্বনে-আশ্লেষে-আলিঙ্গনে অস্থির করে তুলবে। মেয়েটির হাতের পাখাখানি বারবার র‍্যাফেলের গায়ে লেগে যায়। তার দেহের সৌরভ, নরম পোষাকের খস্ খস্ শব্দ, হাওয়ায় উড়ে আসা চূর্ণ অলকের মৃদু স্পর্শ—সব-কিছু মিলে র‍্যাফেলের মনে মোহের সঞ্চার করে। প্রচণ্ড মানসিক শক্তিতে সে একটা উদ্গত দুর্দ্দম কামনাকে

দমন করে। হঠাৎ একটা অতিপরিচিত এসেন্সের গন্ধ নাকে যেতেই সে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে ফিরে তাকায়। মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই র‍্যাফেল বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠে—পলিন!

—র‍্যাফেল!

স্তব্ধবিস্ময়ে তারা কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। পলিনের পোষাক-পরিচ্ছদে স্পষ্ট সুরুচির ছাপ দেখতে পায় র‍্যাফেল। তার তনুদেহখানি পূর্ণ যৌবনপ্রবাহে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। গায়ের রংয়ে গোলাপ-পাপড়ির মসৃণতা। স্বপ্নবিলসিত দুটি চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে কুমারীর বিনয় ও সারল্য।

স্তব্ধতা ভেঙে পলিনই প্রথম কথা কয়—কাল দুপুরের দিকে একবার সেইন্ট কুইন্টাইন হোটেলে গিয়ে তোমার পাণ্ডুলিপিগুলি নিয়ে এস। যেও কিন্তু, আমি প্রতীক্ষায় থাকব। বলে একটা অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে পলিন হল থেকে বেরিয়ে গেল।

র‍্যাফেলের ভয়ানক ইচ্ছা হচ্ছিল সে তাকে অনুসরণ করে। কিন্তু পাছে পলিন বিরক্ত হয় এই ভয়ে থেমে যায়। কিন্তু পলিন চলে যাবার পর কিছুই আর যেন তার ভাল লাগে না। অদূরে উপবিষ্টা সুন্দরী ফিয়োডোরাকে পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর কুৎসিত মনে হয়। অভিনয়ের এক বর্ণও সে বুঝতে পারে না, গানের একটি কলিও তার কানে যায় না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে র‍্যাফেল থিয়েটার ছেড়ে বাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সে যোনাথাস্‌কে হুকুম দেয়—কাল পৌনে বারোটার সময় আমায় ঘুম থেকে জাগিয়ে দিও।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে র‍্যাফেল চামড়াখানার কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর-

স্বরে বলে—আমি চাই যে পলিন আমায় ভালবাসুক। তারপর সে একদৃষ্টে চামড়াটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু তার এই আকুল প্রার্থনায়ও জড় চামড়াটার বুকে কোন স্পন্দনই জাগে না, কিংবা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় না সেটা। র‍্যাফেলের কাঁধ থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে যায়। সে পরম তৃপ্তির স্বরে বলে—ওঃ আমার ইচ্ছা তুমি পূর্ণ করবে না? বেশ, আমাদের চুক্তিরও তাহলে এইখানেই শেষ হল। আজ থেকে আমি মুক্ত—জীবন্ত।

তারপর কাপড়জামা পরে সে পলিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বেরিয়ে পড়ে। সেইণ্ট কুইণ্টাইন হোটেলের দিকে যতই এগিয়ে যায় পলিনের চিন্তা তাকে যেন ততই পেয়ে বসে। এই পলিন অবশ্য হোটেলওয়ালী ম্যাডাম গাউডিনের কন্যা সেই কিশোরী পলিন নয়, এ হচ্ছে কালকের থিয়েটার-হলে দেখা যুবতী পলিন। তার সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের চিহ্ন, তার চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি, তার চালচলনে লীলাচাপল্য। র‍্যাফেল এসে সেইণ্ট কুইণ্টাইন হোটেলের ভাঙা সিঁড়ির উপর দাঁড়াতেই এক অপরিচিতা বৃদ্ধা এগিয়ে এসে বলে—আপনার নাম কি মঁসিয়ে র‍্যাফেল ও ভেলেণ্টাইন?

র‍্যাফেল উৎকণ্ঠিত স্বরে জবাব দেয়—হ্যাঁ।

—আপনি যে ঘরে থাকতেন সেই ঘর খোলা আছে। ইচ্ছা করলে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারেন।

—ম্যাডাম গাউডিন কি এই বাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম গাউডিন এখন একজন ব্যারনেস্। তিনি নদী-পারে একখানা সুন্দর বাড়ীতে থাকেন। তাঁর স্বামী অনেক টাকাকড়ি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি এখন এই পাড়াটা সুদ্ধ কিনে ফেলতে পারেন। কিন্তু এমন চমৎকার স্বভাব তাঁর,

অগাধ পয়সার মালিক হয়েছেন তবু মনে এতটুকু গর্ব্ব নেই। যাবার সময় এই বাড়ীখানা আমায় দিয়ে গেছেন।

হঠাৎ চিলেকোঠায় পিয়ানো বেজে উঠতেই র‍্যাকেল প্রায় ছুটে সিঁড়িবেয়ে উপরে উঠে যায়। পলিন তারই অপেক্ষায় বসে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। র‍্যাকেলকে দেখতে পেয়ে সে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলে—এই যে তুমি এসেছ!

র‍্যাকেল নিঃশব্দে তার পাশে বসে পড়ে। তারপর সপ্রেম দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চায়।

পলিন মৃদু অথচ স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলে—কেন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে? এতদিন কি করছিলে?

—কি করছিলাম! পলিন, আমি বড় দুঃখী।

আবেগে র‍্যাকেলের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

পলিন সান্ত্বনার স্বরে বলে—কাল তোমাকে দেখেই সে আমি বুঝেছি। তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ চাল-চলন দেখে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি বেশ সচ্ছল অবস্থায় আছ তবু মনে হচ্ছিল কি যেন একটা না পাওয়ার ব্যথায় মনে সুখ নেই তোমার, বলতে বলতে পলিনের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে এল।

—পলিন—আমি—

—তুমি আমায় ভালবাস? ভালবাস তুমি আমায়? বলে পলিন র‍্যাকেলের হাত ধরে আবেগাপ্লুতকণ্ঠে বলে যায়—র‍্যাকেল, আমি এখন যথেষ্ট ধনী হয়েছি। কতদিন মনে মনে বলেছি র‍্যাকেল যদি একবার এসে শুধু আমায় বলত—পলিন, তোমায় আমি ভালবাসি। তাহলে শুধু এই দুটি কথার বিনিময়ে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিতাম। তুমি অর্থ চাও? আজ অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক আমি।

সুখ চাও ? আমার মনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, দেখবে সেখানেও সবটুকু স্থান জুড়ে বসে আছ তুমি। বাবা ফিরে এসেছেন—আর আমিই হচ্ছি তাঁর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। আমি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। পলিন থামে। আনন্দে বিহ্বল র‍্যাফেল তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে অজস্র চুম্বনে তার দুটি রক্তিম অধর প্লাবিত করে দেয়। পলিনও তার কুসুমপেলব বাহুলতায় র‍্যাফেলের কণ্ঠ বেষ্টন করে জীবনে এই প্রথম প্রিয়তমের শুষ্ক অধরে চুম্বন-চিহ্ন অঙ্কিত করে। পলিন শ্রান্তিতে একটু যেন এলিয়ে পড়েছে এমনিভাবে চেয়ারে বসতে বসতে বলে—র‍্যাফেল, তুমি এক্ষুণি চলে যেও না। তুমি কাছে না থাকলে আমি যেন কথা বলবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলি।

এতদিন পরে র‍্যাফেলের স্নায়ু-শিরায় আবার বুঝি জীবনের সাড়া জাগে। সে দীপ্তস্বরে বলে—ভয় কি পলিন, আমাদের এই প্রেম অখণ্ড—অবিনশ্বর।

—বল—বল—বল, তুমি কথা বল র‍্যাফেল, অনেকদিন তোমার কথা শুনিনি।

—সত্যি তুমি আমায় ভালবাস ?

—তোমায় ভালবাসি কিনা তাই জিগ্যেস করছ ? কতদিন তোমার এই শূন্য ঘরে বসে চোখের জলের ভিতর দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি—হে ঈশ্বর, আমাকে তার দুঃখের অংশভাগিনী কর, তোমার দুঃখের ভাগ নিতে আমি আপনাকে শয়তানের কাছে বিক্রী করতেও প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আজ আমার সকল আশা মিটেছে। আজ আমি তোমার দেহমনের উপর অধিকার পেয়েছি। যতদিন গরীব ছিলাম তোমাকে

ভালবাসার কথা বলতে সাহস পাইনি। কিন্তু আজ আমি লক্ষপতির কন্যা তাই সাহস করে বলতে পারি তোমার জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি আমি।

—পলিন, আমি নিজেও আজ একজন মার্কুইস্। কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে যে সম্পদ আমায় দিলে তার বিনিময়ে তোমায় কি যে দেব ভেবে পাচ্ছি না। এ জীবন তোমারই কাছে বিক্রীত রইল।

—র‍্যাফেল—প্রিয়তম, মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে আজ বুঝি আমার মতো সুখী আর কেউ নেই।

—আমাদের কথা কেউ শুনছে নাতো ?

—না, এখন উপরে কেউ আসবে না। বলে পলিন একটা সপ্রেম কটাক্ষ হানে।

—তাহলে আর একটু কাছে এস। বলে র‍্যাফেল পলিনকে সাদরে ধরে কোলের উপর বসায়।

পলিন আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে—র‍্যাফেল, আমায় চুম্বন কর। তোমার জন্যে কত দুঃখ সয়েছি—কত রাত জেগে পর্দ্দা সেলাই করেছি—

—পর্দ্দা সেলাই করেছ ? আমার জন্যে ?

—তুমি এখন বড়লোক হয়েছ সুতরাং তোমাকে বলতে আর বাধা নেই। আমি দেখেছি পণ্ডিত লোকদের ঠকান ভারী সোজা। তুমি খরচা বাবদ রোজ দিতে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক কিন্তু তাতে তোমার খাবার, দুধের দাম, ধোপা-খরচ, তেলের খরচ সব কুলিয়ে যেত কি ?

—বোধ হয় না।

—তাই আমি রাত দুপুর পর্য্যন্ত জেগে পর্দ্দা সেলাই করতাম।

আর সেইগুলো বিক্রী করে যে টাকা আসত তার অর্দ্ধেক মাকে দিতাম বাকী অর্দ্ধেক দিয়ে তোমার গয়নার দেনা শোধ করতে হত।

প্রেমের নেশায় মাতাল দুটি তরুণ-তরুণী পরস্পরের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে পলিন অপরিসীম সোহাগে র‍্যাস্কেলের গলা জড়িয়ে ধরে বলে—ভয় হচ্ছে এই খুশির আবেগে হয়ত আমি পাগল হয়ে যাব। কিন্তু তোমার সেই ফিয়োডোরা একটা জানোয়ার-বিশেষ। কাল থিয়েটার-হলে সবাই যখন আমার প্রশংসা করছিল, ওর পানে তাকিয়ে দেখলাম ঈর্ষায় ওর মুখখানা থম্ থম্ করছে। আর এমনভাবে আমার দিকে চাইছিল যেন সুযোগ পেলে চিবিয়ে খায় আর কি!

—পলিন, ইচ্ছা হচ্ছে চিৎকার করে কাঁদি কিন্তু পারছি না। তোমার হাত দু'খানি সরিয়ে নিও না। মনে হয় অনাদি অনন্তকাল ধরে যদি এমনি করে তোমার মুখের পানে তাকিয়ে থাকতে পারতাম তবে হয়ত প্রকৃত সুখী হতাম। তুচ্ছ ভাষায় আমার মনের ভাব বুঝাতে পারছি না, শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি এক অলৌকিক অনুভূতি। আজ আমার অতীত জীবনকে একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। তোমার মুখের হাসি, চোখের দৃষ্টি আবার উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে আমায়। এখন থেকে এক নতুন জীবন শুরু করব আমি।

প্রেমের নিবিড়তায় এই দুইটি মুগ্ধ আত্মা কিছুক্ষণের জন্য আবার ভাষা হারিয়ে ফেলে। তারপর পলিন এক সময় আর যেন কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলে উঠে—তোমার পাণ্ডুলিপির কথা একদম ভুলে গেছ দেখছি।

—যেতে দাও, কিছুই হয়নি ওটা। বৈজ্ঞানিক রচনার নামে বিজ্ঞানকে শুধু ব্যঙ্গই করেছি।

—কিন্তু তোমার যে বিখ্যাত হবার বড় সাধ ছিল র‍্যাফেল ?

—তুমিই আমার মূর্তিমতী খ্যাতি। একটু থেমে র‍্যাফেল আবার বলে—তোমাদের নতুন বাড়ীর ঠিকানাটা তো বললে না ?

—সেইন্ট লেজার রোড। তোমার ঠিকানা ?

—ভেরেনি রোড।

—কিন্তু সে যে আমাদের নতুন বাড়ী থেকে অনেকটা দূর। বলে পলিন অপূর্ব্ব লীলায়িত ভঙ্গীতে একটা কটাক্ষ হানে।

—কিন্তু আমরা মাত্র আর পোনের দিন পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকব।

—তারপরই কি আমাদের বিয়ে হবে না কি ? কথাটা বলেই পলিন লজ্জায় লাল হয়ে উঠে। উত্তরে র‍্যাফেল তার রক্তিম অধরে আর একবার সপ্রেম চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দেয়। তারপর দুইজনে হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে।

পলিন তার গাড়ীতে উঠে বলে—তুমিও এস। আমি তোমার নতুন বাসা একবার দেখতে চাই। তোমার পড়ার ঘরে টেবিলের পাশে বসে পুরানো দিনের মতো গল্প করতে প্রায়ই সাধ যায় আমার। তারপর সে কোচম্যানকে হুকুম দেয়—যোসেপ, ভেরেনি রোডে চল।

কিছুক্ষণ পরেই তারা এসে র‍্যাফেলের বাসায় উপস্থিত হয়। ঘরবাড়ী দেখে পলিন খুশি হয়ে বলে—চমৎকার! এই বুঝি তোমার শোবার ঘর? বলে সে র‍্যাফেলের শয়নকক্ষের দরজার সিল্কের পর্দ্দাটা হাত দিয়ে সরাতে সরাতে বলে—বাড়ীতে ফিরে গিয়েও কিন্তু আজ স্বপ্নে দেখব যেন এই ঘরেই ঘুমিয়ে আছি। আচ্ছা সত্যি করে বলতো বাড়ী সাজাবার সময় তোমায় অন্য কেউ পরামর্শ দিয়েছিল কিনা ?

—কেউ না।

—সত্যি? আর কোন মেয়ে—

—পলিন! র‍্যাফেলের কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে।

—কিছু মনে কর না র‍্যাফেল, মেয়েমানুষের সন্দেহ সহজে কাটতে চায় না যে।

দুইটি প্রেমমুগ্ধ তরুণ-তরুণী এমনি করে অসংখ্য অ...র সংলাপের মধ্যে আত্মহারা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পলিন উঠে দাঁড়ায়। র‍্যাফেল তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসে। এতদিন পরে তার দীর্ঘদিন-পোষিত আকাঙ্ক্ষা আজ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। অপরিসীম আনন্দে উচ্ছ্বসিত র‍্যাফেল আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দেয়। হঠাৎ একটা চিন্তা এসে তার বুকে তীক্ষ্ণধার ছুরির মতো চকিতে আঘাত হানে। সে চামড়াখানার পানে চায়। মনে হয় যেন একটু সঙ্কুচিত হয়েছে সেটা। ত্রস্তপদে উঠে ...চামড়াখানা মেপে দেখে। তারপর অসীম হতাশায় আর্তনাদ করে: আমার পরমায়ু যে আর দু'মাসও নেই দেখছি।

র‍্যাফেলের সারা দেহে কালঘাম ছোটে। সে কম্পিত হাতে চামড়াখানা তুলে নেয়। তারপর চিৎকার করে বলে—যা হবার তাই হোক্ কিন্তু এই অর্থহীন অন্ধ বিশ্বাসের শেষ করে দেব আজ।

সে জানালা গলিয়ে চামড়াখানা দূরে বাগানের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

তারপর র‍্যাফেল পলিনকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করে। মার্চ্চ মাসে তাদের বিয়ে হয়ে যায়। তারা সুখী হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন অবান্তর। দীর্ঘদিন বিরহের তাপে দগ্ধ দুইটি আত্মা বহু প্রতীক্ষার

পর মিলনের মাঝে এক হয়ে গেল যেন। ভুলে গেছে তারা পৃথিবীকে। ভুলে গেছে সংঘাতময় জীবনের কথা। পরম শান্তিতে—নির্জনে প্রেমের শান্ত ছায়াতলে তাদের দিন কেটে যায়। * * * * *

বসন্তের সকাল। ভোরের সোনালী আলো শুভ দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে। সমগ্র প্যারী নগরী তখনও আগুন পোহায়। কিন্তু র‍্যাফেল আর পলিন বাগানে প্রস্ফুটিত জাতী, যুথী, মল্লিকা, পারুলের নীরব আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে না। দুইজনে হাত ধরাধরি করে বাগানে ঘুরতে থাকে। তারপর বাগানের গরম ঘরে বসেই চা খায়। চা পানের পর র‍্যাফেল খবরের কাগজখানি খুলে পড়তে চেষ্টা করে। আর পলিন কারণে অকারণে উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ে। কখনও ছুটে গিয়ে একটা বিড়ালছানাকে কোলে তুলে নিয়ে ছোট্ট মেয়ের মতো আদর করে। সেই ফাঁকে র‍্যাফেল যেই সংবাদপত্রে মন দেয়, অমনি চকিতে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে পলিন খিলখিল করে হেসে উঠে। হাসির প্রাবল্যে তার আয়ত চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। রুমালে চোখ মুছতে মুছতে কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলে—ঐ কাগজখানাই হয়েছে আমার সতীন। তুমি জান, আমার সুমুখে পত্রিকা পড়া তোমার একটা মহা অপরাধ।

—তা জানি। তাই তো কাগজ হাতে করে বসেছিলাম বটে কিন্তু চোখ ছিল তোমারই দিকে।

হঠাৎ সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাগানের মালী এসে ঘরে ঢোকে। সে নম্রস্বরে বলে—মঁসিয়ে, আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আপনাদের একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাতে নিয়ে এসেছি। বালতিতে করে জল তুলছিলাম, হঠাৎ জলের সঙ্গে এই কাঠখানা বালতির মধ্যে উঠে এল। আশ্চর্য্য!

বরাবর জলের মধ্যে থেকেও কাঠখানা কেমনে শুকনা রয়েছে দেখুন। ওটার গায়ে সামান্ত একটু ভিজা দাগ পর্য্যন্ত নেই। মার্ক ইস্ একজন পণ্ডিত লোক। উনি দেখলে হয়তো জিনিসটা চিনতে পারবেন, তাই ওটাকে তুলে নিয়ে এলাম।

মালী র‍্যাফেলের পরিত্যক্ত সেই চামড়াখানা সুমুখের টেবিলের উপর রাখল। সেখানা ইতিমধ্যে অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে গেছে।

—তোমাকে অসংখ্য ধন্তবাদ ভ্যানিরি, খুব দামী জিনিষ এটা। র‍্যাফেলের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে পলিন। সে ব্যগ্রকণ্ঠে শুধায়—কি হয়েছে প্রিয়তম? তোমার চোখ-মুখ হঠাৎ অমন ফেকাশে হয়ে গেল কেন?

—ভ্যানিরি, তুমি এখন যেতে পার। প্রভুর আদেশে মালী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পলিন ব্যাকুলস্বরে বলে—কি হয়েছে তোমার শীগ্‌গির বল আমার বড্ড ভয় করছে। তোমার কোন অসুখ করল নাকি? হ্যাঁ যা ভেবেছি তাই—যোনাথান্, ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়।

—পলিন, লক্ষীটি ব্যস্ত হয়ো না, র‍্যাফেলের স্বর কতকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে—চল এখান থেকে যাই। খুব সম্ভব ভারবেন ফুলের গন্ধেই আমার শরীর অস্থির করছে। ঐ ফুলের গন্ধটা আমি একদম সইতে পারি না।

পলিন টেবিল থেকে ভারবেন ফুলগুলি তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। তারপর রুদ্ধকণ্ঠে বলে—আমি জানি এত সুখ আমার অদৃষ্টে সইবে না। একি তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন?

—ও কিছু না—

—তোমার চোখে জল কেন ? কি হয়েছে শীগ্‌গির বল !

—পলিন ! অপরিসীম তোমার প্রেম।

—র‍্যাফেল, তুমি আমার কাছ থেকে কি যেন একটা লুকাতে চাইছ। মিনতি করছি, তোমার কি হয়েছে আমায় খুলে বল। আর ওটা আমায় দাও। বলে সে আঙুল দিয়ে চামড়াখানা দেখিয়ে দেয়।

র‍্যাফেল ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে চামড়াটার দিকে তাকিয়ে বলে—ওই হচ্ছে আমার যম।

পলিন ক্ষুব্ধস্বরে বলে—একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন তোমার !

—পলিন, তুমি কি আমায় ভালবাস ?

—এই প্রশ্ন জিগ্যেস করবার কোন প্রয়োজন আছে কি ?

—তাহলে আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

বিস্মিত, বিক্ষুব্ধ পলিন অনিচ্ছুক পা'দুটাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরে র‍্যাফেল উত্তেজিত স্বরে বলে উঠে,—এই বৈজ্ঞানিক যুগে কোন অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করা বোকামি। আজ আমরা জানি যে কার্বন দানা বেঁধেই হীরা হয়। বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেকটি অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনার কার্য্যকরণ সম্বন্ধ খোঁজে সবাই। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কোন-কিছুতে বিশ্বাস করে না কেউ। আর আমি কিনা একটা চরিত্রহীন বুড়োর কথায় বিশ্বাস করে একখণ্ড চামড়াকে আমার জীবনের প্রতীক বলে মেনে নিয়েছি। নাঃ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলোচনা করে আজই এক্ষুণি এই সন্দেহের নিরসন করতে হবে।

র‍্যাফেল প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সে এসে বাগানের

শেষপ্রান্তে একটা ছোট পুকুর-ধারে দাঁড়ায়। পুকুরে কতকগুলি হাঁস সাঁতার কাটছিল। তাদের রং বেরংয়ের পাখায় সূর্যের আলো পড়ে বেলোয়ারী ঝাড়ের মতো ঝিক্‌মিক্‌ করে। হাঁসও রয়েছে অসংখ্য। পৃথিবীর সমস্ত হংসকুলের প্রতিনিধিরাই যেন এই বিরাট্ হংস-সম্মেলনে এসে সমবেত হয়েছে।

—উনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ প্রাণিবিদ্যা বিশারদ মঁসিয়ে লেভ্‌রিল, বলে ভৃত্য একজন আধাবয়সী বেঁটে ভদ্রলোককে দেখিয়ে দেয়। র‍্যাফেল তাকিয়ে দেখল মঁসিয়ে লেভ্‌রিল ধ্যানস্তিমিত নেত্রে একজোড়া হাঁসের পানে চেয়ে রয়েছেন। পর্য্যবেক্ষণে প্রখর তাঁর দুটি চোখের দৃষ্টি। পোষাক-পরিচ্ছদে বৈজ্ঞানিক সুলভ নির্লিপ্ততা। পরস্পরের কুশল সংবাদ আদান প্রদানের পর র‍্যাফেল ভদ্রতার খাতিরে মঁসিয়ে লেভ্‌রিলের হাঁসগুলির একটু প্রশংসা করে। ঐটুকুতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন লেভ্‌রিল। তিনি পূর্ণ উৎসাহে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলেন—আমার আরও অনেক হাঁস আছে। এইগুলি হচ্ছে আদিম হংস-গোষ্ঠীর আদর্শ বংশধর। রাজহাঁস হচ্ছে এর আদিপুরুষ আর সর্ব্বশেষ পুরুষ পাতিহাঁস। কিন্তু এই বিবর্ত্তনের পথে সাতাত্তরটা উপজাতিতে ভাগ হয়ে গেছে এরা। আর চাল-চলন, আকৃতি-প্রকৃতি, নাম-ধামে একটা উপজাতি আর একটা উপজাতি থেকে ঠিক শ্বেতাঙ্গ আর নিগ্রোদের মতোই আলাদা। সত্য কথা বলতে কি আমরা যখন কোন একটা হাঁসের মাংস খাই—

হঠাৎ পুকুর-ধারে একজোড়া ছোট্ট সুন্দর হাঁসের প্রতি নজর পড়তেই লেভ্‌রিল একটু থেমে যান। তারপর আবার বলেন,

—ঐ ঝুঁটিওয়ালা হাঁসদুটোকে ক্যানেডা থেকে আনিয়েছি। আমি সবসুদ্ধ একশ' রকম হাঁসের সৃষ্টি করে যাব। তাই ওদের সবাইর

বিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছি। এই প্রচেষ্টা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহলে এক সুবিরাট্ হংস-সমাজের স্রষ্টা হিসাবে আমার নাম ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে বর্তমানে আমি একটা বিশেষ জরুরী কাজে ব্যস্ত আছি। তবুও যদি আপনার কোন কাজে আসতে পারি তাহলে নিজকে কৃতার্থ মনে করব।

র‍্যাফেল সেই চামড়াখানা মঁসিয়ে লেভ্রিলকে পরীক্ষা করতে দেয়। লেভ্রিল ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে চামড়াখানা ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলে—এইখানা হচ্ছে গাধার চামড়া। পারস্যের জঙ্গলে একজাতীয় বুনো গাধা পাওয়া যায় তাদের বলে ওনেজার। গর্দ্দভ-গোষ্ঠীর এই প্রশাখাটি আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিক প্যালাস। প্রাচীন অধিবাসীরা এই গাধাগুলোকে স্বর্গীয় জীব মনে করে পূজা করত। ওদের চামড়া শুখিয়ে তাইতে ধর্ম্মের অনুশাসন লিপি খোদিত করে রাখত তারা। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে কোথাও কোথাও ওনেজারকে জন্তু-জগতের বেশ্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ওদের আকৃতি-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করলে এই অদ্ভুত নামকরণের সার্থকতা অনেকখানি চোখে পড়ে। স্রষ্টাদের মতোই লীলাচপল ওরা। আর অন্যান্য জানোয়ার-দের তুলনায় দেখতেও বেশ সুন্দর। ওদের মসৃণ গাত্রচর্ম্ম, দীর্ঘ দেহ আর কাচের মতো স্বচ্ছ চোখ একদা বোধ হয় জানোয়ার-সমাজে অসংযমের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। এক কথায় ওদের বলা চলে প্রাচ্যের প্রাণি-জগতের রাণী। পারস্য আর তুরস্কের আদি অধিবাসীরা সলোমনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে ওনেজারের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কৌতুককর গল্প রচনা করেছে। ওনেজার ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী। আমার মনে হয় প্রাচ্যের বনচর রাখালেরা দ্রুত ধাবমান ওনেজার

দেখেই পক্ষিরাজ ঘোড়ার কল্পনা করেছিল। মার্কুইস, আপনার এই চামড়াখানাও ওনেজারের চামড়া।

—ম'সিয়ে, আপনি এতক্ষণ ধরে যে মূল্যবান তত্ত্বের ব্যাখ্যা করলেন তার জন্তে অসংখ্য ধন্তবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু প্রথমে এই চামড়াখানা আপনার ঐ ম্যাপটার মত বড় ছিল। গত তিনমাসের মধ্যে সংকুচিত হয়ে হয়ে বর্ত্তমানে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

—চমৎকার, তাহলে আমার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল। আবহাওয়ার দোষগুণে প্রায় সব আদিম জানোয়ারদের চামড়াই কমবেশী সঙ্কুচিত হয়। তবে আসল কথা কি জানেন মার্কুইস্ বিজ্ঞান হচ্ছে অনন্ত আর আমাদের জীবন সীমাবদ্ধ। সুতরাং কোন লোকের পক্ষেই বিজ্ঞানের সব রহস্ত জানা সম্ভব নয়।

র‍্যাফেল উৎকণ্ঠিতস্বরে বলে—কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত জানেন যে এই চামড়াখানাও প্রাণি-বিস্তার সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নয়? এটাকেও ইচ্ছা করলে বাড়ানো কিংবা কমানো যায়?

—নিশ্চয়ই, লেভরিল জোর দিয়ে বলেন—কিন্তু আপনি যদি এই চামড়াখানাকে বাড়াতে কিম্বা কমাতে চান তাহলে বলবিস্তার অধ্যাপক ম'সিয়ে প্লাঙ্কের সঙ্গে একবার দেখা করুন।

—ধন্তবাদ ম'সিয়ে, আপনি আমায় বাঁচালেন। বলে র‍্যাফেল এই প্রবীন জীববিস্তা বিশারদের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

সে এসে যখন অধ্যাপক প্লাঙ্কের গবেষণাগারে ঢুকল তখন অধ্যাপক একটা সূর্য্যঘড়ির পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে কি যেন হিসাব করছিলেন। তাঁর মাথার চুল উস্কখুস্ক। জামার বোতামগুলি খোলা। সর্ব্বাঙ্গের দারিদ্র্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। আজীবন বিজ্ঞানের সাধনা করেও আজ পর্য্যন্তও যশ বা অর্থ কোনটাই পাননি তিনি। তবুও তাঁর

সাধনায় বিন্দুমাত্র শৈথিল্য নাই। একাগ্রচিত্তে বিজ্ঞান-চর্চা করে চলেছেন। অধ্যাপককে কর্ম্মব্যস্ত দেখে র‍্যাফেল একপাশে চুপ করে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণের পর অধ্যাপক প্লাক হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে উঠেন—কিন্তু এর কারণ কি? পরক্ষণেই র‍্যাফেলের দিকে তাঁর নজর পড়ে। তিনি ব্যস্তসমস্ত ভাবে এগিয়ে এসে বলেন—আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন? আপনার মা কেমন আছেন?

র‍্যাফেল মনে মনে ভাবে—হায় ওঁর মতো যদি জীবনটা কাটাতে পারতাম!

অধ্যাপক দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতেই সে চমকে উঠে চামড়াখানার সঙ্কোচনের কাহিনীটুকু খুলে বলে।

—আপনি হয়ত আমার কথা শুনে মনে মনে হাসছেন। তবু আমার কি মনে হয় জানেন স্যার, নিশ্চয়ই এই চামড়াখানার এমন কোন একটা শক্তি আছে যার কাছে পার্থিব সমস্ত শক্তিই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য।

তার কথা শুনে অধ্যাপক গম্ভীর স্বরে বলেন—মশাই, আপনাদের মতো সাংসারিক মানুষেরা বিজ্ঞানকে মনে করে একটা খেয়ালের বস্তু। গ্রহণ দেখে যারা ট্যালেওারকে দ্বিতীয়বার সূর্য্য ঢেকে ফেলবার জন্যে অনুরোধ করেছিল বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনারা প্রায় সকলেই তাদের মতো অজ্ঞ। কিন্তু আপনি কি ধরণের শক্তি উৎপাদন করতে চান? বলবিস্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে গতিশক্তির সাধারণ নিয়মগুলির প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এই গতিশক্তিটা যে কি তা ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। বস্তুর যে সমস্ত বিশেষ অবস্থায় ঘন ও তরল দ্রব্যের ক্রিয়াগুলি নিষ্পন্ন হয় সেই

অবস্থাগুলিকে ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করে আমরা তার উৎপত্তির কারণগুলিকে সংঘটিত করি। ফলে উৎপন্ন হয় এক মহাশক্তি। ঐ শক্তির সাহায্যে যন্ত্রপাতি চলে, বস্তুদেহে গতিশক্তির সঞ্চার হয়। বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্তও এই শক্তির উৎস আবিষ্কার করতে পারেনি। বৈজ্ঞানিকেরা শুধু শক্তির আবির্ভাবের সহায়ক অবস্থা-গুলির সংঘটন ঘটায় কিন্তু শক্তির স্রষ্টা তারা নয়। কিন্তু আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি বলুন ?

র‍্যাফেল বিচলিত স্বরে বলে—আমি এই চামড়াখানিকে অনেকটা বাড়াতে চাই।

বৈজ্ঞানিক ধীর স্বরে বলেন—এই বস্তুটি এত ছোট যে এটাকে অনেকটা বাড়ানো সম্ভব নয়। এর পরিধি যতই বাড়বে বেধ ততই কমে আসবে।

—তাই—তাই আমি চাই স্যার, যদি এটাকে বাড়িয়ে দিতে পারেন আপনাকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেব।

অধ্যাপক ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন—আমি চোর নই। এই সামান্য কাজের জন্যে লক্ষ টাকা নেয়ার অর্থ হচ্ছে চুরি করা। এখনই আপনাকে এমন একটা মেসিন দেখাব যার তলায় চেপে স্বয়ং ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত চেপ্টা করে দেয়া যায়। গোটা একটা মানুষকে যদি ঐ জাঁতা-কলে পুরে দিই কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সে পিষে একখানা কাগজের মতো পাতলা হয়ে যাবে।

—এ যে দেখছি এক ভয়ঙ্কর কল মশাই, র‍্যাফেল বিস্মিত স্বরে বলে।

প্লাঙ্ক উঠে একটা খালি ফুলের টব নিয়ে এলেন। তারপর সেইটার তলার দিকে একটা ছেঁদা করে টবটাকে খানিকটা কাদার

উপর বসিয়ে দিলেন। একটা কাঠের নল কাদা দিয়ে টবের ছেঁদার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে দৃপ্তস্বরে বলেন—এই যে যন্ত্রটা দেখছেন, এটা হচ্ছে প্যাস্কেলের একটা শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

—কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝলাম না। র‍্যাকেলের অজ্ঞতায় অধ্যাপকের ঠোঁটে একটু বিদ্রূপের হাসি খেলে যায়। তিনি শূন্য টবে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে বলেন—আজ পর্যন্ত জলের শক্তি কেউ বোধ করতে পারেনি। সলিল-শক্তির এই গোড়ার কথাটা মনে রাখা দরকার।

—বেশ।

—তারপর, অধ্যাপক বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলেন—মনে করুন এই টবের আয়তন ঐ কাঠের নলের মুখ থেকে হাজার গুণ বড়।

—অ চ্ছা।

—এখন ঐ কাঠের নল দিয়ে যদি এই জলপূর্ণ পাত্রে আরও জল ভর্তি করি তাহলে এই পাত্রমধ্যস্থিত জলে যে উর্দ্ধচাপের সৃষ্টি হবে তার অদম্য শক্তিতে যে কোন বস্তু পিষে চেপ্টা হয়ে যাবে।

—আপনি যদি এই যন্ত্রটা দিয়ে আমার চামড়াখানার আয়তন বাড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে আমি নিজব্যয়ে বৈজ্ঞানিক প্যাস্কেলের একটা মর্ম্মর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে দেব, এবং প্রত্যেক দশ বছর পর বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের জন্যে এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার দেব। আর পাগল গণিতজ্ঞদের জন্যে একটা বেশ বড় করে উন্মাদাগার প্রতিষ্ঠা করব।

সুধিজনসুলভ শান্ত স্বরে অধ্যাপক বলেন—হ্যাঁ এটা একটা কাজের মতো কাজ হবে। কিন্তু আমাদের একবার স্পাইগেন্টারের সঙ্গে দেখা করা দরকার। কারণ সেই প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী একখানা বেশ ভাল মেসিন নির্ম্মাণ করেছেন।

—তাহলে কালই চলুন স্যার।

—হ্যাঁ কালই যাব।

র‍্যাফেল বাড়ী ফিরে আসতে আসতে ভাবে—যন্ত্র-বিজ্ঞানের মতো এমন চমৎকার বিজ্ঞান আর নাই।

পরদিন র‍্যাফেল অধ্যাপক প্লাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক স্পাইগেল্টারের গবেষণাগারে গিয়ে হাজির হল। চারদিকে পুঞ্জীভূত লোহালক্কড়, নাটবল্টু, স্ক্রু, পিস্টন, লিভার, কাঠ আর তপ্ত স্টিলপ্লেটের মাঝে দাঁড়িয়ে র‍্যাফেলের মনে হল যেন সে একটা জলন্ত হাপরের মধ্যে এসে ঢুকেছে। চারদিকে আগুন জলছে। হাওয়ায় পর্য্যন্ত আগুনের স্রোত বইছে যেন। একটা বিরাট্ সুগঠিত ঝক্‌ঝকে মেসিনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্পাইগেল্টার। তিনি র‍্যাফেলের কথা শুনে আঙ্গুল দিয়ে মেসিনটাকে দেখিয়ে বলেন—যদি ঐ উইন্‌সটা সাতবার ঘুরিয়ে দেন তাহলে নীচের স্টিলপ্লেটটা সুদ্ধ ভেঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে সূচের মতো আপনার পায়ে এসে বিঁধবে। র‍্যাফেল বিস্ময়ে একটা অস্ফুটোক্তি করে।

অধ্যাপক প্লাঙ্ক নিজেই চামড়াখানি স্টিলপ্লেটটার নীচে রেখে উইন্‌সটা ঘুরিয়ে দিলেন।

স্পাইগেল্টার বজ্রগম্ভীরস্বরে চিৎকার করে উঠেন—শুয়ে পড়ুন সবাই।

প্রচণ্ড শব্দে মেসিনটা গর্জ্জন করে উঠে। পরক্ষণেই একটা পুরানো লোহার নল ভেঙ্গে গিয়ে রুদ্ধ জলরাশি তীব্র বেগে বেরিয়ে আসে। একটা জলন্ত হাপর ঐ জলস্রোতের মুখে পড়ে শুখনা পাতার মতো ভেসে যায়। প্লাঙ্ক চামড়াখানা পরীক্ষা করে বলেন—চামড়াখানার কোন পরিবর্ত্তনই হয়নি, এমন কি সামান্য একটা দাগ

পর্য্যন্ত লাগেনি। আপনার টিউবে নিশ্চয়ই কোন ছেঁদা ছিল প্রফেসার।

—না—না—না, স্পাইগেন্টার উত্তেজিতস্বরে বলেন—আমার মেসিনে কোন গলদ ছিল না। এই ভদ্রলোককে ওঁর চামড়াখানা নিয়ে যেতে বলুন—শয়তান আছে ওটায়।

জার্মান বৈজ্ঞানিক অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে চামড়াখানা একটা নেহাইএর উপর রেখে ক্রোধকম্পিত দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চামড়া-টার উপর হাতুড়ির ঘা মারেন। কিন্তু তাতেও চামড়াখানায় কোন দাগ পড়ে না। অবশেষে ক্রুদ্ধ বৈজ্ঞানিক চামড়াখানাকে চিমটা দিয়ে ধরে একটা জ্বলন্ত চুল্লীর মধ্যে পুরে দেন।

মেসিন ভাঙ্গার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে গবেষণাগারের কর্ম্মচারীরা ইতিমধ্যেই এসে চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। তারা উৎসুক চোখে চুল্লীর দিকে তাকিয়ে থাকে। আগুনের তপ্ত আভায় রক্তিম ওদের মুখগুলি র‍্যাফেলকে নরকরাজ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বলে—চামড়াটা আমায় ফিরিয়ে দিন।

স্পাইগেন্টার চামড়াখানি র‍্যাফেলের হাতে দেয়। কিন্তু সেটা তখনও বরফের মত ঠাণ্ডা। আগুনের উত্তাপও ওটাকে সামান্যমাত্র উত্তপ্ত করতে পারে নাই।

বিস্ময়ে অভিভূত জার্মান বৈজ্ঞানিক ও তাঁর কর্ম্মচারীরা অন্যত্র চলে যায়।

র‍্যাফেল অত্যধিক বিচলিত স্বরে বলে—নিশ্চয়ই কোন পৈশাচিক শক্তি আছে ওটায়। পৃথিবীতে কি এমন কেউ নেই যে আমায় বাঁচাতে পারে?

প্লাঞ্চ একটু ভেবে বলেন—চলুনতো একবার জ্যাফেটের কাছে

যাই। যন্ত্র-বিজ্ঞান অসমর্থ হলেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এটার স্বরূপ ধরা পড়তে পারে।

র‍্যাফেল তখনই প্লাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে জ্যাফেটের গবেষণাগারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। প্রসিদ্ধ রসায়নজ্ঞ জ্যাফেট গবেষণাগারে একখানা সোফায় বসে একটা তরল পদার্থের অধঃক্ষেপণ লক্ষ্য করছিলেন। অধ্যাপক প্লাঙ্ক ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন—কি হে বন্ধু, তোমার কেমিষ্ট্রির খবর কি ?

জ্যাফেট মৃদু হেসে বলেন—কোন নতুন খবর নেই বন্ধু। তবে একাডেমি সেলিসিনের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেলিসিন এস্প্যারাজিন এবং ভ্যানকুইলাইন নতুন কোন আবিষ্কার নয়।

র‍্যাফেল বাধা দিয়ে বলে—আমার মনে হয় নতুন কিছু আবিষ্কারের পরিবর্ত্তে বস্তুর নাম আবিষ্কারের দিকেই আপনার ঝোঁক বেশী।

—তুমি ঠিকই বলেছ তরুণ বন্ধু—

প্লাঙ্ক বলেন—দেখতো এই বস্তুটাকে বিশ্লেষণ করতে পার কিনা! যদি পার, তোমাকে আমরা অলৌকিক শক্তিমান বলে মেনে নেব। এটাকে বাড়াতে গিয়ে একটা হাইড্রলিক প্রেস ভেঙ্গে ফেলেছি তবুও এর গায়ে সামান্য একটা আঁচড়ের দাগ পর্য্যন্ত পড়েনি। জ্যাফেট উৎসাহের সঙ্গে বলেন—দেখি—দেখি, এটা বোধ হয় কোন নতুন বস্তু!

র‍্যাফেল বলে—এখানা হচ্ছে এক টুকরা গাধার চামড়া।

—কি, অপরিসীম ক্রোধে জ্যাফেট গর্জ্জন করে উঠেন।

র‍্যাফেল চামড়াখানা তাঁর হাতে দিয়ে বিনীতস্বরে বলে—আমি ঠাট্টা করিনি স্যার। তার এই বিনয়ে রসায়নজ্ঞের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তিনি তাঁর লবণ, ক্ষার আর অ্যাসিড আস্বাদনে অভ্যস্ত

জিহ্বা দিয়ে চামড়াখানা কিছুক্ষণ ধরে লেহন করে বল্লেন—নাঃ কোন স্বাদ নেই এটার, একবার অ্যাসিড দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি। বলে জ্যাকেট চামড়াটার উপরে খানিকটা উগ্র অ্যাসিড ঢেলে দিলে। এই অ্যাসিড দিয়ে তিনি অনেক দুর্দ্ধর্ষ জানোয়ারের কলা পর্য্যন্ত গলিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু এহেন উগ্র অ্যাসিডও চামড়াটার উপরে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। জ্যাকেট একটু বিস্মিত হলেও কণ্ঠস্বরের বৈজ্ঞানিক-সুলভ নির্লিপ্ততা বজায় রেখে বলেন—এটা চামড়া নয়, খুব সম্ভব কোন খনিজ পদার্থ। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে ওটা থেকে ছোট একটা টুকরা কেটে নিয়ে আমি একবার রেড-পটাশ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

—এক টুকরা কেটে নেবেন? বেশতো চেষ্টা করে দেখুন। র‍্যাফেলের স্বরে ফুটে উঠে ব্যঙ্গমিশ্রিত হতাশা। জ্যাকেট একখানা ক্ষুর দিয়ে চামড়াখানা কাটবার জন্যে বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তিনি ওটাকে ভাঙবার জন্যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ করলেন। কিন্তু এই অদ্ভুত চামড়াটা দুইজন প্রবীন বৈজ্ঞানিককে বিস্ময়ে হতবাক্ করে দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তিকেও হার মানাল। বিদ্যুতের প্রচণ্ড চাপেও চামড়াটায় সামান্য দাগ পর্য্যন্ত পড়ল না।

—আমি মরে গেলাম—শেষ হয়ে গেলাম, বলে চিৎকার করতে করতে র‍্যাফেল চামড়াখানা হাতে করে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বৈজ্ঞানিকদ্বয় বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পরস্পরের পানে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। বিজ্ঞানের এই পরাজয়ে মর্ম্মাহত হয়েছেন তাঁরা।

ভগ্নহৃদয়ে র‍্যাফেল বাড়ী ফিরে আসে। জগতের কোন-কিছুর

উপরেই আর আস্থা নাই তার। হাইড্রলিক প্রেসের টিউবে হয়ত ছিদ্র ছিল এই কথা বিশ্বাস করতে সে অরাজি নয়। কিন্তু আগুন, অ্যাসিড, বৈদ্যুতিক শক্তি কোন-কিছুই এই চামড়াটার গায়ে সামান্য একটা আঁচড় পর্য্যন্ত কাটতে পারলে না। ভয়ে র‍্যাফেলের স্নায়ু-শিরায় হিমেল প্রবাহ ছোটে। সে আপন মনে বলে—আমি পাগল হয়ে যাব। আজ সকাল থেকে কিছুই খায়নি তবু ক্ষুধা কিংবা পিপাসার কোন অনুভূতি নেই। শুধু বুকের মধ্যে ধিকিধিকি করে শ্মশানের আগুন জ্বলছে যেন।

সে উঠে চামড়াখানা পূর্ব্বের সেই আধারে রেখে চারদিকে মোটা করে একটা লাল দাগ দেয়। মনে মনে কি যেন হিসাব করে অস্ফুটস্বরে বলে—সুদীর্ঘ আটটা বছর একটা স্বপ্নের মতো কেটে গেল।

তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় র‍্যাফেল দুই হাতে মাথা টিপে ধরে সোফায় গা এলিয়ে দেয়। তারপর যেন আর্ত্তনাদ করছে এমনি স্বরে বলে—পলিন, জানি প্রেমের শক্তি দুর্বার তবুও সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

হঠাৎ একটা উচ্ছল হাসির শব্দে তার চমক ভাঙ্গে। সে ফিরে তাকিয়ে দেখে গোলাপ-পাপড়ির মতো কোমল শয্যায় ফোটা ফুলের মতো সৌন্দর্য্যের ঢেউ তুলে শুয়ে আছে পলিন। তার মাথার বিস্রস্ত চুলগুলি লক্ষ সর্পশিশুর মতো ঘাড়ে মুখে বুকে লুটিয়ে পড়েছে। পলিন হাসতে হাসতে বলে—যোনাথাসকে খুব বকেছি আজ। ও বলে কি জান এই বিছানাটা নাকি আমার নয়। কিন্তু আমি তোমার স্ত্রী সুতরাং বিছানার উপর আধা অধিকার আছে আমার।

তারপর সে স্বপ্নের একটা তরঙ্গ তুলে শয্যা থেকে নেমে এসে র‍্যাফেলের কোলে বসে বলে—তুমি কি একটা বাথার কথা বলছিলে?

—মৃত্যু।

—মরণে কোন ভয় নেই আমার। কাল সকালেই যদি শেষ চুম্বনের পর মৃত্যু এসে আমায় ডাকে আমি তোমার কোলে বসে সেই আহ্বানে সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হব না। কিন্তু আমার মনে হয় আমি আরও একশ' বছর বাঁচব। যদি এক মধুরাতে মধুময় শুভ মুহূর্ত্তে জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য নিংড়ে নিতে পারি তারপর হলই বা মৃত্যু। কোন ক্ষতি—কোন দুঃখ নেই তাতে।

র‍্যাফেল উত্তেজিত স্বরে বলে—ঠিক বলেছ তুমি। অথবা স্বয়ং ঈশ্বর তোমার মুখ দিয়ে শাশ্বত আশীর্বাণী শোনালেন। আমায় একটা চুম্বন দাও তারপর এস আমরা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করি।

পলিন উচ্ছল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বলে—চল আমাদের মরণশয্যা বিছাই।

সকাল বেলা প্রাতঃসূর্য্যের প্রথম রশ্মি এসে জানালা দিয়ে সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। সেই আধ আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলায় পলিনের সূক্ষ্ম গাত্রাবরণ কুয়াসার আচ্ছাদনের মতো মনে হয়। তার নিদ্রিত মুখে ফুটে রয়েছে কমল-কুঁড়ির স্নিগ্ধতা। হঠাৎ জানালার ধারে একটা নাইটিঙ্গেল ডেকে উঠতেই র‍্যাফেলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে উঠে বসে। গত রজনীর স্বপ্নের রেশটুকু তার এখনও বোধ হয় কাটেনি। সে আপন মনে বলে যায়—মৃত্যু? তাহলে আমার দেহে—রক্তমাংসের এই যন্ত্রটায় কোন গণ্ডগোল হয়েছে। ডাক্তারদের চোখে নিশ্চয়ই সেটা ধরা পড়বে।

র‍্যাফেল পরম আগ্রহে পলিনের মুখখানির পানে চায়। অঘোরে

ঘুমাচ্ছে সে। তার রক্তিম অধরের ফাঁক দিয়ে পোর্সিলেনের মতো শুভ্র দন্তরাজি ঈষৎ দেখা যায়। দাঁতের শুভ্রতায় অধরের লালিমা আরো যেন অনেকগুণ বেড়ে গেছে। ওর গায়ের রং আরো বেশী শুভ্র—আরো বেশী পেলব মনে হয়। নিদ্রিত নারীদেহে একটা শিশুসুলভ কমনীয় কান্তি আছে। দিনের বেলা প্রত্যেক নারীই কম-বেশী অবগুণ্ঠিতা—সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার আবরণে আচ্ছাদিতা। কিন্তু নিদ্রার স্পর্শে তাদের দেহ ও মনের সমস্ত আবরণ খসে পড়ে যায়। সর্ব্বাঙ্গে ফুটে উঠে সহজাত রূপশ্রী। শিশুর মতো অসহায়—সরল মুখখানিতে শোভা পায় নিষ্পাপ আত্মার আলোক-রেখা। নিদ্রিতা প্রিয়ার তনুখানি প্রেমিকের চোখে নন্দনের সৌন্দর্য্য বিলায়। সুবিন্যস্ত কুন্তলদাম ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে, বিস্রস্ত হয়ে যায় সুসংবদ্ধ বেশবাস, তারই ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় অর্দ্ধনগ্ন যৌবনশ্রী। যুবতীর পরিণত দেহে এই যে শিশুসুলভ কাম-গন্ধহীন লীলাচাপল্য—চোখে মুখে বুকে এই যে অপরিসীম সৌন্দর্য্য-সমারোহে, এ কি নিষ্কাম আনন্দ নয়?

হঠাৎ র‍্যাফেলের দৃষ্টির আঘাতেই যেন পলিনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে মৃদু হেসে বলে—সুপ্রভাত প্রিয়তম।

সঙ্গে সঙ্গে তার সরল মুখে যৌবনের সাড়া জাগে। যুবতীর অর্দ্ধনগ্ন তনুদেহ লজ্জার আঘাতে রক্তিম হয়ে উঠে। সে দুই হাতে ঢেকে ফেলতে চায় প্রকৃতির দেওয়া রূপ-ঐশ্বর্য্য।

র‍্যাফেল ঈষৎ ক্ষুন্নস্বরে বলে—কেন তুমি জেগে উঠলে? তোমার নিদ্রিত দেহখানি সত্যই অপূর্ব্ব। দেখতে দেখতে আমার চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল।

—কাল আমিও তোমার সুপ্ত মুখের পানে চেয়ে কেঁদেছি কিন্তু

হর্ষে নয় দুঃখে। তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে তখন তোমার বুক থেকে একটা শুকনা কাশির শব্দ আসছিল। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ডাক্তাররা বলেন এইগুলো নাকি ক্ষয়রোগের লক্ষণ। তোমার এখন বয়স কম, চিকিৎসা করালে হয়ত ভাল হয়ে যাবে। লক্ষীটি আর অবহেলা কর না। আমি তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারব না। যদি মরি তবে দুইজনেই যেন একসঙ্গে মরে স্বর্গে যেতে পারি। র‍্যাফেল পরম স্নেহে পলিনের চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলে—সুস্থ দেহেই এই ধরণের চিন্তা করা সম্ভব।

হঠাৎ র‍্যাফেল খক্ খক্ করে কেশে উঠে। তার কাশির শব্দ শুনে মনে হয় যেন একটা কঙ্কাল কবরের তলা থেকে কাশছে। কাশির তীব্রতায় র‍্যাফেলের সারা দেহ কাঁপতে থাকে। ঘর্মাক্ত ললাট কুঁচকে আসে—মুখ থেকে রক্তের শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কাশির বেগটা কমে এলে র‍্যাফেল হাঁপাতে হাঁপাতে একখানা সোফায় গা এলিয়ে দেয়। পলিন এতক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে ছিল। র‍্যাফেল অপেক্ষাকৃত সুস্থ হলে সে বলে—র‍্যাফেল, আর দেরী কর না। আজই ডাক্তার দেখাও।

তারপর কম্পিত হাতে সে র‍্যাফেলের মুখে ধীরে ধীরে হাত বুলায়। স্নেহের কোমল স্পর্শে ওর মুখ থেকে মৃত্যুর কালো ছায়া মুছে ফেলতে চায় যেন। শঙ্কিতচিত্তে সে স্মরণ করে র‍্যাফেলের সেই কথাটা—পলিন, জানি প্রেমের শক্তি দুর্বার তবুও সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

মার্কুইস্ অসুস্থ। প্যারীর নাম-করা ডাক্তারদের মধ্য থেকে বেছে চারজনকে ডাকা হয়েছে। তাঁরা সবাই একসঙ্গে র‍্যাফেলকে পরীক্ষা করছিলেন। সে একখানা সোফায় শুয়ে একদৃষ্টে ডাক্তারদের

মুখের পানে তাকিয়ে তাদের মনের ভাব পড়তে চেষ্টা করছিল। এঁরাই এখন তার শেষ আশা-ভরসা। ডাক্তারদের মধ্যের একজনের নাম হোরেস্ বিয়াচন্ন। সে প্যারীর মেডিক্যাল কলেজের একজন নাম-করা ছাত্র। বয়সে তরুণ হলেও চিকিৎসক মহলে তার যথেষ্ট পসার ও প্রতিপত্তি আছে। র‍্যাফেলের সে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। সুতরাং দৈনন্দিন চিকিৎসার ভার তারই হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। অপর তিনজন প্রবীণ ডাক্তারের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর যাতে র‍্যাফেল ঠিক মতো দিতে পারে তাই জন্যে হোরেস্ তাকে সাহায্য করছিল।

প্রবীণ চিকিৎসকদের মধ্যের একজন র‍্যাফেলকে প্রশ্ন করেন—আপনি অতীত জীবনে এক সময় চরম উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন অথবা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেছেন। বলুন সত্যি কিনা?

র‍্যাফেল ক্লিষ্ট স্বরে বলে—যৌবনের প্রথম দিকে পুরা তিনটে বছর অমানুষিক পরিশ্রম করে আমি একখানা বই লিখেছিলাম। তারপর কোন একটা কারণে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে কিছুদিন চরম উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছি।

বৃদ্ধ ডাক্তারটি মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন—আমি ত দেখেই বুঝেছি।

এই ডাক্তারের নাম হচ্ছে ব্রিসেট। উনি একজন বাস্তববাদী চিকিৎসক। ওঁর মতে মানব-দেহ একটা যন্ত্র-বিশেষ। দেহরক্ষার সাধারণ নিয়ম দ্বারাই এই যন্ত্রটি নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁর সহকর্মী ডাক্তার ক্যামেরিস্টাসের মত কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি মনে করেন যে মানব-জীবন একটা অতীন্দ্রিয় মহাশক্তি। তার প্রাণ প্রদীপ শিখার মতোই অহরহ জ্বলছে। এই প্রাণশক্তি ওষুধ কিংবা অস্ত্রোপচারে অভিভূত হয় না কখনো।

তৃতীয় ডাক্তারের নাম মাউগ্রেভি। অস্ত্রোপচারের অস্ত্র ছাড়া আর কোন-কিছুতেই বিশ্বাস নাই তাঁর। তাঁর মতে মৃত্যু একটা অত্যাশ্চর্য্য দুর্ঘটনা। তবে মানুষের আত্মা যে মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে এই আদর্শে আস্থা আছে তাঁর। তিনি বলেন যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশী নজর দেওয়া উচিত রুগীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে।

ডাক্তার মাউগ্রেভি র‍্যাফেলের সেই চামড়াখানা ভাল করে পরীক্ষা করে বলেন—আমি একবার পরখ করে দেখতে চাই যে আপনার প্রত্যেকটি ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই এই চামড়াখানি সঙ্কুচিত হয় কিনা।

ব্রিসেট বলেন—কেন ?

ক্যামেরিস্টাস বলেন—এই পরীক্ষার প্রয়োজন ?

মাউগ্রেভি চামড়াখানা র‍্যাফেলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন—কারণ চামড়ার এই সংকোচনের কাহিনী আমার কাছে মোটেই স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

ডাক্তারেরা আবার একসঙ্গে র‍্যাফেলকে পরীক্ষা করতে শুরু করেন। তাঁদের কথাবার্ত্তার মধ্যে কোথাও রুগীর প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতির আভাস পাওয়া যায় না। পরম নির্ব্বিকার ভাবে তাঁরা র‍্যাফেলকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যান। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে নবাগত হোরেস্ এখনও বোধ হয় অপর তিনজন ঝুনো ডাক্তারের মতো পেকে উঠতে পারেনি। তাই অবৈজ্ঞানিক হলেও রুগী-বন্ধুর দেহে মৃত্যুর আবির্ভাবের সম্ভাবনায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠে। তার চোখে গভীর বেদনার ছায়া পড়ে। আরও কিছুক্ষণ পরীক্ষা চলবার পর ডাক্তারেরা আলোচনার জন্যে উঠে পাশের ঘরে যান। র‍্যাফেলও সেইখানে উপস্থিত থাকতে চাইলে তাঁরা সমস্বরে প্রতি-

বাস করেন। কিন্তু তার শঙ্কিত মন ডাক্তারদের এই নিষেধবাক্য মেনে নিতে পারে না। রীতিবিরুদ্ধ হলেও সে লুকিয়ে তাঁদের আলোচনা শোনবার জন্তে সম্মুখের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ডাক্তার ব্রিলেট ঘরে ঢুকেই বলতে শুরু করেন,—ভদ্র মহোদয়গণ, আমাকে এখনি একজন মুমূর্ষু রুগী দেখতে হাসপাতালে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং আমি প্রথমে কথা বলছি বলে আশা করি আপনারা কোন অপরাধ নেবেন না। অবশ্য এই রুগী সম্বন্ধে আমার মতামত আমি আপনাদের উপর জোর করে চাপাতে চাই না। আমার মনে হয় এই রুগীটি অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে সমস্ত জীবনীশক্তি ক্ষয় করে ফেলেছে। হোরেস্, ও কি সম্বন্ধে বই লিখেছে?

—ওর রচিত বইখানির নাম "ইচ্ছার তত্ত্বকথা"।

—ওহো সে তো একটা স্থবিরাট্ বিষয়বস্তু। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম, অপ্রচুর খাদ্য আর অতিমাত্রায় মাদক দ্রব্য সেবনের ফলে ওর জীবনিশক্তি সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে গেছে। শরীর ও মনের অবিশ্রান্ত পরিচালনায় সমগ্র দেহ-ব্যবস্থাকে বিকল করে দিয়েছে। তাছাড়া এই রুগীটি মনোম্যানিয়ায় ভুগছে। একই চিন্তার পৌনঃপুনিক আঘাতে ওর দেহের ওজন গেছে কমে। চামড়াখানা সঙ্কুচিত হয় কি হয় না সে সম্বন্ধে আলোচনা করে কোন লাভ নাই। তবে একজন প্রসিদ্ধ উজীরের নাকে মাছি বসায় তাঁর যে অবস্থা হয়েছিল, চব্বিশ ঘণ্টা ঐ চামড়াখানা চোখের উপর রাখায় ওর ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে। আমার মতে অবিলম্বে রুগীর উদরে জোঁক প্রয়োগ করা উচিত। তাহলে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উত্তেজনা কমে আসবে এবং একটু ভাল পথ্যের ব্যবস্থা করলেই মনোম্যানিয়াও ধীরে ধীরে সেরে যাবে। ডাক্তার হোরেসের

মতো সুযোগ্য চিকিৎসককে এর চেয়ে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

মিসেট থামতেই ক্যামেরিল্টাস শুরু করেন—আমার জ্ঞানী বন্ধু গোড়াতেই একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন। তিনি কার্য্যকে কারণ বলে ধরে নিয়েছেন। হ্যা, উনি যে সব বহির্লক্ষণের কথা বললেন সেইগুলি রুগীর দেহে দেখা যাচ্ছে সত্য কিন্তু ওগুলো হচ্ছে জানালার কাচে ফাটা চিহ্নের মতো। যে প্রচণ্ড আঘাতে রুগীর দেহ চিড় খেয়েছে তার উৎপত্তি কোথায় জানেন? ভদ্রমহোদয়গণ, তার উৎপত্তি হয়েছে মস্তিষ্ক থেকে—পাকস্থলী থেকে নয়। পাকস্থলীই আমাদের দেহের সবটুকু নয়। যে প্রদীপ্ত প্রদীপ-শিখা আমাদের দেহযন্ত্রের সমস্ত শক্তির উৎস সেই প্রাণশক্তি আক্রান্ত হয়ে রুগীর মস্তিষ্ক বিকল করে দিয়েছে আর মস্তিষ্কের বিকৃতিই ওর পাকযন্ত্রকে করেছে দুর্ব্বল। সুতরাং এই রুগীটির এখন একান্ত প্রয়োজন নৈতিক চিকিৎসার। ওর আত্মার দৌর্ব্বল্য যদি দূর করা যায় তাহলে দেহও আস্তে আস্তে সেরে উঠবে।

মাউগ্রেভি বলেন—ভদ্রমহোদয়গণ, শুনেছি এই রোগীর বাৎসরিক আয় নাকি দুই কোটি পাউণ্ড। এহেন ধনী ব্যক্তি যদি মনোম্যানিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে আমি বলতে বাধ্য যে এই ধরণের মনোম্যানিয়ার রুগী কদাচিৎ চোখে পড়ে। পাকস্থলী মস্তিষ্ক বিকৃত করেছে না মস্তিষ্ক পাকস্থলীকে বিকল করেছে এই প্রশ্নের মীমাংসা মার্কুইসের মৃত্যুর পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব নয়। তবে উনি যে অসুস্থ এই বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ একমত। এমতাবস্থায় ওঁর উদরে জোঁক প্রয়োগ করে প্রথমে রুগীর দৈহিক উত্তেজনার উপশম করান উচিত। তারপর ওঁকে কোন আর্দ্র জায়গায় হাওয়া-পরিবর্ত্তনের জন্ত পাঠাতে হবে।

হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি জুতার শব্দ হতেই র‍্যাফেল বুঝল যে ডাক্তারদের আলোচনা শেষ হয়েছে। তাঁরা উঠে দাঁড়িয়েছেন। সে ধরা পড়বার ভয়ে তাড়াতাড়ি ড্রয়িংরুমে ফিরে এল।

ডাক্তারেরা ফিরে এসে আবার আসন গ্রহণ করেন। হোরেস্ তাঁদের মুখপাত্র হিসাবে র‍্যাফেলকে বলে—মার্কুইস, এই সব সুধী ব্যক্তিরা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে তোমার উদরে জোঁক প্রয়োগ করা প্রয়োজন আর পথ্যের দিক্ থেকেও তোমাকে বেশ বাছ-বিচার করে চলতে হবে। তাহলেই তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা কমে যাবে। তারপর কিছুদিনের জন্যে কোন একটা ভালো জায়গায় গিয়ে হাওয়া-পরিবর্ত্তন করে এলেই তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। র‍্যাফেল, সত্য কথা বলতে কি আমরা—চিকিৎসকেরা কোন রোগই সারাতে পারি না। আমরা শুধু রোগকে উপশমিত হতে সাহায্য করি। প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে মানবের জীবনীশক্তি সুতরাং প্রকৃতির উপর নির্ভর করাই হচ্ছে রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। তুমি কিছুদিন সংযত জীবন যাপন করবার পর একবার সেভায় থেকে বেড়িয়ে এস।

*

*

তারপর পুরা একটা মাস কেটে গেছে। গ্রীষ্মের এক সুন্দর সন্ধ্যায় একদল নরনারী এইক্স্-হ্রদের ধারে সারকেল্ ক্লাবে এসে সমবেত হয়েছে। র‍্যাফেলও সান্ধ্য ভ্রমণের পর এই ক্লাব ঘরে এসে জানালার ধারে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। তারপর সে এলোমেলো চিন্তার মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেলে। ক্রমে ক্রমে দূর পাহাড়ের কোলে সূর্য্য ঢলে পড়ে। রক্তিম মেঘে পশ্চিম

আকাশের গায় মুঠোমুঠো আবীর ছড়ায়। ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে। র‍্যাফেল তাড়াতাড়ি উঠে জানালাটা বন্ধ করে দেয়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন বৃদ্ধা মহিলা বলে উঠেন—দয়া করে জানালাটা একটু খুলে দিন। হাওয়ার অভাবে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বৃদ্ধার স্বরের তীক্ষ্ণতা র‍্যাফেলকে পীড়িত করে। সে একজন চাকরকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে এনে বলে,—জানালাটা খুলে দে।

র‍্যাফেলের এই অশিষ্ট আচরণে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা যায়। তারা বিরক্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে কি যেন বলতে চায়। স্বভাবভীরু র‍্যাফেল জনতার এই নীরব প্রতিবাদে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণেই সোজা হয়ে বসে। যৌবনের প্রথম দিন থেকেই জনসাধারণের ব্যঙ্গোক্তিকে পরম অবহেলায় উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত সে। এই সব কেতা-দুরস্ত ভদ্রলোকদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আঘাতের সামনে সে প্রস্তর-প্রাচীরের মতোই নির্লিপ্তভাবে বসে থাকে। যুবকদের চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি আর ঐ সুন্দরী মেয়েগুলির ঠাণ্ডা চাহনির প্রকৃত অর্থ র‍্যাফেলের জানা আছে। তারা ওকে হিংসা করে—ঈর্ষা করে ওর অপরিমিত ঐশ্বর্য্যকে। তাই অক্ষমের দল প্রতিপদে তার দোষ খুঁজে বেড়ায়। বিত্ত ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বকে ক্ষুণ্ণ করবার জন্যে ঈর্ষালু জনসাধারণ চিরদিনই এমনি করে দল বাঁধে—শুধুমাত্র সংখ্যার গরিষ্ঠতা দিয়ে মহতের মহত্বকে টেনে নীচে নামাবার ব্যর্থ প্রয়াসে এমনি করে বার বার আঘাত হানে তারা। হঠাৎ একটা উদ্গত কাশির তাড়নায় র‍্যাফেল খক্ খক্ করে কেশে উঠে। যন্ত্রণায় তার চোখ বুজে আসে। ঈর্ষালু অক্ষমের দল এতেই যেন আনন্দ পায়।

তারা শুধুমাত্র আঘাত দেবার জন্যেই র‍্যাফেলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—ওর এই রোগটা বড্ড ছোঁয়াচে।

—ক্লাবের সভাপতির ওর এখানে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

—আঃ কি রকম বিশ্রী শব্দ করে কাশছে দেখ।

—আর পারিনে বাপু ওর ঐ কাশির ঠ্যালায় আমাকে উঠে যেতে হবে দেখছি।

কথাগুলি র‍্যাফেলের কানে যেতেই সে উঠে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু তার অসুস্থ দেহমন কারো সঙ্গে দুটো কথা বলে একটু তৃপ্তি পেতে চায়। এক কোণে একটি যুবতী চুপ করে বসে ছিল। র‍্যাফেল আগ্রহভরে তার দিকে এগিয়ে যেতেই মেয়েটি পিছন ফিরে বসে। দুরারোগ্য ব্যাধির ছোঁয়াচ লাগবার ভয়ে কেউ আর ওর কাছে ঘেঁষতে চায় না। র‍্যাফেল হতাশ হয়ে বিলিয়ার্ড-রুমে যায়। সেইখানেও কেউ ওর সঙ্গে বাক্যালাপ করে না। ওর অন্তর্মুখীন মন অতি সহজেই ওর প্রতি অপরের এই ঔদাসীন্যের কারণ আবিষ্কার করে ফেলে। অভিজাত সমাজ দুঃখদৈন্যকে ছোঁয়াচে ব্যাধির মতো ভয় করে। জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের প্রতি সহানুভূতি নেই কারও। প্রাচীন রোমের মল্লভূমিতে ভূপতিত যোদ্ধার মৃত্যু-আহত মুখের পানে তাকিয়ে দর্শকদল আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠত—অভিনন্দিত করত বিজয়ী সৈনিককে। আভিজাত্যের আবেষ্টনে বর্দ্ধিত, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত তাদের মনের কোণে পরাজিতের জন্য কোন বেদনাই জাগত না। এই হিংস্র মনোবৃত্তি সমাজের স্নায়ু-শিরায় তীব্র বিষের মতো সঞ্চারিত হয়ে গেছে। অক্ষমকে আঘাত দিয়ে সবাই আনন্দ পেতে চায়। যার ঐশ্বর্য্য, শক্তি, স্বাস্থ্য কিংবা

রূপ এইগুলির কোন একটার অভাব আছে, সমাজের চোখে সে পরিত্যাজ্য। অভিজাতেরা প্রতিপদে হাস্যাস্পদ করে তুলতে চাইবে তাকে। তার মুখে স্বভাবকোমল নারীহৃদয়েরও 'পরে পড়বে ঔদাসীন্যের হিমেল আবরণ। কেউ সান্ত্বনা দেবে না তাকে। তুমি যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাক একাকী নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর, হে বৃদ্ধ, তুমি বদ্ধ ঘরের নির্জনতার মাঝে জীবনের শূন্যতার বোঝা বয়ে যাও, আর নারী, তুমি হলেই বা যুবতী কিন্তু তোমার যদি রূপ কিংবা রৌপ্য না থাকে তবে বিনা প্রতিবাদে ভাঙ্গা ঘরের অন্ধ কুঠরিতে বসে ব্যর্থ যৌবনের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মর। কেউ ফিরেও চাইবে না। ইহাই নিয়ম। এমনি করে শক্তিমান জগৎ অক্ষমকে দিনের পর দিন হত্যা করে—বঞ্চিত করে—মহাপাপের অতলান্ত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়।

এমনি শত সহস্র চিন্তার বিক্ষিপ্ত আঘাতে র‍্যাফেলের কবিচিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠে। সমবেত ব্যক্তিদের উদাসীন চোখের হিমেল দৃষ্টিতে তার অস্থিমজ্জায় পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে যায়। হাত দুইটা জোড় করে সে অসহায় ভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। সুদীর্ঘ প্রয়াসে অর্জ্জিত সভ্যতার অবদান কি শুধু এই? শুধু এই প্রাণহীন ঠাট্টা-তামাসা, অন্তরশূন্য হাসি, তৃপ্তিহীন ভোগ, অগ্নিবিহীন অরণি, এই কি মানব-সভ্যতার কষ্টোপার্জ্জিত শেষ সম্পদ? র‍্যাফেল এক সময় চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল উপস্থিত ব্যক্তিরা তাকে একলা ফেলে কখন নিঃশব্দে পালিয়ে গেছে।

পরদিন যথারীতি ডাক্তার আসে। আজ যেন তাকে একটু চিন্তাক্লিষ্ট মনে হয়। র‍্যাফেল কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইতে পেয়েই যথেষ্ট আরাম বোধ করে। সে ওর মুখে দেখতে

পায় দয়া ও মানবতার সুস্পষ্ট ছায়া। কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর ডাক্তার বলেন—মার্কুইস, আমার মনে হয় আপনার রোগ আমি ধরতে পেরেছি। প্যারীর ডাক্তাররা আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে। আপনার হার্টে কোন দোষ নেই আর আপনার পরিপাকশক্তি বোধ হয় উটপাখীকেও লজ্জা দেয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলতে গেলে অত্যধিক আসঙ্গলিপ্সাই হচ্ছে আপনার একমাত্র ব্যাধি। আর আসঙ্গলিপ্সু রুগীর পক্ষে নির্জন স্থানের জলো হাওয়া মোটেই স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। তাই আমার মতে আপনার জার্মানী কিংবা ইংলণ্ডের কোন শুকনা জায়গায় গিয়ে থাকা উচিত। অবশ্য আপনি অন্যত্র চলে গেলে আমার বেশ-কিছু আর্থিক ক্ষতি হবে তবুও রুগীর মঙ্গলের দিকে চেয়ে এই আর্থিক ক্ষতিকে স্বীকার করে নেয়া আমার কর্তব্য।

ডাক্তার এই শেষের কথাগুলি না বললে র‍্যাফেল হয়ত তার উপদেশকে সত্য বলে মেনে নিত। কিন্তু মিথ্যাকে অতিমাত্রায় সত্যে রূপায়িত করতে গিয়ে ডাক্তারের চালাকি ধরা পড়ে যায়। র‍্যাফেল বুঝতে পারে যে তার প্রতিবাসীরা রোগের ছোঁয়াচ লাগবার ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছে। তাই এই তরুণ ডাক্তারকে ঘুষ দিয়ে তার সাহায্যে র‍্যাফেলকে এখান থেকে বিতাড়িত করতে চায়। বার বার পোড় খেয়ে র‍্যাফেল এখন আর মানুষ চিনতে ভুল করে না। সে ব্যঙ্গের স্বরে বলে—আমি অন্যত্র চলে গেলে সত্যিই যদি আপনার আর্থিক ক্ষতি হয় তাহলে এখানে থেকেই আপনাকে দিয়ে চিকিৎসা করাব। আবহাওয়ার উপযোগী করে আমি দুই-এক দিনের মধ্যেই একখানা ঘর তৈরী করিয়ে নিচ্ছি।

তার এই প্রস্তাবে ডাক্তার যেন খুশীই হয়েছেন মনে হল। তিনি হাসিমুখে সেদিনের মতো বিদায় নিলেন।

বুরগেটলেক প্রদেশের এই পার্ব্বত্য স্থানটির উপরে র‍্যাফেলের একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি থেকে সাত-আটশো ফিট উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে চাইলে এই লেকটিকে সবুজের বুকে একখণ্ড উজ্জল হীরকখণ্ডের মতো মনে হয়। হ্রদের চারপাশে প্রস্তর-প্রাচীরের গায়ে শৈবালের শ্যামল আচ্ছাদন। প্রকৃতি এখানে অপর্য্যাপ্ত। পাহাড়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি জীব-জন্তু গাছপালার একটা স্বতন্ত্র রূপ চোখে পড়ে। দূরের সুউচ্চ দেবদারু গাছগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মতো মনে হয়। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হ্রদের জলে আকাশের ছায়া পড়ে। ঐ হ্রদের জলে সিক্ত হাওয়ার শীতল স্পর্শে কামপিষ্ট, বেদনাতুর মানবের দেহ ও মনের সমস্ত জ্বালা মুহূর্ত্তে জুড়িয়ে যায়। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাঝে বসে র‍্যাফেল স্বপ্ন দেখে—সৌন্দর্য্য-পিয়াসী কবিমনের নিষ্কাম স্বপ্ন।

ডাক্তার চলে যাবার পরই সে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তারপর কিছুক্ষণ পার্ব্বত্য পথ ধরে হেঁটে হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হয়। এইখানে বসে হ্রদের অপর পারের গির্জ্জার চূড়ার পানে চেয়ে সে তন্ময়চিত্তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ধ্যান করে যেন। হঠাৎ হ্রদের জলে দাঁড়ের শব্দ হতেই র‍্যাফেলের তন্ময়তা ভেঙে যায়। এ ধারের এই নির্জ্জন দিকটায় কে নৌকা বাইতে এল দেখবার জন্যে সে উৎসুক হয়ে উঠে। কিছুক্ষণ পরেই নৌকাখানি তার সুমুখ দিয়ে ভেসে চলে যায়। নৌকা-আরোহিনী কালকের সেই বৃদ্ধাটি—যে তাকে ক্লাব-ঘরের জানালা বন্ধ করতে বলেছিল। তার সঙ্গে আজ একজন তরুণী সঙ্গিনীও রয়েছে। মেয়েটি র‍্যাফেলের পানে তাকিয়ে মৃদু হাসে কিন্তু বৃদ্ধা তার পানে ফিরেও চায় না।

বোধ হয় সে দেখতে পায়নি ওকে। নৌকাখানা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যেতেই নৌকা-আরোহিনীদের চিন্তাও র‍্যাফেলের মন থেকে জলের বুকে ঢেউয়ের মতো মিলিয়ে যায়।

হঠাৎ অদূরে কোমল পদশব্দ আর পোষাকের খস্‌খসানি শুনে সে ফিরে তাকায়। বৃদ্ধার সঙ্গিনী সেই মেয়েটি র‍্যাফেলের কাছে এগিয়ে আসে। র‍্যাফেল দৃষ্টি তুলে মেয়েটির পানে চায়। তরুণীর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। তনুদেহে ভরা যৌবনের সৌন্দর্য্য-সুষমা। ভাবে মনে হয় আর সব আধুনিকাদের মতোই নিজের সৌন্দর্য্য ও যৌবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন সে। তন্বী লীলায়িত ভঙ্গীতে আরও দুই-এক পা এগিয়ে এসে বলে—মঁসিয়ে, আমার একান্ত অনুরোধ আপনি আর কখনও সারকেল্‌ ক্লাবে যাবেন না। যদি যান তাহলে আপনার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হতে পারে।

র‍্যাফেল মৃদু হেসে শান্ত স্বরে বলে—আপনি কষ্ট করে যখন এখানে এসেছেন তখন নিশ্চয়ই কোন—

—হ্যাঁ মঁসিয়ে, আমার এই আসার পিছনে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। নইলে কাউন্টেস্‌কে চটাবার মতো বিপদ ঘাড়ে নিয়ে আমি এখানে আসতুম না। সে যদি জানতে পারে যে আমি এইখানে এসেছি তাহলে আর রক্ষা নেই।

—কে তাকে সে কথা বলতে যাবে?

—তা ঠিক, তরুণী কম্পিতস্বরে বলে যায়—আমি এইমাত্র সার-কেল্‌ ক্লাব থেকে শুনে এলাম যে কয়েকজন যুবক আপনাকে ঐ ক্লাব থেকে তাড়াবার জন্যে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছে। তারা কোন একটা ছলছুঁতা করে আপনাকে চটিয়ে দিয়ে ডুয়েল লড়তে আহ্বান করবে।

হঠাৎ পাহাড়ের অপর পাশ থেকে বৃদ্ধার কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা যায়। মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে উঠে। র‍্যাফেল বলে—অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম।

দ্বিতীয়বার বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই মেয়েটি ত্রস্তা হরিণীর মতো ছুটে পালিয়ে যায়।

পৃথিবীর অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দরজায় যে সুদূর তালাটা ঝুলছে তা খোলবার একমাত্র চাবি হচ্ছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। কি? শুধুমাত্র এই প্রশ্নটি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে নব নব আবিষ্কারে। কেন? এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা করতে গিয়ে আমরা আহরণ করেছি জ্ঞান-সমুদ্রের অমূল্য রত্নরাজি। এই প্রশ্নবোধক চিহ্নটিই আমাদের মন থেকে নিঃশেষে মুছে দিয়েছে বহু ভ্রান্তির মায়া-মরীচিকা। একটা গাছতলায় বসে মনে মনে এই ধরণের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে র‍্যাফেল কাউন্টেসের পরিচারিকার এই আকস্মিক আবির্ভাবের প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে। মেয়েটি তরুণী। আর সেও যুবক। রুগ্ন হলেও সে একজন মার্কুইস্ আর তার আয় বার্ষিক দুই কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রে প্রেমে পড়াটা মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু ঐ বৃদ্ধা কাউন্টেস্টাই বা শখ করে এমন অসময়ে নৌকা-ভ্রমণে এল কেন? ওদের চালচলন দেখলে তো মনে হয় না যে ওরা বেলা দুপুরের আগে ঘুম থেকে উঠে। তাহলে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমস্ত গল্পটাই কি একটা কল্পিত কাহিনী? ওরা তাকে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে ক্লাব থেকে তাড়াতে চায় নাকি?

মেয়েটির আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন সে র‍্যাফেলের মনে ঔৎসুক্য আর পৌরুষ জাগিয়ে দিয়ে গেল। সে সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা নারকেল্ ক্লাবে গিয়ে হাজির হয়। আত্ম-

শক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী র‍্যাফেল পরম নির্বিকার ভাবে ক্লাব-ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাকে। সে উপেক্ষার দৃষ্টিতে উপস্থিত যুবকদের পানে চায়। বিলিয়ার্ড-রুমের একপাশে বসে কতকগুলি যুবক উত্তেজিত ভাবে তর্ক করছিল।

—তুমি ?

—হ্যাঁ আমি।

—কিন্তু আমার মনে হয় না যে তুমি একাজ পারবে।

—বেশ তাহলে বাজি রাখ।

কি নিয়ে এই যুবকেরা বাজি রাখতে চায় ? ওদের তর্কের বিষয়বস্তুটাই বা কি ? জানবার জন্যে র‍্যাফেল আর একটু এগিয়ে গেল। ওদের মধ্য থেকে একটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবান যুবক এগিয়ে এসে বলে—মশাই, একটা জরুরী বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই ক্লাব-ঘরে আপনার উপস্থিতি আমাদের সকলের বিরক্তি উৎপাদন করে। আপনি নিজে এত বেশী ভদ্র যে অপরের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে নজর দেবার মতো সময় আপনার নেই সুতরাং আমি অনুরোধ করছি যে ভবিষ্যতে আর কখনও এই ক্লাব-ঘরে আসবেন না।

র‍্যাফেল শান্তস্বরে বলে—সৈনিকদের মধ্যে এই ধরণের সস্তা ইয়ারকি প্রচলিত আছে শুনেছি। কিন্তু আপনি বোধ হয় ঠাট্টার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

—আমি ঠাট্টা করিনি। আমার মনে হয় ক্লাব-ঘরের আলো, ভীড় আর গরমে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে।

র‍্যাফেল ব্যঙ্গের স্বরে বলে—জিগ্যেস করতে পারি কি মশাইর কোন্ কলেজে ডাক্তারি পড়া হয়েছিল ?

—প্যারীতে। দ্বন্দ্বযুদ্ধের রাজা কেরিসিয়ার হচ্ছে আমার শিক্ষাগুরু।

—কিন্তু একটা শিক্ষা এখনও আপনার বাকি আছে। ভদ্রতার সাধারণ নিয়মকানুনগুলো এইবার শিখে ফেলুন তাহলে কিছুদিনের মধ্যে পুরাপুরি ভদ্রলোক হয়ে উঠবেন।

ওদের দুইজনকে তর্কবিতর্ক করতে দেখে অন্যান্য যুবকেরাও খেলা ছেড়ে এসে চারপাশে ভীড় করে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাসছিল বটে কিন্তু অনেকের মুখ অকৃত্রিম ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠে। র‍্যাফেল প্রথমে সমস্ত ব্যাপারটাকে যথাসাধ্য হাল্কা করতে চেষ্টা করে কিন্তু তার প্রতিপক্ষ ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে দেখে সে গম্ভীর স্বরে বলে—এখন আর আমরা ইচ্ছা হলেই পরস্পরকে হনন করতে পারি না কারণ আইনের বাধা আছে। কিন্তু এছাড়া তোমার মতো একটা ভীরু অভদ্রকে যে কি করে শায়েস্তা করা যায় তাও ভেবে পাচ্ছি না।

—বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা, কালই তুমি এই সমস্যার সমাধান করতে পার, উত্তেজিত যুবকেরা সকলে মিলে একসঙ্গে কথা কয়।

র‍্যাফেল যুবকটির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করে। ঠিক হয় যে আগামী কাল সকালে বরডোক্যাসেলের সংলগ্ন ময়দানে তারা দুইজনে ডুয়েল লড়বে।

র‍্যাফেলের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সুগভীর পাণ্ডিত্য অতল জলে ডুবিয়ে দিয়ে সমাজ আর একবার তার বিজয়-কেতন উড়ায়। হয় দ্বন্দ্বযুদ্ধ না হয় তথাকথিত অসম্মানের বোঝা ঘাড়ে করে চিরদিনের জন্যে এইক্স্ প্রদেশ পরিত্যাগ। র‍্যাফেল প্রথমটাকেই মেনে নেয়।

পরদিন সকালে আটটা বাজতে না বাজতেই র‍্যাফেলের প্রতিদ্বন্দ্বী দুইজন অনুচর ও একজন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে এসে বয়স্তোক্যাসেলের সবুজ ময়দানে উপস্থিত হয়। সে মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের দিকে চেয়ে উৎফুল্ল স্বরে বলে—চমৎকার দিন, আজকের আবহাওয়াটা দ্বন্দ্বযুদ্ধের সম্পূর্ণ উপযোগী বটে। তুমি দেখে নিও ডাক্তার, আমি একবার শুধু ওর ঘাড়টা ছুঁয়ে দেব, সঙ্গে সঙ্গে বাছাধন যে শয্যা নেবে আর অন্ততঃ একটি মাসের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

ডাক্তার সায় দিয়ে বলে—নিশ্চয়ই, পুরা একটি মাস। কিন্তু তুমি এখন একটু বস, হাঁটাহাঁটি করলে হয়ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে।

হঠাৎ রাস্তায় গাড়ীর শব্দ শোনা যায়। অনুচরদের মধ্যে একজন সেই দিকে চেয়ে বলে—ঐ যে সে আসছে।

র‍্যাফেলের প্রতিদ্বন্দ্বী বিস্মিতস্বরে বলে—এ যে দেখছি এক অদ্ভুত লোক! গাড়ী চড়ে ডুয়েল লড়তে আসছে। খেলা কিংবা দ্বন্দ্বযুদ্ধে অতি তুচ্ছ ঘটনাও প্রতিযোগীদের মনে গভীরভাবে নাড়া দেয়। র‍্যাফেলকে গাড়ী করে আসতে দেখে তার প্রতিযোগী কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। সে উত্তেজিতভাবে অপেক্ষা করতে থাকে।

মার্কুইসের গাড়ীখানা ময়দানের ফটকের কাছে থামে। যোনাথাস্ প্রথমে গাড়ী থেকে নামে তারপর পরম স্নেহে র‍্যাফেলকে হাত ধরে নামায়। মার্কুইস্ ভৃত্যের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে রঙ্গভূমির দিকে অগ্রসর হয়। তার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের অপরিসীম স্পর্দ্ধার রেখা প্রতিপক্ষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে।

র‍্যাফেল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। তারপর জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—কাল সারাটা রাত আমি জেগে কাটিয়েছি। প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকটি ওর জ্বালাময় দুটি চোখে কি যেন একটা অজ্ঞাত ভীষণ রহস্যের আভাস পায়। নিজের অজ্ঞাতেই তার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠে। র‍্যাফেল বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে—এখনও সময় আছে। যদি তুমি ক্ষমা চাও সুনিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেতে পার। শুধুমাত্র দৈহিক শক্তিতে নির্ভর করে লড়াই করতে এসেছ তুমি, কিন্তু আমি এক অপার্থিব মহাশক্তিতে শক্তিমান। যদি ইচ্ছা করি এই মুহূর্তে তোমার সমস্ত শক্তি লোপ করে দিতে পারি অবশ্য তার বিনিময়ে আমাকে এক অমূল্য সম্পদ হারাতে হবে। তাই বলছিলাম ক্ষমা প্রার্থনা করে তুমি ফিরে যাও। নইলে আমার গুলি এখনই সোজা গিয়ে তোমার বক্ষে বিদ্ধ হবে আর তোমার লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি ছিটকে পড়বে ঐ হ্রদের জলে।

যুবকটি কম্পিতকণ্ঠে বলে—আপনারা ওকে চুপ করতে বলুন, ওর কথা শুনলেই আমার গা জ্বালা করে।

ডাক্তার র‍্যাফেলকে উদ্দেশ করে বলে—দয়া করে আপনি চুপ করুন। এই নিয়ে তর্কবিতর্ক করা এখন নিষ্প্রয়োজন।

র‍্যাফেল বলে—পূর্ব্বেই ওকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য তাই দিচ্ছিলাম।

বলে সে তার অগ্নিপিণ্ডের মতো জলন্ত দুটি চোখ তুলে একদৃষ্টে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের পানে চায়। প্রতিযোগী যুবকটির নাম চার্লস্। সে র‍্যাফেলের সর্পিল চোখের দিকে চেয়ে অজগরের দৃষ্টিমুগ্ধ অসহায় শিকারের মতো ছট্‌ফট্‌ করতে করতে বলে উঠে—বড্ড তৃষ্ণা পেয়েছে, কেউ আমায় একটু জল দাও।

ডাক্তার তাকে জল পান করাতে করাতে বলে—তুমি কি ভয় পেয়েছ ?

চার্লস্ কম্পিতস্বরে বলে—ভয় ! হ্যাঁ কতকটা তাই বটে। লোকটার ঐ শ্বাপদের মতো দৃষ্টি আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

—তাহলে কি তুমি ক্ষমা চাইবে ?

—নাঃ এখন আর সে সময় নেই, অনেক দূর এগিয়ে গেছি।

প্রথা মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দুইজনকে ঠিক পনের ফিট দূরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দুইজনের কাছে দুইটি করে পিস্তল দেওয়া হয়। চার্লসের অনুচরদ্বয় বিচারকের কাজ করবে বলে ঠিক হয়। তারা ইঙ্গিত করলেই প্রতিযোগীদ্বয় পরস্পরের প্রতি দুইবার করে গুলি ছোঁড়বার সুযোগ পাবে।

হঠাৎ একজন বিচারক বলে উঠে—ওকি চার্লস্, তুমি পিস্তলে বারুদ না পুরেই গুলি ভরছ যে ?

চার্লস্ যেন আর্ত্তনাদ করছে এমনি স্বরে বল্লে—আঃ রোদে চোখ দুটো জ্বলে গেল।

র‍্যাফেল অকম্পিত হাতে পিস্তলে বারুদ পুরতে পুরতে শান্তস্বরে বলে—সূর্য্য তো তোমার পিছনদিকে রয়েছে !

প্রস্তুত ! প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় পিস্তল তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বিচারক সঙ্কেত করে। প্রায় একই সঙ্গে দুইবার গুলির শব্দ হয়।

চার্লস্ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। র‍্যাফেলের গুলি তার বক্ষ বিদীর্ণ করে। একটা তীব্র আর্ত্তনাদ করে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। র‍্যাফেল পিস্তলটা ফেলে তাড়াতাড়ি চামড়াখানা বার করে দেখে। এই বিজয় তাকে বহু বৎসরের পরমায়ু থেকে বঞ্চিত করেছে। চামড়াখানা একটা ওক-পাতার মতো ছোট হয়ে গেছে।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা র‍্যাফেল ফ্রান্সে ফিরে আসে। তারপর সে মাউন্টডোর-হ্রদের দিকে রওনা হয়। যাত্রাপথে তার চিন্তাক্লিষ্ট মন একটা নূতন সত্য আবিষ্কার করে। এতদিন পরে সে বুঝতে পারে যে তার প্রকৃত অভাব কোথায়। শুধুমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কোন লাভ নেই। শিশুর হাতে রাজদণ্ড তুলে দাও, তাই দিয়েই সে পুতুল খেলবে। সাধারণ লোকে অমিত ক্ষমতা হাতে পেলেও যেমন আছে ঠিক তেমনি থেকে যায়। যারা বড়, যারা মহৎ তারাই শুধু ক্ষমতার ফুলে ফসল ফলাতে পারে। র‍্যাফেলকে এক সর্ব্বজয়ী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু তা দিয়ে সে কিছুই করলে না। শিশুর মতো খেলা করে গেল শুধু।

সমাজ-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা লয়ে সে যখন মাউন্টডোরে প্রকৃতির শ্যামল অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিল তখন তার মনে হল এইখানেই ছিল প্রকৃত জীবন—এইখানেই লুক্কায়িত ছিল পৃথিবীর সেরা ঐশ্বর্য্য-সম্ভার। সভ্যজগৎ থেকে বহু দূরে, শিক্ষিত মানব-সমাজের অবজ্ঞাত প্রকৃতির এই নগ্ন বক্ষে র‍্যাফেল তার শেষ আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করে।

একদিন বেড়াতে বেরিয়ে র‍্যাফেল দেখল অদূরে সবুজ প্রান্তরে কয়েকটা নধরদেহ গাই চরে বেড়াচ্ছে। সে ধীরে ধীরে সেইদিকে এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়ে একখানি ছোট্ট কুটীর—ঘন সবুজের বুকে যেন একটা সদ্যঃফোটা ফুল। কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈয়ারী ঘরখানির ছাদে মল্লিকা, মাধবী আর অসংখ্য বনজ ফুলের সমারোহ। গোলাপ, জুঁই আর দ্রাক্ষালতায় বেড়াগুলি এমনভাবে ঢেকে আছে দেখলে মনে হয় যেন লতা-বিতান। কুটীরের সুমুখে এসে দাঁড়াতেই র‍্যাফেলের মন একটা অকারণ শিতে উচ্ছ্বসিত

হয়ে উঠে। তাকে দেখে দুইটা কুকুর চিৎকার করে ডাকে। এই শান্ত পরিবেশের স্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। গাইগুলি মুখ তুলে চায়। কুকুরের ডাক শুনে একটি ফুটফুটে স্বাস্থ্যবান ছোট্ট ছেলে ও তার পিছু পিছু এক অশীতিপর বৃদ্ধ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে ওদের চেহারা ও চালচলনের একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ওরা দুইজন যেন পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমান অভিব্যক্তি—প্রকৃতির প্রাণান্বিত রূপ। বৃদ্ধের পাকা চুল, দীর্ঘ নাসা আর শক্ত দেহাবয়বের পানে চাইলে মনে হয় প্রকৃতির এই স্বাধীন রাজ্যে চিরদিন স্বাধীনভাবে বাস করে এসেছে সে। ছেলেটির মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একরাশ বাদামী চুল, সুগোল হাত-পা ও নিবিড় কালো দুটি চোখের পানে চাইলেই তাকে পর্ব্বতের দুলাল বলে চেনা যায়। প্রকৃতির এই দামাল ছেলে নিষ্পলক চোখে প্রখর সূর্য্যের পানে তাকিয়ে থাকতে পারে। নির্ভয়ে ছুটে যেতে পারে বন হতে বনান্তরে। প্রকৃতির এই দুইটি সন্তান—একটি বৃদ্ধ অপরটি শিশু সমগ্র মানব-জীবনটাকে একই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছে যেন। বৃদ্ধের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে শিশুর চাঞ্চল্য। ছেলেটির দুটি আয়ত আঁখি-তারকা পরিণত বয়সের রঙ্গরসে টলমল করছে যেন। কিছুক্ষণ পরে একটি যুবতীও কুটীর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। সহজ প্রাণরসে ভরপুর এই নারী। তার স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহে এক ধরণের শক্ত সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত সমারোহ। প্রতিবার হাসির সঙ্গে তার মুক্তার মতো দাঁতগুলি ঝকঝক্ করে উঠে। পর্ব্বতের শক্তিমান কন্যা, ও পুরুষের কাছে আশ্রয় চায় না। পুরুষই ওকে ঘিরে আপন নীড় রচনা করে।

মেয়েটি র‍্যাফেলের সঙ্গে কথা বলে। বৃদ্ধ একটা কাঠের বেঞ্চের

উপর চুপ করে বসে থাকে। ছেলেটি তার মার কাছে দাঁড়িয়ে ডাগর দুটি চোখ মেলে র‍্যাফেলকে দেখে আর মন দিয়ে তার প্রতিটি কথা শুনে যায়। র‍্যাফেল মেয়েটিকে শুধায়—এখানে থাকতে ভয় করে না তোমাদের?

—কিসের ভয়? এখানে কেউ আসে না। তাছাড়া আমাদের ঘরে এমন কিছু নেই যা লুটে নিতে চোর-ডাকাত আসবে, বলে মেয়েটি র‍্যাফেলকে তাদের ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়।

ছোট্ট ঘরখানির একপাশে একটা পুরানো তক্তাপোশের উপর বিছানা পাতা রয়েছে। মাঝখানে একটা টেবিল ও গুটিকয়েক চেয়ার। এক কোণে ঘরকন্নার নিত্যপ্রয়োজনীয় বাসনকোসনগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেয়ালে খ্রীস্টের একখানি বড় ছবি। চিমনির ধোঁয়ায় ছবিখানির রং নষ্ট হয়ে গেছে। র‍্যাফেল যখন কুটীর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসছিল তখন অদূরে একটা পাহাড়ের উপর একজন লোকের দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। লোকটি একখানা খন্তা হাতে করে উৎসুক চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। মেয়েটি তাকে দেখতে পেয়ে হেসে বলে—ঐ আমার স্বামী।

—আর ঐ বৃদ্ধ লোকটি? ওকি তোমার বাবা? র‍্যাফেল শুধায়। মেয়েটি হাসিমুখে জবাব দেয়—না, উনি হচ্ছেন আমার স্বামীর ঠাকুরদাদা। ওঁর বয়স এখন একশ' দুই বছর। এক সময় উনি খুব জোয়ান ছিলেন কিন্তু এখন শুধু খেতে আর ঘুমাতে চান। আমার ঐ ছেলেটা হচ্ছে ওঁর নিত্যসহচর। ওকে নিয়ে দূর গাঁয়ে মাঝে মাঝে বেড়াতেও যান।

সরল জীবনের সাহচর্য্যলুব্ধ র‍্যাফেল জীবনের বাকি দিন ক'টা ওদের সঙ্গে কাটিয়ে দেবে বলে মনস্থ করে। যে বাতাস ওদের দেহে

প্রাণসঞ্চার করে সেই বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবে সে, ওদের খাদ্য খাবে, ওদের পানপাত্রে জল পান করবে, এক কথায় ওদের প্রাণরসের প্রসাদ পেয়ে বাঁচতে চায় সে। সম্ভব হলে ওদের উষ্ণ শোণিত-প্রবাহ নিজের স্নায়ু-শিরায় ভরে নিতে চায় যেন। মৃত্যু-আহত পথিক প্রাণপণ প্রচেষ্টায় বাঁচতে চায়—স্বাদ পেতে চায় সরল সহজ নয় জীবনের। ওর চোখের সুমুখ থেকে সভ্যজগতের সমস্ত চাকচিক্য নিঃশেষে মুছে গেছে। ওর দেহই এখন ওর পৃথিবী—শয্যা উন্মুক্ত প্রান্তরের শ্যামল শয্যা।

কিছুদিন ধরে র‍্যাফেল এই কুটীরে অতিথি হয়ে আছে। সারাদিন সে পাহাড়ে, পর্বতে, উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়। উন্মুক্ত আকাশের সুনীল চাঁদোয়ার নীচে প্রকৃতির যে আনন্দের আসর বসে সেই আসরে সেও একজন নিয়মিত সুরি। প্রকৃতির লীলাচ্ছন্দে-মুগ্ধ আত্মা প্রকৃতির কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে। ছোট্ট ছেলের মতন সে উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে ছুটে বেড়ায়, রোদে পোড়ে, জলে ভেজে। প্রকৃতির হারানো দুলাল বহুদিন পরে আবার যেন মায়ের কোলে ফিরে এসেছে। এই নবতম জীবনযাত্রা র‍্যাফেলকে তার শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে মনে মনে ভাবে—এ যাত্রা বোধ হয় বেঁচে গেলাম।

একদিন সকালবেলা সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বনের বুকে প্রাতঃ-সূর্য্যের আলোর খেলা দেখছিল। হঠাৎ বাইরের কথাবার্ত্তা কানে যেতেই চমকে উঠে। যোনাথাস্ তার স্বাস্থ্যের খবর নিতে এসেছে। গৃহকর্ত্রী তাকে বলছিল—ওঁর অবস্থা ভালোও নয় মন্দও নয়। তবে সারারাত কেবল কাশেন। আর সে কি ভয়ানক কাশি। মনে হয় যেন হাড়পাঁজরা সুদ্ধ ভেঙ্গে যাবে। আমার স্বামী মাঝে মাঝে বলে—ঐতো দুর্ব্বল শরীর কিন্তু কাশবার অত শক্তি উনি পান কোত্থেকে!

রোজই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আমাদের ভয় হয় যে আজ বোধ হয় ওঁকে মরা দেখব। ওঁর কিন্তু মৃত্যুর জন্যে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে এখনও অনেকদিন বাঁচবেন। আমার কিন্তু মনে হয়, যে অসহ্য যন্ত্রণা ওঁকে সইতে হচ্ছে তার চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো। আপনি কিছু মনে করবেন না, মিষ্টার যোনাথাস্। ওঁর এই যন্ত্রণা চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছি না বলেই আমি এই কথা বলছি। রোজ রাত্রে বেদম জ্বর হয় তার উপরে আবার এই বুক-ভাঙা কাশি।

র‍্যাফেল হঠাৎ শয্যা ছেড়ে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর যোনাথাস্‌কে লক্ষ্য করে তীব্রস্বরে বলে—এই বুড়ো হাড়গিলে, তুই কি আমায় মেরে ফেলতে চাস্ নাকি?

কৃষাণ-রমণী হঠাৎ যেন চোখের সামনে ভূত দেখেছে এমনি ভাবে ছুটে পালিয়ে যায়।

যোনাথাস্‌কে নিরুত্তর দেখে র‍্যাফেল আবার ঝাঁজালো গলায় বলে—আমার স্বাস্থ্যের জন্যে তোমার মাথাব্যথার কোন কারণ নেই। বুঝেছ?

—হ্যাঁ হুজুর।

—আমি না ডাকলে আর কোনদিন এইখানে আসবে না।

প্রভুর আদেশে যোনাথাস্ তখনই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তার দুটি অবাধ্য চোখের দৃষ্টিতে করুণা ও উদ্বেগের যে ছায়া পড়ল, তাতেই শঙ্কিত হয়ে উঠল র‍্যাফেল। সে যোনাথাসের সিক্ত চোখে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেল যেন। হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে র‍্যাফেল বসে পড়ে। ভীত যোনাথাস্ ত্রস্তপদে ছুটে এসে কম্পিতস্বরে ডাকে—মার্কুইস্।

—বেরিয়ে যা, এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যা !

পরদিন র‍্যাফেল অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে পাহাড়ের উপর বেড়াতে চলে যায়। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ঘুরে একটা পাথরের 'পরে বসে পড়ে সে নীচের দিকে চায়। হঠাৎ কুটীরের কাছে দাঁড়িয়ে যোনাথাস্‌কে কৃষাণীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে র‍্যাফেলের স্নায়ু-শিরায় হিমেল প্রবাহ ছোটে। ওদের অঙ্গভঙ্গী দেখে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে যে তারই মৃত্যুর কথা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। ঐ যে মেয়েটা কেমন অবলীলাক্রমে যোনাথাস্‌কে তার জ্বরের কথা বলছে। ভয়ে ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত র‍্যাফেল আর যেন সইতে পারে না। সে ছুটে সুউচ্চ পর্ব্বতশিখরে আত্মগোপন করতে চায়। পালিয়ে যেতে চায় শুভার্থীদের উদ্বিগ্ন দৃষ্টির সুমুখ থেকে।

ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের কিনারে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে। কৃষক-মেয়েটি ছায়ার মতো নিঃশব্দে র‍্যাফেলের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারপর উৎকণ্ঠিতস্বরে বলে—শিশির পড়তে আরম্ভ করেছে। এই-বার ঘরে চলুন, ঠাণ্ডা লাগলে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে।

র‍্যাফেল হতাশস্বরে বলে—হায় ঈশ্বর! দেখ তোমরা যদি আমায় স্বেচ্ছামতো চলতে ফিরতে না দাও, তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব। সকালবেলা যত খুশি তুমি আমার মৃত্যুকামনা কর কিন্তু সন্ধ্যাটা অন্ততঃ শান্তিতে কাটাতে দাও।

—আপনার মৃত্যুকামনা করব? কি যে বলেন মার্কুইস্‌! আমরা চাই আপনি আমাদের ঠাকুর্দার মতো দীর্ঘজীবী হোন।

—এখন একটু চুপ কর, বলে র‍্যাফেল উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি আর একটু এগিয়ে এসে বলে—আমার হাত ধরে চলুন।

—না।

প্রকৃত কৃপার পাত্র যে তার পক্ষে অপরের কৃপাদৃষ্টি কুড়িয়ে বেঁচে থাকার মতো শক্ত কাজ আর আছে কিনা সন্দেহ। ঘৃণার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে উগ্র সুরার মতো। ঘৃণা মানুষকে উজ্জীবিত করে তোলে, উদ্বুদ্ধ করে তোলে প্রতিহিংসা গ্রহণে। কিন্তু করুণার দান মানুষের মনুষ্যত্বকে করে হত্যা—কৃপার দৃষ্টি দুর্ব্বলের দৌর্ব্বল্যকে আরও যেন শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। একজন কবি যেমন একটা বিশেষ মুহূর্তে ভালমন্দ সব-কিছুর মধ্যেই খুঁজে পায় কবিতার উপাদান—সন্ধান পায় অফুরন্ত রসের, র‍্যাফেলও ঠিক তেমনি কারও চোখে স্নেহের ছায়া দেখলেই শঙ্কিত হয়ে উঠে। সে ভাবে—আমার মুখে মৃত্যুর চিহ্ন দেখতে পেয়েই লোকটা দুঃখিত হলো বোধ হয়। যে কৃষক-পরিবারে সে আশ্রয় নিয়েছিল সে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের মুখে, এমন কি ঐ ছোট্ট খোকার আয়ত দুটি চোখের নীরব ভাষায় পর্যন্ত সে উৎকণ্ঠার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পায়। এই উৎকণ্ঠা তার জন্যে—তারই ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হয়ে উঠছে সবাই। মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিল সে কিন্তু তার আশপাশের প্রতিটি লোকের মুখে অহরহঃ ঘোষিত হচ্ছে যেন তারই মৃত্যুর আগমনবার্ত্তা।

একদিন সকালবেলা র‍্যাফেল কালো পোষাক পরা দুইটা লোককে তার দিকে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে। ওদের চিনতে তার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। একজন পুরোহিত আর অপরটি ডাক্তার। খুব সম্ভব যোনাথাস্‌ ওদের ডেকে নিয়ে এসেছে অথবা মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে যমদূতের মতো ওরা আপনা থেকেই এসে হাজির হয়েছে। র‍্যাফেলের চোখের সামনে ফুটে উঠে তারই নিজের সমাধিশয্যা। এক দুই করে সে মনে মনে কবরভূমির জলন্ত প্রদীপগুলি গুণে যায়। পুরোহিত তারই পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা

করে যে মন্ত্র উচ্চারণ করে তাও সে স্পষ্ট শুনতে পায় যেন। প্রকৃতিও সঙ্গে সঙ্গে রূপ-পরিবর্ত্তন করে। একদা যে পাহাড় যে পর্ব্বত যে বনভূমি ওর চোখে বয়ে এনেছিল অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-সমারোহ, শুনিয়েছিল জীবনের জয়গান, আজ তারাও যেন আভাসে-ইঙ্গিতে ওর কানে কানে মৃত্যুর কথা কয়। সেইদিনই র‍্যাফেল এই পার্ব্বত্য প্রদেশ ছেড়ে প্যারীর উদ্দেশে যাত্রা করে।

পরদিন সে বাড়ী পৌছেই যোনাথাস্‌কে ভালো করে আগুন জেলে দিতে বলে। শীতে তার হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। যোনাথাস্ আগুন জেলে দেয়। তারপর পলিনের লেখা কতকগুলি চিঠি এনে সুমুখের টেবিলের উপর রাখে। র‍্যাফেল নির্লিপ্তভাবে একখানা চিঠি খুলে প্রথম লাইনটার উপর চোখ বুলায়। পলিন লিখেছে—র‍্যাফেল! প্রাণেশ্বর, তুমি কি সত্যি সত্যিই পালিয়ে গেলে নাকি? কেউ জানে না তুমি কোথায় আছ। এমন কি আমি পর্য্যন্ত তোমার কোন খোঁজ-খবর পাচ্ছি না—।

র‍্যাফেল ধৈর্য্য ধরে আর একটা অক্ষরও পড়তে পারে না। সে উত্তেজিতভাবে সবগুলি চিঠি একত্র করে সুমুখের আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর উদাসীন দৃষ্টি মেলে প্রিয়ার অশ্রুসিক্ত প্রেমপত্রগুলি জলন্ত অগ্নিশিখায় জলতে দেখে। আগুনের তাপে কাগজগুলি রক্তিম হয়ে উঠে আর তারই বুকে কালো কালির অক্ষরগুলো র‍্যাফেলের চোখে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। দগ্ধ পত্রের বিচ্ছিন্ন লেখাগুলি সে যন্ত্র-চালিতের মতো পড়ে যায়।

—তোমার আশায় বসে আছি···খেয়াল···প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী··· আমি না···তোমার পলিন···প্রেম···মৃত্যু···।

এই অক্ষরগুলিই আবার তার মনে অনুশোচনা জাগায় বুঝি।

সে সহসা উঠে ক্ষিপ্রহস্তে অগ্নিকুণ্ড থেকে শেষ চিঠিখানা তুলে নেয়। তারপর পড়তে থাকে—

র‍্যাফেল, দূরে গিয়ে তুমি হয়ত আমার দুঃখ লাঘব করতে চেয়েছ, তুমি হয়ত আমাকে কোন দুঃখই দিতে চাও না। কিন্তু তোমার ব্যথা-বেদনার সাথী হতে না পারাটাই হচ্ছে আমার পক্ষে সবচেয়ে বেশী বেদনাদায়ক। পৃথিবীর সব দুঃখই আমি সইতে পারি। সইতে পারি না শুধু তোমার বিরহ-ব্যথা।

র‍্যাফেল আর পড়তে পারে না। চিঠির প্রতিটি অক্ষর তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় পলিনের প্রেমের স্মৃতি, স্মরণ করিয়ে দেয় তার হতভাগ্য জীবনের কথা। সে চিঠিখানা আবার আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠে—যোনাথার্স, ডাক্তার হোরেস্‌কে ডেকে নিয়ে আয়।

হোরেস্ ঘরে ঢুকে দেখল র‍্যাফেল অসাড়ের মতো বিছানায় পড়ে আছে। সে সস্নেহে বলে—কেমন আছ মার্কুইস্?

র‍্যাফেল তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে উত্তেজিতস্বরে বলে—ডাক্তার, আমায় এমন একটা ওষুধ দাও যা খেলে রাতদিন ঘুমাতে পারব।

—কিন্তু দিনের বেলা—অন্ততঃ আহারাদির জন্যেও তো তোমার কয়েক ঘণ্টা জেগে থাকা দরকার?

—না-না-না কয়েক ঘণ্টা নয়। যদি একান্ত প্রয়োজন মনে কর, তবে শুধুমাত্র ঘণ্টা খানেকের জন্যে জাগিয়ে রেখ।

—কেন তুমি ঘুমাতে চাও?

—তা তুমি বুঝবে না ডাক্তার। আমার পক্ষে নিদ্রাই হচ্ছে

এখন বাঁচবার একমাত্র উপায়। যোনাথাস্, আমি ঘুমালে কেউ যেন আমায় ডাকে না, এমন কি ম্যাডাম পলিন এলেও না।

ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লিখে যোনাথাসের হাতে দেয়। যোনাথাস্ চুপি চুপি শুধায়—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু? বাঁচবে তো?

ডাক্তার বৈজ্ঞানিক-সুলভ নির্লিপ্তস্বরে জবাব দেয়—আজকের সন্ধ্যায় যদি মারা না যায় তবে হয়ত আরও কয়েকদিন বাঁচবে। আমি ওর অবস্থাটা ঠিক ধরতে পাচ্ছি না। মনে হয় ওর একটু আমোদ-আহ্লাদের প্রয়োজন।

—আমোদ! ডাক্তারবাবু আপনি এখনও ওকে চিনতে পারেন নি। পৃথিবীর কোন-কিছুতেই ওকে আনন্দ দিতে পারে না।

তারপর দিনকয়েক র‍্যাফেল কেবল ঘুমিয়ে কাটায়। অহিফেনের প্রসাদে সে রাতদিন ঘুমায়। শুধুমাত্র আটটার সময় ঘণ্টাখানেকের জন্যে জেগে খাবার খেয়ে নেয় তারপর আবার ঘুমায়। এমনি করে হপ্তা খানেক কাটে। একদিন আটটার কিছু পরে র‍্যাফেল ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখে তখনও তার খাবার দেওয়া হয়নি। সে ঘণ্টা বাজিয়ে যোনাথাস্কে ডেকে বলে—এই মুহূর্তে তুমি এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। তোমায় অনেক টাকা-পয়সা দিয়েছি, শেষ জীবন তোমার সুখে-স্বচ্ছন্দেই কেটে যাবে। কিন্তু আমার জীবন নিয়ে আর খেলা করতে পাবে না। অপদার্থ, খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে তবু এখনও খাবারের দেখা নেই?

যোনাথাস্ আপন মনে একটু হাসে তারপর আলো দেখিয়ে র‍্যাফেলকে দর-দালানের দিকে নিয়ে যায়। হঠাৎ যোনাথাস্ পাশের একখানা ঘরের রুদ্ধ দরজা খুলে দিতেই প্রজ্জলিত প্রদীপের এক ঝলক রুক্ষ আলোর আঘাতে র‍্যাফেল চমকে উঠে। আলো আর ফুল দিয়ে

তার ড্রয়িংরুমখানিকে মনোরম করে সাজান হয়েছে। সুসজ্জিত টেবিলের উপরে শোভা পাচ্ছে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য-সম্ভার। টেবিলটাকে ঘিরে বসে আছে তার পুরাতন বন্ধুরা। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে স্ত্রীলোকও আছে কয়েকজন। মেয়েগুলির অর্দ্ধনগ্ন দেহ ও বিলাসবিহ্বল হাব-ভাবে সূচিত হচ্ছে কামনার শাশ্বত আহ্বান। রূপ-রস-গন্ধে সারা ঘরখানি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সুন্দরী একুয়লিনা উঠে এসে র‍্যাফেলের হাত ধরতেই তার প্রথম দর্শনের বিহ্বলতা কেটে যায়। এ তবে স্বপ্ন নয় সত্য। রূঢ় বাস্তব সত্য। ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠে র‍্যাফেল। সজোরে যোনাথাসের গালে একটা চড় মেরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—শয়তান, তুই আমায় মেরে ফেলতে চাস?

তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সে ছুটে শয়নঘরে চলে যায়।

গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে র‍্যাফেল দেখে তার বিছানার পাশে বিনিদ্র চোখে বসে আছে পলিন। তার মুখখানি শ্রান্তিতে জলজ পুষ্পের মতো সাদা হয়ে গেছে। নিবিড় কালো চুলগুলি ঘাড়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে। পেলব কপোলে সুস্পষ্ট অশ্রু-চিহ্ন। পলিনের সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র পোষাকে আচ্ছাদিত—শুভ্রবসনা দেব-কন্যার মতোই মনোরম দেখাচ্ছে তাকে। র‍্যাফেল চোখ মেলে চাইতেই পলিন কোমলকণ্ঠে বলে—র‍্যাফেল—প্রিয়তম, তোমায় আমি ক্ষমা করেছি। তুমি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে আমায় ছেড়ে বিদেশে গিয়েছিলে। বল সত্যি কি না?

র‍্যাফেল তিক্তস্বরে বলে—পলিন, এখনই এখান থেকে চলে যাও। তুমি এইখানে থাকলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য।

—মৃত্যু? সে কি? তুমি না বলেছিলে যে আমায় ছেড়ে

মরবে না।। না-না-না র‍্যাফেল, তোমায় আমি মরতে দেব না। আমার প্রেম তোমায় বাঁচিয়ে রাখবে।

র‍্যাফেল বালিশের তলা থেকে চামড়াখানা টেনে বার করে। সেখানা এখন একটা পিয়ার-পাতার মতো ছোট হয়ে গেছে। সে ব্যথিতস্বরে বলে—পলিন, আমায় বিদায় দাও।

—বিদায় ?

—হ্যাঁ পলিন, বিদায়। এই চামড়াখানা হচ্ছে আমার জীবনের প্রতীক। কামনার নিরন্তর আঘাতে এটা ক্ষয় হতে হতে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তুমি যদি এখানে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর তাহলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য।

তার কথাগুলো পলিনের হেঁয়ালির মতো মনে হয়। সে র‍্যাফেলের হাত থেকে চামড়াখানা নিয়ে আলোর কাছে চলে যায়। তারপর একমনে সেটা পরীক্ষা করতে থাকে। প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে এই পরিণত যৌবনা তরুণীর তনুদেহের প্রখর সৌন্দর্য্যের পানে চেয়ে র‍্যাফেলের মনে পড়ে অতীত জীবনের কথা—মনে পড়ে সুখ-স্বপ্নের মতো মধুময় অতীতের মিলন-মুহূর্ত্তগুলি। সে নিজেকে আর যেন ধরে রাখতে পারে না। তার মৃত্যু-শিথিল দেহে, শিরায়, স্নায়ুতে আগুন ধরে যায়। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ শিখার মতো প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠে র‍্যাফেল ডাকে—পলিন—পলিন !

চমকে উঠে ফিরে তাকায় পলিন। মুমূর্ষু স্বামীর চোখে মুখে সে দেখতে পায় অতিপরিচিত কামনার প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা। শ্মশান ভস্মের মাঝে একি অদ্ভুত রতিবিলাস ! ভীতা নারী আপনার অজ্ঞাতেই ত্রস্তা হরিণীর মতো ছুটে পালায়।

—পলিন—পলিন, আমি তোমায় ভালবাসি। তোমায় আমি

চাই। আর্ত্ত চিৎকারে নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে কামপিষ্ট মুমূর্ষু র‍্যাফেল পলিনের পিছু পিছু ছুটে এসে রুদ্ধ দরজায় বারবার আঘাত হানে। তার মৃত্যু-আহত দেহে শেষ বারের মতো যৌবনের শক্তি ফিরে আসে যেন। স্নায়ু-শিরায় জীবনের শেষ শিখা জ্বলে। র‍্যাফেল একটা প্রচণ্ড আঘাতে ঘরের রুদ্ধ দরজা ভেঙ্গে ফেলে দেঁয়।

একখানা সোফার উপরে অর্দ্ধনগ্ন দেহে গড়াগড়ি দিচ্ছে পলিন। গায়ের শাল ছিঁড়ে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে সাধ্বী রমণী আর্ত্তকণ্ঠে চিৎকার করে বলছে—ঈশ্বর, আমার জীবন নিয়ে আমার স্বামীকে বাঁচাও। তাঁর জীবন ফিরিয়ে দাও প্রভু।

পলিনের নিবিড় কালো চুলগুলি ঘাড়ে মুখে বুকে লুটিয়ে পড়েছে। বিস্রস্ত বেশবাস। নগ্ন দুটি রক্তিম স্তনে যৌবনের চরম আহ্বান। তার অশ্রুসিক্ত আয়ত্ত চোখের পানে চেয়ে র‍্যাফেলের উত্তেজনা আরও যেন শতগুণ বেড়ে যায়। সে শরবিদ্ধ পক্ষিশাবকের মতো আকুল আগ্রহে পলিনের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর কম্পিত হাতে তার কণ্ঠের বন্ধন খুলে দেয়। মুমূর্ষু প্রেমিক তৃষিত চোখে প্রিয়ার মুখের পানে চায়। জানাতে চায় তাকে শেষ বিদায়-সম্ভাষণ। কিন্তু র‍্যাফেলের মুখে ভাষা আর ফোটে না। কয়েক মিনিট ধরে গলার কাছে একটা ঘড়ঘড় শব্দ উঠে। তারপর তার প্রাণহীন দেহ পলিনের ক্রোড়ে লুটিয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরে যোনাথাস্ কান্নার শব্দ শুনে দ্রুতপদে এসে ঘরে ঢোকে। সে পলিনের কোল থেকে র‍্যাফেলের শব তুলে নিতে চায়। পলিন বাধা দিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—ও কি করছ তুমি? ওকে কো নিও না। ও আমার। আমার এই রূপ-যৌবন দিয়ে অ ওকে হত্যা করেছি।

আভাস

—তারপর পলিনের কি হলো ?

—পলিন ? আপনি কখনও কোন এক শীতের সন্ধ্যায় আগুনের পাশে বসে আপনার অতীত প্রেমের কাহিনী কিংবা বিগত যৌবনের স্মৃতি স্মরণ করে কল্পনায় দাবানলের চিত্র এঁকেছেন কি ? মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন কেমন করে আগুনের লেলিহান শিখা গাছ থেকে গাছে, বন থেকে বনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সেই প্রজ্জলিত অনলশিখার ঠিক মাঝখানে একখানি অদৃশ্য হস্ত এসে এঁকে যায় এক পরমা সুন্দরী নারীমূর্ত্তি। হিমেল হাওয়া তার চুল আঁচড়ায়, আগুনের লোল জিহ্বা আঁধারের বুকে এঁকে দেয় তার বাসনার রাঙা চিহ্ন-রেখা। পরক্ষণেই সেই আগুনের ফুল হাসিমুখে আগুনের বুকেই মিলিয়ে যায়।

—কিন্তু পলিনের কি হলো ?

—সেকি ! আপনি শুনছেন না ? আচ্ছা আবার বলি। আপনি কোনদিন নিদ্রার ঘোরে দেখেছেন কি বিদ্যুল্লতার মতো মোহিনী এক নারী যেন হাওয়ার পাখায় ভর করে অতি আলগোছে আপনার শয়নশিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে ? আপনি স্পর্শ করতে চাইছেন তার তুষারশুভ্র দেহ, ছুঁয়ে দিতে চাইছেন তার কনকোজ্জ্বল কেশদাম, চুম্বন করতে চাইছেন তার নিবিড় কালো দুটি চোখের পাতায়। তার অলৌকিক রূপরাশি আপনার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আত্মহারা হয়ে চুম্বন করেছেন তার সুকোমল বিম্বাধরে। অমনি